সত্তর বৎসর

সত্তর বৎসর

।। আত্মজীবনী ।।

বিপিন চন্দ্র পাল

যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড
কলিকাতা-৬

বিপিনচন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষে
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬
হইতে জ্ঞানাঞ্জন পাল কর্তৃক প্রকাশিত

সাত টাকা

মুদ্রক :
জ্ঞানাঞ্জন পাল
নিউ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৬২

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ১৩৩৩ সনে, মাঘ মাসে 'প্রবাসী'তে বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবন-স্মৃতি 'সত্তর বৎসর' বাহির হইতে আরম্ভ করে। ১৩৩৫ সনের বৈশাখ মাসে শেষ অংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। 'প্রবাসী'তে ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাল বাহির হইয়াছিল; তাহাই এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 'প্রবাসী'তে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা ছাড়া পাণ্ডুলিপি আকারে 'সত্তর বৎসর'-এর আর কোনো অংশ পাওয়া যায় নাই। বাংলা বা ইংরাজী ('Memories of My Life & Times') কোনোটাই বিপিনচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবন-স্মৃতি নয়।

বাংলা 'সত্তর বৎসর' লেখার একটু কাহিনী আছে। ১৩৩৩ সালে বিপিনচন্দ্র তাঁর এক পৌত্রের পাঠারম্ভের অনুষ্ঠানে দুইজনকে 'পুরোহিত'রূপে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। একজন মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, স্বদেশী যুগের ত্যাগী কর্মী; আর একজন 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দক্ষিণা'রূপে 'প্রবাসী'র জন্য বিপিনচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁর আত্মজীবন-স্মৃতি লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লন। 'সত্তর বৎসর' তাহারই ফল।

উৎসর্গ

স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্ম-জীবনস্মৃতি
তাঁর পুত্র-কন্যা, বধূমাতা, জামাতা এবং
পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের
উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

সূচীপত্র

BIPINCHANDRA PAL

Born : 7th November, 1858 Died : 20th May, 1932

সত্তর বৎসর

১৮৫৭-১৯২৭

(১)

কৈফিয়ৎ

গত ২২শে কার্ত্তিক (১৩৩৩) সত্তরে পা দিয়াছি। এদেশে এ কালে সত্তর বছর বাঁচিয়া থাকা কম কথা নহে। কেবল বাঁচিয়া থাকারই একটা আনন্দ আছে। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য শোক-তাপ কিছুতেই এই আনন্দকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। অতিশয় দুঃখতাপী যারা এই জন্য তারা পর্য্যন্ত অশেষ কষ্টের মধ্যেও জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া এই জীবন কাটিয়াছে ; কিন্তু সেসকল জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে নাই। এই দীর্ঘ আয়ুর জন্য ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা সহকারে অসংখ্য প্রণিপাত করি।

এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্ব্বোপরি এই বাংলা দেশে এযুগে জন্মিয়াছি ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয় এযুগে এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সকলেই বলেন, ভারতবর্ষের এই নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনকে দেখি নাই, আমার জন্মের চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিদেশে বিভূমে দেহরক্ষা করেন। শৈশবে বাবার

মুখে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। বাবা তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন কহিতেন। বাবা নিজে মোস্‌লেম সাধনার কথঞ্চিত আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এইজন্য রামমোহনকে মৌলবী বলিয়াই জানিতেন। রামমোহনকে চক্ষে দেখি নাই কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ভারতবর্ষে নবজীবনের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা জানি। বিগত শতবর্ষে সেই বীজই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া আধুনিক ভারতবর্ষকে ছাইয়াছে। যাঁহারা এই বীজে জলসিঞ্চন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সেবায় এবং ত্যাগে এই বীজ আজ এমন সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কাহারও কাহারও সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার অবসরও পাইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের স্মৃতির সঙ্গে ইহাদেরও অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া আছে। এই জন্যই আমার সামান্য জীবন-স্মৃতির যা কিছু মূল্য ও মর্য্যাদা, নতুবা লোকসমাজে এ কাহিনী কহিবার কোন অজুহাত থাকিত না।

(২)

আরেকটা কথা, মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন কখনই নিঃসঙ্গ রহে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবন যে সমাজে জন্মিয়াছি সেই সমাজ-জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে, ইহা শাস্ত্রবাক্য হইলেও সত্য নহে। মানুষ বিশাল বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া এ সংসারে জন্মে। নিজের কর্ম্মের দ্বারা ইহজীবনে বিশ্বের এই কর্ম্মের বোঝাকে লাঘব বা গুরু করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। একথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

কৈফিয়ৎ

সগুজাত শিশুর ক্ষুদ্র জীবন তাহার পিতামাতার জীবন-ধারার মিলনে উৎপন্ন হয়। যখন আত্মস্থ হইয়া সূতিকাগারের দরজায় যাইয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে উপস্থিত হইয়াছি, প্রত্যেক মানুষের জীবন এইরূপে এক একটি ত্রিবেণী সঙ্গমের সৃষ্টি করে। পিতার জীবনে ও মাতার জীবনে তাঁহাদের নিজ নিজ পিতামাতার দুইটি জীবন ধারা মিলিয়াছিল। সেই জীবন-স্রোত পিতামাতার জীবন ধারা বাহিয়া আমার ক্ষুদ্র জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে যদি নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবন-স্রোতকে ধরিয়া বাহিয়া চলি, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের অনন্ত জীবন-স্রোতের মধ্যে ক্ষণিক তরঙ্গভঙ্গরূপে দেখিতে পাই। বিশ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জীবন মিলিয়া আমার এই জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্মের বোঝা, আমি বুঝি বা না বুঝি, আমার মাথার উপরে পড়িয়াছে।

একাকী আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল নিজকৃত কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া নহে। আমার জন্মে পিতামাতা তাঁহাদের কর্ম্মবোঝা কেবল আমার মাথায় চাপাইয়া দেন নাই; তাঁহারাও পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; মানুষের কর্ম্মের দায় এক পুরুষ বা দুই পুরুষের নহে। প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীর আলোতে চক্ষু খুলিয়াছিল, সেদিন হইতে অগুকার শিশুর কর্ম্মের বোঝা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা প্রথম মানবের কথাই বা বলি কেন? যেদিন হইতে এই সৃষ্টির সূত্রপাত সেইদিন হইতেই এই সগুজাত শিশুর সংসারের জাল অদৃশ্য হস্তে বোনা আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপরে জ্যোতিমণ্ডল পায়ের নীচে এই পৃথিবী—ইহাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তিলে তিলে অনাদিকাল অনন্ত গগন এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্রমাভি-

ব্যক্তির আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। এই সৃষ্টিতে জড় ও চেতন যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু আছে, সকলের সঙ্গেই সগুজাত মানব শিশুর জীবন জড়াইয়া রহিয়াছে। আলো ও অন্ধকার, রৌদ্র এবং বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, দাবানল ও ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পর্বত ও সমুদ্রের সৃষ্টি, সাগরের তরঙ্গ ও নদীর স্রোত, বিশাল বনস্পতি সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুসকল, কীট, পতঙ্গ, পুষ্পলতা সকলে মিলিয়া সৃষ্টির আদি হইতে এই ক্ষুদ্র মানব শিশুর জীবনকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে। এ সকল কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া মানুষ এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কল্পনা এই সৃষ্টিতে সম্ভব নহে।

মানুষকে যতদিন আমরা এই ভূপৃষ্ঠে দেখিতেছি, জীব-বিজ্ঞান নৃতত্ব এবং সমাজ-বিজ্ঞান যতদিনের খোঁজ পাইয়াছে, ততদিনই মানুষকে আমরা সামাজিক জীব বলিয়া জানিয়াছি। কোন কোন পশু যেমন দল বাঁধিয়া থাকে ও চলে, মানুষ যখন নিতান্ত পশুর মতনই ছিল, তখনও তেমনি সমাজ বাঁধিয়া বাস করিত। সৃষ্টির আদি হইতেই মানুষ তার সমাজের কর্ম্মের বোঝাও বহন করিয়া আসিয়াছে। সমাজের ভালো-মন্দ তাহার নিজের জীবনের ভালোমন্দকে সর্ব্বদাই চালাইয়া লইয়াছে। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে আর একাকী নিজের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া মৃত্যুতে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে—ইহা মিথ্যা কথা। আমরা নিখিল বিশ্বের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই বিশ্বের কর্মের বোঝাকে ইহসংসারে নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা লঘু বা গুরু করিয়া মৃত্যুকালে যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া যাই, তাহাদের মাথায় সেই বোঝা চাপাইয়া দেই। তাহারা পুরুষানুক্রমে আমাদের সুকৃতির ফলভোগ করে আর আমাদের

দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। যতদিন না এই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হয়, ততদিন কাহারও মুক্তি নাই। আমরা যে-লোকেই থাকি না কেন, ততদিন আমাদের ইহজীবনে কৃত কর্ম্মবন্ধন আমাদের অনুসরণ করে। বিশ্বের মুক্তি ভিন্ন বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির মুক্তি নাই। ইহারই নাম কর্ম্মফল।

(৩)

এইভাবে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের দিকে যখন তাকাই, তখন এ জীবনকে কিছুতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাবিতে সাহস হয় না। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। জড়-বিজ্ঞান সেই গোপন লিপিরই উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেক জীবকোষাণুর মধ্যে সৃষ্টির সমগ্র প্রাণীজগতের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া জীবের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেইরূপ সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানুষ যত ছোট হউক না কেন, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের সঙ্গে তাহার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ধারা ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া রহে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টা ফুটিয়া উঠে। টানা ও পোড়েন মিলিয়া যেমন কাপড় বুনে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও তাহার সমাজের জীবন মিলিয়া বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের তাঁতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে। সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি রহে না; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজ চলে না। সমাজের সমষ্টিগত জীবন সমাজের স্থিতিরক্ষা করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে।

সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা সমসাময়িক সামাজিক অভিব্যক্তিতে গতিবেগ সঞ্চার করে। এইভাবে মানুষের সভ্যতা ও সাধনা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজকে চিনিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত স্বতন্ত্র মানুষগুলিকে চিনিতে হয়। আবার এই ক্ষুদ্র মানুষগুলির জীবন ও কর্ম্মের মূল্য বুঝিতে গেলে তাহাদের সমসাময়িক সমাজের মধ্যে ফেলিয়া তাহার কালি কষিতে হয়। জীবনচরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়। এইভাবেই ব্যষ্টিরূপে ব্যক্তিকে ও সমষ্টিরূপে সমাজকে দেখিতে হয়। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির বাস্তবতা থাকে না। সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির সার্থকতা বোঝা যায় না। ইহাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথা।

(৪)

এই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনস্মৃতির একটা সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই জীবনস্মৃতি বা আত্মচরিত যদি কেবল আমার নিজের কথাই হইত, ইহাকে লোকসমাজে প্রচার করা সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমার সত্তর বৎসরের জীবনকথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসেরই কথা, আমার ক্ষুদ্র জীবন বাংলার এই সত্তর বৎসরের সমাজ জীবনের সঙ্গে কাপড়ের টানা ও পোড়েনের সূতার মতন জড়াইয়া আছে। এই সত্তর বৎসরে বাংলা দেশের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে ধর্ম্মে সমাজে ও রাষ্ট্রে এক যুগান্তর ঘটিয়াছে। আমার মতন দুই চারিজন লোক এখনও এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী রূপে বাঁচিয়া আছেন। ইহারা চলিয়া গেলে প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে এই সত্তর বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার কেহ থাকিবে না। আর কেবল পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া কোন

ব্যক্তির বা সমাজের জীবনের সকল সঙ্কেত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা যা কিছু বলি বা লিখি বা করি তাহাতে আমাদের চিন্তার ভাবের বা কর্ম্মের সকলটা কিছু ব্যক্ত হয় না। অনেক সময় এই জন্য কথা বা কাজের বিচার করিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের চরিত্রের বিচার সম্ভব হয় না। যাঁরা স্রষ্টা বক্তা বা কর্ত্তা তাঁরাই যদি নিজেদের বাক্যের সৃষ্টির বা কর্ম্মের কথাটা খুলিয়া কহেন তবে তাহার সকল অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। এই জন্যই কোন সমাজের ইতিহাসের সত্য মর্ম্ম বুঝিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কথা জানিতে হয়। ইহাই আত্মচরিতের সার্থকতা। এইভাবে যদি আত্মচরিত লিখিতে পারা যায় তাহা হইলে ইহা লেখকের আত্মাভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে না। এই ভাবেই নিজের জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি।

(৫)

আরও একটা কথা আছে। সেটা ধর্ম্মের ও ভক্তি সাধনের কথা। যখন আত্মস্থ হইয়া নিজের জীবনের দিকে তাকাই তখন ত' এ জীবনের উপরে কোন প্রকারে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিন্দু-পরিমাণ অবসর খুঁজিয়া পাই না। এ জীবনে একটি শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা সকলের চাইতে বড়। সকল সময় মনে রাখিতে পারি বা না পারি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এ জীবনের কর্ত্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহি নাই বা করিব ভাবি নাই, বহুবার তাহাই করিয়াছি ও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া যখন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তখন সত্যই বলিতে পারি—

'হরি হে, তুমি আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে,—
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল কেবল আমার আমার বলে।"

বারম্বার ইহা দেখিয়া কহিয়াছি—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

স্বাধীনতা ও নিয়তি (free will and determination) পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব (moral responsibility) এসকল তর্ক তুলিয়া জীবনের এই মুখ্য শিক্ষার সত্য ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারি নাই। জানি না, সত্যই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না, বুঝি না পাপ-পুণ্যের কথা। স্বাধীনতা নাই এমনও বলি না। পাপ পুণ্যের ভেদ ও দায়িত্ব নাই ইহা ভাবিতে সাহস হয় না ; কিন্তু সকলের উপর এ কথা সত্য যে, এ জীবনের কর্ত্তা আমি নহি। এই কথাটা যখন ভুলিয়া যাই, তখনই যত দুঃখ, যত তাপ ভোগ করি।

এ জীবনের কর্ত্তা আমি নহি বলিয়াই এ জীবনের কথা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে ও বলিতে পারি। ভক্তি-সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ 'স্মরণ'। এ 'স্মরণ' কি কেবল ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ আবৃত্তি করিয়াই করিব ? ভাগবতের অর্থ ভাগবত করে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের টীকা দিয়া ভাগবতাদি পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তাহার সদ্ ব্যাখ্যা হয়।

এই জন্য নিজের জীবনের স্মৃতিও ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে। হইবে কি না ঠাকুর জানেন। তাঁহারই নাম লইয়া তাঁহারই চরণে এই কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, ইহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বংশ ও গ্রাম পরিচয়

১৭৭৯।৬।২১।···।···

আমার কোষ্ঠিতে এই ভাবে আমার জন্মের দিন কাল লেখা ছিল। ৬ মাস অর্থ আশ্বিন মাস। কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা কোন মাস শেষ না হইলে এভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন না, ইংরাজীতে ৬।২১।১৯২৬ লিখিতে জুন মাসের ২১ তারিখ বুঝায়, আমাদের প্রাচীন প্রথায় ৬।২১ লিখিলে ষষ্ঠ মাস "গতে" একবিংশতি দিবস "গতে" বুঝাইত, সুতরাং ১৭৭৯ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে ২২ তারিখে আমার জন্ম হয়।

সেকালে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা সকলেই ছেলেদের কোষ্ঠি তৈয়ার করাইয়া রাখিতেন। বোধ হয় মেয়েদের সচরাচর কেবল জন্মপত্রিকা মাত্রই লেখা হইত। বিবাহের সম্বন্ধ করিবার সময় বরপক্ষীয়েরা জন্মপত্রিকা পরীক্ষা করিয়া ভাবীবধূর ভাগ্যগণনা করাইতেন। আমাদের একজন 'দ্বারস্থ' আচার্য্য গণক ছিলেন। ধোপা নাপিত যেমন তখনকার হিন্দুসমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল গণকেরাও সেইরূপ প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম্যজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতেন। আমাদের অঞ্চলে ইহারা জ্যোতিষ গণনা করিতেন, শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান লইতেন এবং কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার পূজাকালে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। ইঁহারা যেমন ফলিত গণনায় পুরুষ পরম্পরায় তেমন ভাস্কর্য্যেও নিপুণ ছিলেন। আজকাল পশ্চিমবঙ্গে কুমারেরাই দেবপ্রতিমা গড়িয়া থাকেন। কিন্তু এসকল প্রতিমা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কোন প্রকারে মন্ত্রপূত করা হয় কিনা

জানি না। আমাদের অঞ্চলে আমার বাল্যকালে দেবপ্রতিমা সর্ব্বদাই মন্ত্রপূত হইয়া নির্ম্মিত হইত। প্রথমে দেবতার পাদপীঠ প্রস্তুত হইত। কাঠ এবং বাঁশ দিয়া কাঠামো দাঁড় করানো হইত। এই পাদপীঠ নির্ম্মাণকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় 'পাটে খিলি' কহিত, মন্ত্র পড়িয়া এই 'পাটে খিলি' হইত; আর গণকই এ সময়ে মন্ত্রাদি পড়িতেন। কুমারদিগের এ অধিকার আছে কি না জানি না। কুমারেরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন না, বেদমন্ত্র উচ্চারণে ইঁহাদের অধিকার নাই। কিন্তু আচার্য্য বা গণকেরা পতিত হইলেও ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী। বোধহয় বৈদিকযুগে যাঁহারা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিতেন আমাদের আচার্য্যেরা তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও স্থিতি স্থির করিয়া দিঙনির্ণয় করিতে হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সঙ্গে যজ্ঞের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যজ্ঞবেদী যাঁহারা নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহারা জ্যোতিষীও ছিলেন। ক্রমে ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টি বা আবিষ্কার হইলে ইঁহারাই বোধহয় এই বিদ্যাতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। এইরূপে গ্রহপূজা জন্মপত্রিকা কোষ্ঠিগণনা এবং প্রতিমাদি নির্ম্মাণ আমাদের আচার্য্য বা গণকদিগের জাতিব্যবসায় হইয়া উঠে। ক্রমে শ্রাদ্ধে অগ্রদান গ্রহণ করিয়া ইঁহারা পতিত হয়েন। আমাদের 'দ্বারস্থ' আচার্য্যকে আমার বাবা আগে প্রণাম করিতেন না, তিনি প্রথমে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পরে প্রণাম পাইতেন। ইঁহাদের জল আচরণীয় ছিল না। ইনিই আমার কোষ্ঠি গণনা করিয়াছিলেন। আমার কোষ্ঠিখানা আট-দশ আঙ্গুল চওড়া ও পনর-কুড়ি হাত লম্বা ছিল। তুলট কাগজ জুড়িয়া তাহাতে আমার জীবনের অঙ্কপাত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তুলট কাগজকে আমরা নারায়ণগঞ্জী কাগজ কহিতাম। ঢাকার নিকটে নারায়ণ-

গঞ্জে বোধহয় সেকালে এই কাগজ প্রস্তুত হইত। বড় আকারের সাদা কাগজ শ্রীরামপুরী কাগজ বলিয়া পরিচিত ছিল। কলিকাতার নিকটে যে শ্রীরামপুর আছে, সেকালে এখানে কাগজ প্রস্তুত হইত কি না জানিনা। কিন্তু এই শ্রীরামপুরেই হউক বা অন্য শ্রীরামপুরেই হউক, আমার শৈশবে কোন শ্রীরামপুরে নিশ্চয়ই সাদা কাগজ প্রস্তুত হইত। আজিও বোধহয় শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাদা "ডিমাই" কাগজ শ্রীরামপুরী কাগজ বলিয়া পরিচিত। বাবা আমার কোষ্ঠিখানিকে অতি যত্ন করিয়া পরিবারের অন্যান্য নথীপত্রের সঙ্গে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে এখানি আমার হাতে পড়ে। সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। ফলিত-জ্যোতিষে তখন আমার কোনই আস্থা ছিল না। এখনও যে ফলিত-জ্যোতিষ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এমন বুঝি না। গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে আমার জীবনের সুস্থতা ও অসুস্থতার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতেও বা পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা আমার সাংসারিক কর্ম্মাকর্ম্ম কেমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, ইহা বুদ্ধিতে আসে না। কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলেও সরাসরিভাবে ফলিত জ্যোতিষের দাবীটা একেবারে উড়াইয়া দিতেও সাহস হয় না।

(২)

শ্রীহট্টের অন্তর্গত পৈল গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। এই গ্রামের পত্তনের কথা বিশেষ জানা নাই। ইহার নামের উৎপত্তি কি হইতে তাহাও বলিতে পারি না, তবে আমাদের বংশাবলীতে এরূপ লেখা আছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্য পাল এই গ্রামের নাম পৈল রাখিয়াছিলেন।

"হকিকৎ বংশাবলী। হিরণ্যপাল দক্ষিণ রাঢ়। মঙ্গলকোট হৈতে আসীয়া পরগণে পঙ্কজনাথ সাহি উরফে তরফ বুড়িগঙ্গার উত্তর পাড়ে বসিয়া গ্রামের নাম রাখিলেন পৈল। তাহার স্ত্রি গর্ভবতী ছিলেন যে দিবস এই স্থানে উত্তরীলেন সেই দিবস দিবাভাগে তাহার ঘরে এক পুত্র হইলে নাম রাখিলেন কিরণ্য পাল।"

এই কিরণ্য পাল হইতে আমার পিতা রামচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত পৈল গ্রামে আমাদের বংশ পঁচিশ পুরুষ বাস করিয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এ অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে পৈল গ্রাম ছিল কি না বলিতে পারি না। থাকিলে সে গ্রামের তখনকার নাম কি ছিল আর আমাদের অবস্থাই বা কি ছিল, তাহার খোঁজ পাওয়া যায় কি না জানি না, অন্ততঃ আমি সে খবর পাই নাই। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোট হইতে আসিয়াছিলেন, ইহা একেবারে অসম্ভব বা অপ্রামাণ্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে আমি মঙ্গলকোটে এখন বাৎস্য গোত্রের কোন পাল কায়স্থ আছেন কি না সন্ধান করিয়াছিলাম। কুমুদবাবু তখন মঙ্গলকোটের নিকটেই উজানী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে মঙ্গলকোটে এখন কোন পাল পরিবার নাই। তবে, পালেরা যে এককালে গ্রামের বিশিষ্ট লোক ছিলেন, 'পালের দীঘি' নামে একটা প্রাচীন জলাশয় তাহার সাক্ষ্য দেয়।

হিরণ্য পাল 'বুড়ি গঙ্গার উত্তর তীরে' আসিয়া উপস্থিত হন, আমাদের বংশাবলীতে এরূপ লেখে। কিন্তু এ নামে কোন নদী এ অঞ্চলে নাই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ। ঢাকার পাদবাহী নদীর নামই বুড়ীগঙ্গা। বোধহয় রাঢ় হইতে আগত হিরণ্য পাল বুড়ীগঙ্গার নামই জানিতেন এবং সেইজন্য যে নদী পার হইয়া

বর্ত্তমান পৈল গ্রামে উপস্থিত হ'ন তাহাকেই বুড়ীগঙ্গা ভাবিয়া লইয়াছিলেন। হিরণ্যপালের বংশধরেরাই যে এ গ্রামের আদি ভদ্র অধিবাসী এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বল্লালী কৌলীন্য নাই। এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা সকলেই 'শর্ম্মা'। বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় কিম্বা গঙ্গোপাধ্যায় এসকল কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে নাই। সেইরূপ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র—কায়স্থদিগের মধ্যেও এসকল কুলীন উপাধি নাই। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বংশমর্য্যাদা বল্লালের কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এ অঞ্চলে যাঁহারা যত পূর্ব্বে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন তাঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা তত বেশী। পৈল গ্রামে আমার বাল্যকালেও দেখিয়াছি যে পালেরা এবং সেনেরা সামাজিক পংক্তি ভোজনে অগ্রণীর আসন পাইতেন। ইহা হইতে মনে হয় যে পালেরা এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ অধিবাসী, বোধহয় ইহাও শুনিয়াছিলাম যে সেনেরা পালেদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৈলে আসেন। অতএব ইহা নিতান্ত অসম্ভব নয় যে পালেদের পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্য পাল মঙ্গলকোট হইতে আসিয়া পৈলের পত্তন করিয়াছিলেন।

(৩)

পৈল বর্ত্তমানে হবিগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত, হবিগঞ্জ মহকুমা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। পৈল এ অঞ্চলে একটি গণ্ডগ্রাম। বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোকই আমার শৈশবে বোধহয় সকলের চাইতে বেশী ছিলেন। কায়েস্থরা তখনও নিজেদের পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতেন না। বর্ণবিচারে আপনাদিগকে শূদ্রের কোঠায়ই ফেলিতেন।

তবে এখানে, যাঁহাদিগকে শূদ্র কহিলাম, ইঁহারা হয় নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন অথবা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভদ্রলোকদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। ইঁহারা ভৃত্যস্থানীয় ছিলেন। এই শ্রেণীর শূদ্রেরাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কতকগুলি শূদ্র গ্রামের ভদ্রলোকদিগের 'নফর' ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে স্বাধীন হইয়া কৃষিকার্য্য ও বাসা-চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের পরিবারে একজন এ শ্রেণীর শূদ্র ছিলেন। ইঁহাকে আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম। ইঁহার মাতাকে পিসি বলিতাম। ইঁহারা আমাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। বাবা 'দাদা'র বিবাহ দিয়া ঘরে বৌ আনিয়াছিলেন। এই বধুকে আমি নিজের ভ্রাতৃবধুর মতন দেখিতাম, 'দাদা' আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বাবাকে 'রামধন মামা' বলিতেন। 'দাদা'র মা আমার বাবাকে রামধন বলিয়াই ডাকিতেন। বাবা সারা বৎসর বিদেশে থাকিতেন। মাও প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। দাদাই বাড়ীর কর্ত্তারূপে আমাদের গ্রামের বিষয়াশয় দেখিতেন। এমন কি, বাবার প্রজারা দাদাকেই তাহাদের জমিদার বলিয়া জানিত। বাবার সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় অনেক স্থলেই ছিল না। এই 'নফরে'রা অন্য শ্রেণীর শূদ্র অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় হীন ছিলেন। স্বাধীন শূদ্রেরা ইঁহাদের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতেন না। গ্রামের নফরেরা হয় নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন গ্রামের 'নফর'দিগের সঙ্গেই সম্বন্ধ করিতেন। আমাদের বাড়ীতেই এক 'নফর' আমার শৈশবে আমাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। অন্যেরা সে সময়ে নিজেদের ঘরবাড়ী বাঁধিয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। আর 'দাদা'কে বাবা নিজের পুত্রের মতনই প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

অনেকগুলি নবশাখও আমাদের গ্রাম্য সমাজে ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কলুরাই সংখ্যায় এবং সমৃদ্ধিতে বিশেষ গণনীয় ছিলেন। কলুদিগকে আমাদের প্রান্তিক ভাষায় তেলী কহে। ইঁহারা নিজের জাতির ব্যবসা ব্যতীতও ছোটোখাটো রকমের তেজারতি করিতেন। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে দোকানপাট বড় ছিল না। সপ্তাহে দুইদিন বা তিনদিন হাট বসিত। এই হাটেই গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় পণ্য যা পাওয়া যাইত। সুতরাং স্থায়ী দোকানপাট ছিল না বলিয়া লোকের বিশেষ অসুবিধা হইত না। আর প্রত্যেক জেলাতেই মাঝে মাঝে গঞ্জ ছিল। এ সকল গঞ্জ নদীর ধারে কিম্বা বড় বড় রাজপথে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ সকল 'গঞ্জ' স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এ-সকল গঞ্জেই বিদেশী পণ্যের আমদানী হইত। আবার এখানেই স্থানীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইবার জন্য আড়তে আসিয়া জমা হইত। আমাদের গ্রামের নিকটেই হবিগঞ্জ ছিল। সেকালে সে অঞ্চলে হবিগঞ্জ একটা বড় গঞ্জ ছিল। পশ্চিম শ্রীহট্টের পণ্য যাহা কিছু এই হবিগঞ্জ হইতেই বিদেশে যাইত, আর হবিগঞ্জেই আমরা অন্যান্য জেলার পণ্যজাত দ্রব্য কিনিতে পাইতাম। আমাদের গ্রামে স্থায়ী দোকান ছিল না বলিয়া কোনই অসুবিধা হইত না।

গ্রামের লোকের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহার প্রায় সকলই গ্রামে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইত। প্রাচীনকালে কোন নূতন গ্রাম পত্তন করিবার সময় এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। দেবকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ, গ্রামের জমিজমার তত্ত্বাবধান ও রাজস্বাদির হিসাবপত্র রাখিবার জন্য কায়স্থ, চিকিৎসার জন্য বৈদ্য, ইহাদের পরিচর্য্যার জন্য শূদ্র, ক্ষৌরকার্যের জন্য নাপিত, কাপড় ধুইবার জন্য ধোপা, যজ্ঞবেদী ও ও প্রতিমাদি নির্ম্মাণ এবং জ্যোতিষ গণনার জন্য আচার্য্য বা গণক,

দেবপূজা এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে বাদ্য বাজাইবার জন্য ঢুলী, গ্রামের রাস্তাঘাট এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য ভূঁইমালী—সকল হিন্দুগ্রামেই এ সকল বর্ণের ও ব্যবসায়ের লোক ছিলেন। এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রাম্য সমাজেই বহু সংখ্যক কৃষক এবং উপযুক্ত সংখ্যক তন্তুবায়ও থাকিতেন। গ্রাম পত্তনের সময় এ সকল বর্ণের লোকেরাই একসঙ্গে আসিয়া নূতন গ্রামে ঘর বাঁধিতেন। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালা এবং কলুও দু' চারিঘর আসিতেন।

(৫)

আমাদের গ্রামে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই সকল বর্ণের ও ব্যবসায়ের লোকই ছিলেন। গ্রামের তন্তুবায়েরা 'যোগী' ছিলেন। ইঁহারা যে কাপড় বুনিতেন তাহাকে আমাদের প্রান্তিক ভাষায় 'যুগীয়ানী' কাপড় বলিত। সকল শ্রেণীর লোকেরাই বারমাস এই 'যুগীয়ানী' ব্যবহার করিতেন। 'যুগীয়ানী' ধুতি, হাঁটুর নীচে বড় নামিত না। গরমের দিনে প্রায় সকলেই খালি গায়ে থাকিতেন, কোথাও নিমন্ত্রণাদিতে যাইবার সময় একখানি চাদর গায়ে ফেলিয়া যাইতেন, সেও 'যুগীয়ানী' চাদরই ছিল। আজিকালি চরকায় কাটা সূতা তাঁতে বুনিয়া যে 'খদ্দর' প্রস্তুত হয়, ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইহাই আমাদের দেশে সাধারণ লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। ধনী ও সৌখীন লোকেরা কখনও কখনও ঢাকাই কাপড় পোষাকী রূপে ব্যবহার করিতেন। ভদ্র মহিলারা উৎসব পার্বণাদিতে তসর বা গরদ পরিধান করিতেন। তসর বা গরদ গ্রামে প্রস্তুত হইত না। শহর হইতেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা এ সকল সৌখীন কাপড় কিনিতেন। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকারেরা আসিয়া জুটিতেন, অথবা গ্রামের শূদ্রদের মধ্য হইতে কেহ কেহ

অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবার শিল্প শিখিয়া সোনার হইতেন। কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহাদিগকে সুবর্ণ-বণিক কহে, আমাদের অঞ্চলে, অন্ততঃ আমার শৈশবে, হিন্দু সমাজে এই বর্ণের লোক ছিলেন না। সুবর্ণ-বণিকের জল চল নহে; আমাদের স্বর্ণকারদের জল ব্রাহ্মণাদির আচরণীয় ছিল। আমার শৈশবে আমাদের গ্রাম্য সমাজে কেবল যোগী, ঢুলী, ধোপা এবং ভুঁইমালীদেরই জল চল ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা ইঁহাদের ছোঁয়া জল স্পর্শ করিতেন না বলিয়া ইঁহারা বাস্তবিক অস্পৃশ্য ছিলেন না, ইঁহাদের ছুঁইলে যে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত এমন নহে। আমি বাল্যকালে ভুঁইমালীদের কোলে মানুষ হইয়াছি বলিতে পারি।

(৬)

যোগীরা কেন অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন, বাংলার বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এ রহস্য ভেদ হইয়াছে। ইঁহাদের পদবী 'নাথ'। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে তিনি একবার একদল যোগী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; এই সম্প্রদায়ের যোগীদের 'নাথ' উপাধি ছিল, ইঁহারা 'নাথ যোগী' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে 'ঈশাই নাথ' নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনী এই 'নাথ যোগী'দের ধর্মপুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথ-যোগী 'ঈশাই নাথের' জীবন চরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলে যীশুখৃষ্টের জীবন চরিত যেভাবে পাওয়া যায় ঈশাই নাথের জীবন চরিত মোটের উপর

তাহাই। বাইবেলে যীশুখৃষ্টের যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ—এই ১৮ বৎসরের জীবনের কোন খবর মেলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ের মধ্যে খৃষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই 'নাথ-যোগী' সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ। সে যাহাই হউক না কেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে বাংলা দেশে যে সকল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের অধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে সমাজের নেতারা অস্পৃশ্য করিয়াছিলেন। নতুবা কুলে শীলে জ্ঞানে বা ধনে ইঁহারা সেকালের হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। নাথ-যোগীরা, পূর্ব্ববঙ্গের সাহারা এবং পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণ-বণিকেরা এই ভাবেই যে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন, এখন আর একথা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা যায় না।

(৭)

পৈল কেবল হিন্দুদিগের গ্রাম ছিল না, এই গ্রামে অনেক মুসলমানেরও বসতি ছিল। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটা বড় 'মাছুয়া হাটি' ছিল, এখনও আছে। এই পল্লীতে অনেক মুসলমান জালিয়া বাস করিতেন। গ্রামের নিকটেই দুইটি নদী। একটি কতকটা ছোট খোয়াই আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় বরাক। প্রাচীন সাহিত্যে এই বরাকের নাম বুড়ীবক্র বলিয়া উল্লেখ আছে। এই দুই নদীতেই সেকালে সারা বৎসর বিস্তর মাছ পাওয়া যাইত। পৈল এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ একটা অতিবিস্তৃত জলাভূমির মাঝখানে অবস্থিত। বর্ষাকালে চারিদিক জলাকীর্ণ হইয়া যায়। তখন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী বা পাড়া এক একটি ছোট দ্বীপে পরিণত হয়। এক পাড়া হইতে অন্য

পাড়ায় নৌকাতে যাতায়াত করিতে হয়। এইজন্য প্রায় সকল গৃহস্থেরই বাড়ীর ডিঙ্গী থাকিত। যাঁহারা চাষবাস করিত, বর্ষাকালে এসকল ডিঙ্গীতে তাহারা গো-গ্রাস কাটিয়া আনিত। হেমন্তকালে বাড়ীর নিকটে ডোবায় বা পুকুরে নিজেদের ডিঙ্গী ডুবাইয়া রাখিত। বর্ষার জল নামিয়া গেলে চারিদিকে কতকগুলি বড় বিল ভাসিয়া উঠিত। এসকল বিলেও বিস্তর মাছ পাওয়া যাইত। এই কারণেই আমাদের গ্রামে এতগুলি জালিয়া ছিল। আর তাহারা ছিল মুসলমান।

ইহা ছাড়া আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটা বড় মুসলমান পাড়াও ছিল। এই পাড়ায় এক মুসলমান জমিদার বাড়ীও ছিল। ইঁহাদেরই রায়ত ও নফরেরা এই পল্লীতে বাস করিতেন। পৈলের এই মুসলমান জমিদার পরিবার কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ময়মনসিং, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে বংশমর্য্যাদায় খুব বড় ছিলেন। ইঁহারা মুসলমান এবং আমরা হিন্দু হইলেও এই মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে আমাদের লোকলৌকিকতায় কোন বাধা ছিল না। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি গার্হস্থ্য ও সামাজিক ক্রিয়া কলাপে যে ভাবে হিন্দু আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে আমাদের লৌকিকতার আদান প্রদান চলিত, সে ভাবে ইঁহাদের সঙ্গেও চলিত। ইঁহাদিগকে আমরা সামাজিক প্রথা অনুসারে নিমন্ত্রণ করিতাম, ইঁহারাও আমাদিগকে সেইরূপ নিমন্ত্রণাদি করিতেন। আমরা ইঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া খাইতাম না, ইঁহারাও আমাদের বাড়ীতে আসিয়া খাইতেন না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে 'সিধ'ার আদান প্রদান হইত। মুসলমান বলিয়া আমরা ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিতাম না, ইঁহারাও আমাদিগকে 'কাফের' ভাবিয়া নরকে পাঠাইতেন না; উভয়ে নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন

করিতেন। উভয়েই এই ভাবে মোক্ষলাভ করিবেন বিশ্বাস করিতেন, একে অন্যকে নিজের ধর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করিতেন না।

(৮)

গ্রামের সাধারণ মুসলমানেরা অনেক সময় হিন্দু দেবদেবীর নিকট মানত রাখিতেন এবং কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে এই সকল দেবদেবীর পূজা হইলে ইঁহাদের নিজ নিজ মানত লইয়া ব্রাহ্মণের হাত দিয়া দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতেন। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। পূজার সময় প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী বা প্রজারা মানত করা বলি লইয়া উপস্থিত হইত। কেহ পায়রা, কেহ আখ, কলা, শশা বা ছাঁচিকুমড়া আর কখন কখন কেহ বা পাঁঠা পর্য্যন্ত বলি দিবার জন্য লইয়া আসিত। পুরোহিত ইঁহাদের নামে এ সকল বলি দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। যথাবিহিতভাবে উৎসর্গ শেষ হইলে ইঁহারা এ সকল প্রসাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন এবং আত্মীয়স্বজন মিলিয়া আনন্দ করিয়া এই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

আমার বাল্যে এবং যৌবনে আমাদের গ্রাম্যজীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সম্বন্ধই ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ও পথ তাঁহার নিজের পথ নহে কিন্তু ও পথে যে পরমার্থ মেলে না এ কল্পনা হিন্দু করিতেন না। মুসলমানও সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম্মকে নিজে না মানিলেও সর্ব্বদা সম্মান করিয়া চলিতেন। মুসলমান না হইলে যে মানুষ নরকে যাইবে এ সংবাদ তখনও মুসলমানের কানে পৌঁছায় নাই অথবা কোনদিন পৌঁছিয়া থাকিলেও বাঙ্গালী মুসলমান সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মুসলমান যেমন হিন্দু দেবদেবীর নিকট মানত করিত, হিন্দুও সেইরূপ মুসলমানের দরগায়

শিন্নি দিত। এইভাবে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া মিশিয়া বাংলার গ্রামে বাস করিত। বিষয়-আশয় জমিজেরাত লইয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইত বটে। হিন্দু মুসলমানে যেমন হইত মুসলমানে মুসলমানে বা হিন্দুতে হিন্দুতে সেইরূপই হইত। কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না। হিন্দুর মধ্যে যেমন নানা জাত আছে, একে অন্যের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা আদান-প্রদান করে না, সাধারণ হিন্দুরা সেকালে মুসলমানদিগকে সেইরূপেই ভিন্ন ভাবিত। আর হিন্দুধর্ম্মের ঔদার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও এবিষয়ে উদার হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার অনেক মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোনদিন হিন্দু দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি হারান নাই। বিশেষতঃ ইঁহাদের অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই, আর মুসলমান ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দায়ে ঠেকিয়া কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে বা হিন্দুধর্ম্মের কড়াক্কড়িতে ইঁহাদের অনেকে অনিচ্ছায় মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও ইঁহাদের অন্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই। আমাদের গ্রামে এখনকার সামাজিক অবস্থা কি জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে, বাল্যে এবং প্রথম যৌবনে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কোন বিরোধ ছিল না।

(৯)

যেমন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সেইরূপ হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যেও কোন সামাজিক বিরোধ ছিল না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সকল বর্ণের লোকই বিনা বিচারে ও বিনা ওজরে

প্রফুল্লচিত্তে মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেত্বের অভিমান করিতেন না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন বলিয়া কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অপর ভদ্রলোক অপেক্ষা তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ, কথায়-বার্ত্তায় বা আচার আচরণে তাহা বুঝা যাইত না। ব্রাহ্মণদের জাত্যাভিমান ছিল না বলিয়া প্রণাম করিয়া ইঁহাদের পদধূলি লইতে কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রশ্রেণীর লোকদেরও আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত না। যেমন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর উচ্চতর শ্রেণীর ভদ্রলোকের মধ্যে জাত বর্ণ লইয়া রেষারেষি ছিল না, সেইরূপ নিম্নতর শ্রেণীর লোকের মধ্যেও কোন প্রকারের জাতিবর্ণগত প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষ ছিল না। যাঁহাদের জল আচরণীয় ছিল না, তাঁহারা সেজন্য দুঃখ করিতেন না, আর জল চল নহে বলিয়া অন্য বর্ণের লোকেরাও ইঁহাদিগকে অমর্য্যাদা বা ঘৃণা করিতেন না।

(১০)

বাল্যকালে বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতাম না। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশী বা ভৃত্যদের সঙ্গেও সম্বন্ধ পাতাইয়া সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিতে হইত। কেহ কাকা, কেহ বা জ্যাঠা ছিলেন। ইঁহারা আমার বাবাকে কেহ কাকা, কেহ বা দাদা, কেহ মামা, আর কেহ বা বাবা বয়সে তাঁহাদের কনিষ্ঠ হইলে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে বদন নামে একজন ভুঁইমালী চাকর ছিল, সে বাবার প্রজাও ছিল। বাসন মাজা, উঠান ঝাড়ু দেওয়া, বাড়ীর নিকট পথঘাট পরিষ্কার করা ইহার কর্ম্ম ছিল। সে আমাদের পাকশালে বা খাবার ঘরে ঢুকিত না। একদিন কি দুষ্টামি করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমার কান মলিয়া

দিয়াছিল। আমি তাহাকে বদন দাদা বলিয়াই ডাকিতাম। কিন্তু কাণমলার বেদনায় ও অভিমানে চটিয়া গিয়া তাহাকে 'বদনমালী' বলিয়া গালি দেই। সে গাল বাবার কানে পৌঁছায় এবং এই অপরাধের জন্য আমাকে তিনি বেদম মারিয়াছিলেন। সে যে আমার কান মলিয়া দিয়াছিল বাবা একথা কানেই তুলিলেন না। অন্যায় বা বেয়াদপি করিলে আমার দাদা, কাকা বা মামারা যেমন আমাকে স্বচ্ছন্দে শাস্তি দিতে পারিতেন, আমার বাবার নীতিতে বদন অস্পৃশ্য মালী হউক না কেন তাহারও সে অধিকার ছিল। তখনকার ভদ্রলোকেরা এইভাবেই চলিতেন। জাতিবর্ণ-ভেদ একটা সামাজিক প্রথা মাত্র, প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সুতরাং মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইহাতে অমর্য্যাদা হয় এ জ্ঞান সেকালের লোকের ছিল না। জাতি বর্ণের বিচার করিয়াও তাঁহারা আহার ও বিবাহাদি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষের যাহা প্রাপ্য নিঃসঙ্কোচে তাহা দিতেন। ইহা যথেষ্ট ছিল না স্বীকার করি। কিন্তু তখনকার লোকের মনোভাব এরূপ ছিল বলিয়া জাতিতে জাতিতে এতটা রেষারেষি এবং বিদ্বেষও জন্মে নাই।

(১১)

কেবল আয়তনে বা লোকসংখ্যায় পৈল একটা গণ্ডগ্রাম ছিল না। সেকালের হিসাবে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধিও ছিল। শারদীয়া পূজার সময় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। আমাদের গ্রাম হইতে বিজয়ার দিনে স্বল্পবিস্তর সমারোহ সহকারে ছয় সাতখানা প্রতিমা বাহির হইত। কোন কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজাও হইত। আর অনেক বাড়ীতেই দোল হইত। অথচ আমার শৈশবে গ্রামে এক

মুসলমান জমিদারের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও একখানা কোঠাবাড়ী ছিল না। তখনকার দিনে খুব সম্পত্তিশালী না হইলে কেহ পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিতেন না। আজিকালিকার মত কোঠাবাড়ী তৈয়ারী করিবার মালমশলা অত সহজে পাওয়া যাইত না, খরচও এজন্য বেশী ছিল। আমাদের পাড়ায় একটামাত্র পোড়ো দালান ছিল। সেটা কোনও দিন আমাদের পূর্বপুরুষদের পারিবারিক দেবমন্দির ছিল। আমি এই মন্দিরকে ভাঙ্গা ইটের স্তূপরূপেই দেখিয়াছি। দেবতা স্থানান্তরিত হইয়া গ্রামের আখড়ায় বৈষ্ণব মোহন্তের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু পাকা বাড়ী না থাকিলেও অনেকের পাকা পুকুর-ঘাট ছিল, এবং ইহাই তাহাদের সমৃদ্ধির একটা প্রমাণ ছিল।

আমাদের অঞ্চলে এখন যেমন সেকালেও সেইরূপ সাধারণ লোকে বাঁশ এবং চূণ দিয়া ঘর প্রস্তুত করিত। আমাদের বাড়ীতে আমার বাল্যকালে এইরূপ ঘরই অনেকগুলি ছিল। এসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচারু ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি ছিল কাঠের। সম্মুখের বেড়াও কাঠেরই ছিল। পূজার সময় মণ্ডপের বড় বড় দরজা খুলিয়া রাখা হইত। আর তিনদিকের বেড়া ছিল বাঁশের বা শরের। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় এই শরকে ইকড় বলিত। ভিতরের দিকে এই ইকড়ের উপর শীতলপাটি ছিল। সব ঘরই মস্থণ বেত দিয়া বাঁধা হইত এবং এই বেতের বাঁধনের মধ্যে কখন কখন কারুকার্য্য গড়িয়া তোলা হইত। এই সকল কারুকার্য্য করিতে যাইয়া বাঁশ, বেত, ছন, সর ও দরমা বা পাটি দিয়া তৈয়ারী করা ঘরেই অনেক খরচ হইত; একালের পাকা ইমারতেও তাহার চাইতে যে খুব বেশী খরচ হয় তাহা নহে। আমাদের বাহির বাড়ী এই বাঁশ ও ছনের ঘর দিয়া এক প্রকারের চকৃমিলান ছিল, চারিদিকে ঘর আর মাঝখানে একটা চারিদিক খোলা আটচালা ছিল। এ সকল

আটচালা ঘরকেই আমরা নাটমন্দির কহিতাম ; পূজার সময় এইখানেই নাচগান হইত ; বিবাহাদিতে এইখানেই সভা বসিত। বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের মহলেও এইরূপ উঠানের চারিদিকে বাঁশ ও ছনের ঘর ছিল। আমাদের অঞ্চলে মাটির ঘর এখনও নাই, সেকালেও ছিল না।

(১২)

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেও আসবাবের বাহুল্য ছিল না। আজিকালকার হিসাবে আসবাব ছিল না বলিলেই হয়। সাল সেগুন এসকল আমরা বাল্যকালে চক্ষে দেখি নাই, কাঁঠালই শ্রেষ্ঠ কাঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। আল্‌মারী দেরাজ খুব ধনীর বাড়ীতেও ছিল না। বড় বড় কাঁঠালের সিন্দুকে বাসনাদি থাকিত। আর কখন কখন তার সঙ্গে কিম্বা স্বতন্ত্র সিন্দুকে পুঁটুলী-বাঁধা কাপড় চোপড় রাখা হইত। পুরুষেরা শীতকালে বিবাহাদি উপলক্ষে শাল, জামিয়ার প্রভৃতি গায়ে দিতেন, তার নীচে একটা মেরজাই থাকিত। সচরাচর যোগীয়ানী খেশ, আর যাঁহারা একটু শৌখীন ছিলেন তাঁহারা দোলাই দিয়া শীত নিবারণ করিতেন। আজকাল যাহাকে লোকে খদ্দর বলে তাহারই প্রাচীন নাম আমাদের অঞ্চলে খেশ ছিল ; বৃদ্ধেরা মাঝে মাঝে লুই গায়ে দিতেন। মহিলারা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে তসর বা গরদ পরিধান করিতেন। বেনারসী শাড়ীর কথা সকলেই জানিত কিন্তু কচিৎ, অতি কচিৎ তাহা দেখা যাইত।

অন্য আসবাবের মধ্যে শীতল পাটী এবং কাঠের পিঁড়িই প্রশস্ত ছিল। শতরঞ্জি এবং গালিচা সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে পাওয়া যাইত, কিন্তু এগুলি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে সিন্দুক থেকে বাহির করা হইত। অন্য সরঞ্জামের মধ্যে সামাদান,

বেলোয়ারি লণ্ঠন ও ধনীদিগের গৃহে ঝাড় পর্য্যন্ত থাকিত। আর একটু অবস্থা ভাল হইলেই ভদ্রলোকেরা রূপার আতর-দান ও গোলাপ-পাশ কিনিয়া রাখিতেন। মেয়েদের প্রসাধনের জন্যও সকল বাড়ীতে আর্সি ছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমার অতি শৈশবে আমার মা আর্সির সম্মুখে বসিয়া চুল বাঁধিয়াছেন ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

অলঙ্কারেরও বাহুল্য ছিল না। সোনার অলঙ্কার অতি অল্পই ব্যবহৃত হইত। শাঁখাই সধবাদিগের প্রধান অলঙ্কার ছিল। গড়নে এবং কারুকার্য্যে শাঁখার অনেক ইতর বিশেষ ছিল বটে। গরীবেরা খুব মোটা শাঁখা পরিত। অপেক্ষাকৃত ধনীরা মিহি এবং বেশী পালিশ করা শাঁখা পরিত। বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থেরা রূপার গহনা বা বাউটি পরিত। নাকে নথই একরূপ একমাত্র সোনার অলঙ্কার ছিল। কেহ কেহ সোনার মালাও পরিত। আর সোনার বাজুও প্রচলিত ছিল। এছাড়া চিক্, ইয়ারিং প্রভৃতির নামও শৈশবে শুনি নাই।

(১৩)

সত্তর বছর পূর্ব্বে আমাদের গ্রাম্য বেচাকেনাতে টাকা পয়সার প্রচলন খুব কমই ছিল। দ্রব্য বিনিময়েই গ্রামের ব্যবসা চলিত। চাষী ধান দিয়া কলু বাড়ী হইতে তৈল আনিত, মুদি দোকান হইতে নুন মশলা কিনিত। হাটের দিনে সকলে আপন আপন বাড়ীর উৎপন্ন ফলশষ্যাদি লইয়া যাইত এবং এসকলের বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনিয়া আনিত। আর হাটের এই কেনাবেচাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য সকলেই নিজের নিজের পণ্যজাত নিঃসঙ্কোচে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেন এবং বাজার হইতে নিজেদের সওদা নিজেরাই বহিয়া বাড়ী আনিতেন।

জন্ম-কথা

পৈলের ভদ্রাসন বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। বাবা সেসময়ে বাড়ী ছিলেন না বোধ হয়। তিনি তখন ঢাকায় চাকুরী করিতেন। বাবা ইংরেজী শিখেন নাই। বাংলা ভাষারও বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। তবে লেখাপড়া যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্ব্বদাই পড়িতেন।

আজিকালি* যেমন ইংরেজ সরকারে চাকুরী কিম্বা আদালতে ওকালতি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য লোকে ইংরেজী শিখিয়া থাকে সেকালে সেইরূপ যাহাদিগকে সচরাচর ভদ্রলোক বলে তাঁহারা যত্ন করিয়া ফার্সী শিখিতেন। এখন যেমন আইন আদালতের ভাষা হইয়াছে ইংরেজী, নবাবী আমলে সেইরূপ ফার্সী আমাদের দেশের রাজভাষা ছিল। যাঁহাদের রাজ-সরকারে চাকুরী করিবার লোভ ছিল তাঁহারা ফার্সী শিখিতেন।

ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়িতেন। প্রত্যেক গ্রামে এজন্য টোল ও ফার্সী শেখার জন্য মাদ্রাসা বা মোক্তাব ছিল। অনেক সময় এসকল মাদ্রাসা গ্রামের মস্‌জিদের সঙ্গে যুক্ত থাকিত। মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মৌলবী শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান বালকেরা এসকল মাদ্রাসায় একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করিত। এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার

* ইহা স্বাধীনতা লাভের আগে, ১৩৫৩ সালে লেখা।

ছিল না। হিন্দু বালকেরাও মুসলমান মৌলবীকে শিক্ষাগুরুর প্রাপ্য মর্য্যাদা ও ভক্তি অসঙ্কোচে অর্পণ করিত। হিন্দুরা যেমন নিজেদের বিদ্যারম্ভে বা হাতে-খড়ির সময়ে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিত, সেইরূপ মাদ্রাসায় বা মেক্তাবে যাইয়া ফার্সী পড়িতে আরম্ভ করিবার সময় এবং প্রতিদিনের পাঠের প্রারম্ভে কোরাণের আদি কথার লা এলাহি এল্ আল্লা, মহম্মদ রসুল আল্লা আবৃত্তি করিত। ইহার ফলে তখনকার মধ্য শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোকদিগের অন্তরে মুসলমানদিগের ধর্ম্মের প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা জন্মিত।

আমাদের গ্রামে বাল্যকালে টোল এবং মোক্তাব দুই ছিল। প্রতিবেশী মুসলমান জমিদারদের ভদ্রাসন-সংলগ্ন মসজিদে ফার্সী পাঠশালা ছিল। বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী এক অধ্যাপকের বাড়ীতে একটি টোল ছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ বালকেরা এই টোলে সংস্কৃত পড়িতেন; অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেকে এই টোলে পড়িতে আসিতেন, এবং এইখানেই থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সকল ছাত্রেরা গ্রামের সম্পন্ন ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে থাকিতেন; ইঁহাদের গ্রাসাচ্ছদনের ভার এসকল গৃহস্থেরাই বহন করিতেন। বাবা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন, কিন্তু বাড়ীতে দেবপূজাদি বা অতিথি অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ছিল; তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বিদেশে থাকিতেন বলিয়া গার্হস্থ্যোচিত কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হইত না। যাঁহার হাতে বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তিনিই দেবসেবা, অতিথি-সেবা প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোলের দুই চারিজন ছাত্র আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে যে কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এমন বলা যায় না। এখন যত লোক লিখিতে ও পড়িতে শিখে, তখন তত লোক লেখাপড়া শিখিত না, ইহা সত্য; কিন্তু লেখাপড়া না শিখিয়াও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল। মুখে মুখে সেকালের লোকে নানা জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন। আর সমাজের শিক্ষিত লোকের সংসর্গে সাধারণ লোকের বুদ্ধিও মার্জ্জিত হইয়া উঠিত। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে রামায়ণ বা মহাভারত পড়া হইত। যিনি পড়িতে জানিতেন তাঁহার চারিদিকে প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া ঘিরিয়া বসিতেন। এইরূপে পড়িতে না জানিয়াও প্রায় সকলেই মুখে মুখে পুরাণ বা প্রাচীন কাহিনীর কথা জানিতে পারিতেন এবং অপরের নিকট তাহার গল্প করিতেন। এ ছাড়া যাত্রা, কথকথাও ছিল। এইরূপে লোকশিক্ষা প্রচার হইত। এখনকার মতন এত পাঠশালার ছড়াছড়ি ছিল না বলিয়া সেকালের সাধারণ লোকেরা যে নিতান্ত অজ্ঞ থাকিতেন তাহা নহে।

আর পাঠশালাও যে একেবারে ছিল না এমন নয়। ইংরেজ আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলা দেশে ৮০,০০০ পাঠশালা ছিল। বৃটিশ শাসনের বিগত শতবর্ষের মধ্যেও এত পাঠশালার সৃষ্টি হয় নাই। ১৯২৫ ইংরাজীতে বাংলাদেশে ৫৭,১৭৩ পাঠশালা ছিল। ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে বাংলার জনসংখ্যা হিসাবে প্রত্যেক চারিশত লোকের একটি করিয়া পাঠশালা ছিল। এখন ইহার অর্দ্ধেক হইয়াছে অর্থাৎ প্রতি ৮০০ লোকের ভাগে একটা করিয়া পাঠশালা পড়ে।

বাবা বোধ হয় তাঁর মাতুলালয়েই লেখাপড়া শেখেন। তাঁর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল, আর ফার্সী ভাষাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির

জন্য সমাজে মুন্‌সী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ।প্রথম বয়সে মুন্‌সী মহাশয় বলিয়াই তিনি পরিচিত ছিলেন। শুনিয়াছি, ফার্সী মুসাবিদাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(২)

আমার মার নাম ছিল নারায়ণী, মা বাবার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, আমার বিমাতার জীবদ্দশাতেই আমার মার বিবাহ হয়। বিমাতা ঠাকুরাণী নিজে একরূপ জোর করিয়া দ্বিতীয়বার বাবার বিবাহ দেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া বংশরক্ষার জন্য বিমাতা ঠাকুরাণী বাবাকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। বাবা কিছুতেই রাজী হন না। এ সকল ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, ঈশ্বর-ইচ্ছা হইলে এতদিনে আমার বিমাতারই সন্তান হইত ; হয় নাই যখন তখন ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এই কথা বলিয়া বাবা অনেকদিন পর্য্যন্ত বিমাতা ঠাকুরাণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। আপনার পিত্রালয়ে যাইয়া 'কন্যার' খোঁজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের নিকটেই আমার মাতুলালয়। আমার বিমাতৃকুল 'দত্ত', মাতৃকুল 'কর'। আমার মা'র সংবাদ পাইয়া বিমাতা-ঠাকুরাণী নিজে ডুলি করিয়া আমার মাতুলালয়ে যাইয়া মাকে পছন্দ করিয়া বাবার দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসেন। এরূপভাবে সপত্নীকে আপনার ঘরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা রূপকথার মত শোনায়। সেকালে ইহা সম্ভব ছিল। তখন লোকে বিশেষভাবে বংশরক্ষার জন্যই দার-পরিগ্রহ করিতেন। পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ পাইবে এ ভাবনা লোকের অসহ্য ছিল। শ্বশুরকুল লোপ পাইবে বিমাতা ঠাকুরাণী এই ভাবনায় অস্থির

হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারই জন্য অমন জেদ করিয়া আপনার সপত্নীকে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

(৩)

আমার বয়স যখন দুই বৎসর তখন বিমাতা ঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কথা আমার কিছু মনে নাই, কিন্তু শৈশবে ও বাল্যে মায়ের মুখে তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। বোধহয় মা সাত-আট বৎসর সতীনের ঘর করিয়াছিলেন। কিন্তু এতকালের মধ্যে একদিনও উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের মনোমালিন্য হয় নাই। নিজে ঘটকালি করিয়া স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া বিমাতা ঠাকুরাণী আমার মায়ের সুখশান্তির জন্য নিজেকে বিশেষভাবে যেন দায়ী মনে করিতেন, এবং এই কারণে সর্ব্বদা আমার মাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে বিমাতা ঠাকুরাণীর খটাখটি হইয়াছে বটে; সকল সংসারেই হয়। কখনও কখনও বিমাতা ঠাকুরাণী বাবার উপরে রাগ করিয়াছেন, আর রাগ করিয়া আহার ত্যাগ করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু মা যেই গিয়া খাইতে ডাকিয়াছেন অমনি সকল অভিমান ধুইয়া মুছিয়া খাইতে আসিয়াছেন। মায়ের মুখে এসকল কথা শুনিয়াছি। সজ্ঞানে বিমাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গলাভ হয়। আর মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার যা-কিছু অলঙ্কার-পত্র ছিল তাহা আমার ভবিষ্যৎ পত্নীর জন্য মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া যান। মা কহিতেন যে আমার বিমাতা ঠাকুরাণীই আমাকে শিশুকালে পালন করিয়াছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন মা আমার দিকে চোখ তুলিয়া চান নাই, চাওয়ার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

(৪)

মা লেখাপড়া জানিতেন না, সেকালে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শেখার রীতি ছিল না। অন্ততঃ আমাদের অঞ্চলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন না। লোকের সংস্কার ছিল যে, বালিকারা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়। এ সংস্কারের উৎপত্তি কিসে পরে জানিয়াছি; বাল্যকালে বা প্রথম যৌবনে জানি নাই। সেকালে বাংলা দেশে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেন। এক শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহিলারা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বাংলাতেই রচিত। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল ও চৈতন্য-চরিতামৃত এই তিনখানিই বাংলার বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত শিক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। সুতরাং ধর্ম্ম প্রয়োজনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারণ লোককে লেখাপড়া শিখিতে হইত না। কিন্তু বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থগুলি বাংলায় রচিত বলিয়া বর্ণজ্ঞান লাভ করিলে বাঙালী মাত্রই এইগুলি পড়িতে পারেন। এই কারণে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব মণ্ডলে স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রায় বাংলা বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেন। মহিলারা মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার্য্য এবং গুরু হইতেন। আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা বৈষ্ণবদিগের একজন গুরু ছিলেন। বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহিলাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানিতেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মহিলা বৃন্দাবনে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষেরা মিলিয়া জনতা করিতেন, পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় নিজে এই বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্ত্রীপুরুষ প্রায় সকলেই যে লেখাপড়া জানিতেন অপরেও ইহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। বিগত খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী লুসিংটন বাংলা দেশের লোকের মধ্যে কতটা পরিমাণে লেখাপড়ার প্রচার আছে ইহার তদন্ত করিয়াছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল, তাঁহার রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা যখন এদেশে বালিকা বিদ্যালয় খুলিতে আরম্ভ করেন তখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতেন।

আর এক শ্রেণীর মহিলারা বা বালিকারা লেখাপড়া শিখিতেন। উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে মুসলমান আমল হইতেই অনেক হিন্দু জমিদার আছেন। যে সকল পরিবারের সঙ্গে ইঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হইত তাঁহাদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। ইহার কারণ এই যে, কি জানি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অকাল বৈধব্য উপস্থিত হয় তাহা হইলে জমিদারির তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহাদের উপরের পড়িতে পারে; আর সে অবস্থায় লেখাপড়া জানা না থাকিলে বিষয় রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। এইজন্য উত্তর-বঙ্গে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হ'ন, বোধ হয় ইহা হইতেই এই সংস্কারের উৎপত্তি হয়। আমাদের অঞ্চলে এরূপ বড় জমিদারি ছিল না। সুতরাং সেকালে আমাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে অজ্ঞ ছিলেন এমন নহে। আমার মা অনেক ব্রত-উপবাস করিতেন। পুরোহিত আসিয়া এই ব্রত উপলক্ষে

তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শুনাইতেন। প্রায় ব্রতেরই এক একটা কথা আছে। এসকল কথার ছলে দেবভক্তির এবং লোক-সেবার অপূর্ব্ব উপদেশ মিলিত। নিষ্ঠা সহকারে যাঁহারা এ সকল ব্রতকথা শুনিতেন, এসকল উপদেশ তাঁহাদের আচার-আচরণে ভাবে ও ভক্তিতে গড়িয়া উঠিত। ব্রত-কথার মাধ্যমে অতি উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বর্ণজ্ঞান-হীন মহিলাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইত। আমার মা এ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

তারপর সকল সমাজেই চাল-চলন এবং রীতিনীতির ভিতর দিয়া সমাজের লোকেরা অজ্ঞাতসারে সদাচার ও শীলতা শিক্ষা করিয়া থাকে। আমাদের প্রাচীনেরা স্কুল কলেজে না পড়িয়াও নিজেদের সমাজের রীতিনীতি হইতে একটা অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতেন। আমাদের সেকালের সমাজে সকল বিষয়ে নিজেকে চাপিয়া রাখা এবং নিজে পিছনে থাকা শীলতার প্রধান অঙ্গ ছিল। যে আপনাকে পিছনে রাখিতে চাহিত না, যে সকল বিষয়ে অপরকে আগাইয়া দিতে জানিত না বা পারিত না সে ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। মেয়েরা বিশেষ ভাবে এই আত্মগোপন বা সংযম শিক্ষা করিতেন। আমার শৈশবে যেমন নিজের বাড়ীতে সেইরূপ মায়ের সঙ্গে যখন মামার বাড়ী গিয়াছি, সেখানেও আমি কি খাইলাম বা না খাইলাম মা সেজন্য ব্যস্ত হইতেন না। মামার বাড়ী গেলে আমার স্নান আহার হইয়াছে কি না সে খোঁজ পর্য্যন্ত রাখিতেন না। আপনার জনের সুখ-সুবিধার জন্য কোনপ্রকারের আগ্রহ প্রকাশ তখনকার সমাজে ভদ্র-রীতি বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার ফলে যে কাহারও আপনার জনের অযত্ন হইত তাহা নহে। প্রত্যেকে অপরের যত্ন করিত বলিয়া সকলেরই মোটের উপর আরো বেশী যত্ন হইত। ইহার সঙ্গে অসাধারণ সংযমও শিক্ষা হইত। এই সকল

বিবিধ উপায়ে সেকালের মায়েরা লিখিতে পড়িতে না জানিলেও অজ্ঞ বা অসভ্য ছিলেন এমন কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

(৫)

কহিয়াছি, আমার জন্মকালে বাবা ঢাকা সদরআলার দপ্তরে পেশকার ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং বাংলার শিক্ষাবিভাগের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের* পিতা শ্যাম রায় মহাশয় আমার বাবার সমসময়ে ঢাকার সদরালার দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বাবার মুখে একথা শুনিয়াছিলাম। বাবার জীবনের ঐ সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সদরালা মহাশয় (বোধ হয় তিনি মুসলমান ছিলেন) বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সে সময়ে ভাওয়ালের কালীনারায়ণ রায় একদিকে এবং ওয়াইজ্ সাহেব নামক একজন ইংরেজ অন্যদিকে ঢাকা অঞ্চলে প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। একটা মোকদ্দমায় সরজমীন্ তদন্ত করা প্রয়োজন হয়। সদরআলা সাহেব বাবার উপরে এই তদন্তের ভার অর্পণ করেন। সরজমীনে উপস্থিত হইলে কালীনারায়ণ রায়ের লোকেরা বাবাকে ভেট দিবার জন্য নগদ দুইহাজার টাকা হইয়া তাঁহার নিকটে হাজির হয়। তিনি কালী-নারায়ণ রায়ের স্বপক্ষে ভোট দেন, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। বাবা মহামুস্কিলে পড়িলেন। তিনি ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া এ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অন্যদিকে নিজের প্রাণের দায়ে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহস হইল না। তখনও ইংরেজ শাসন

* ডাঃ পি, কে, রায় ইহার কয়েক বৎসর পরে পরলোক গমণ করেন।

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পথঘাট সাধারণ যাত্রীদিগের পক্ষে নিরাপদ হয় নাই। যখন তখন খুন ও ডাকাতি হইত। আর কালীনারায়ণ রায়ের লোকদের এমনি প্রতাপ যে দু' পাঁচটা খুন করিয়া একেবারে গুম্ করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাবা কালীনারায়ণ রায়ের লোকদিগকে ঢাকায় টাকা পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। তাঁহার পক্ষে এত টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। আর তদন্তের রিপোর্ট তিনি ঢাকায় যাইয়াই দিবেন, তখন টাকাটা দিলেই হইবে। ঢাকায় তাহারা টাকা পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু বাবা তাহা ফেরৎ দিয়া তদন্তের যথাযথ রিপোর্ট দেন। তাঁহার বিশেষ কিছু লাভ হইবে বলিয়া সদরআলা তাঁহার উপরে এই তদন্তের ভার দিয়াছিলেন। বাবা যখন এই টাকা এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন শুনিলেন তখন নিজের আমলাদিগের সমক্ষে বাবাকে বোকা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন।

(৬)

বাবা আমাকে কি চক্ষে দেখিতেন তিনি বাঁচিয়া থাকিতে ইহা বুঝি নাই। আমি যে যুগে জন্মিয়াছি ও যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্রলাভ যে কতবড় সৌভাগ্যের কথা মনে করিতেন, অপুত্রক হইয়া সংসার হইতে চলিয়া যাওয়া যে কত বড় দুর্ভাগ্য ভাবিতেন, আমাদের পক্ষে ইহা ধারণা করা কঠিন। আমরা তাঁহাদের মতন পুত্র কামনা করি না। আমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ রসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোগ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রাচীনেরা পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রয়োজন ভোগ নহে, কিন্তু কুলধারা রক্ষা করা, সমাজ-স্থিতি-ভঙ্গ নিবারণ করা। পুত্রলাভে পিতৃলোকের ঋণ

পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। ইহাই প্রাচীনদিগের সংস্কার এবং আদর্শ ছিল। সমাজরক্ষার সহায় বলিয়াই দারা সহধর্ম্মিনী হইয়াছিলেন। এইজন্য বিবাহ আমাদের প্রাচীন সাধনায় 'সংস্কার' ছিল। আর এইজন্যই কুলপাবন সৎপুত্র লাভ করিবার জন্য সৎ-গৃহস্থেরা সর্ব্বদা এত লালায়িত হইতেন।

বিধাতার কৃপায় আমারও পুত্রলাভ হইয়াছে। কিন্তু আমার বাবা আমাকে পাইবার জন্য যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, আমি তাহা করি নাই। এযুগে বোধ হয় কেহই এ তপস্যা করে না। এইখানে প্রাচীনদিগের সঙ্গে আমাদের একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার বাবা চিঠি-পত্রে আমাকে 'প্রাণতুল্যেষু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এযুগের পিতা পুত্রকে এরূপ সম্বোধন করেন না। করিলেও এযুগের মাতা পছন্দ করিবেন কিনা জানি না। এ সম্বোধন এখন পত্নীরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, একথা এযুগের লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। আমার বাবা ইহা ভুলেন নাই বলিয়া সর্ব্বদাই 'প্রাণতুল্যেষু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর উপাসক যেমন দেবতার পূজা করেন, শৈশবে সেইরূপে আমার লালন পালন করিয়াছিলেন।

শৈশব স্মৃতি

ঢাকা

পৈলের ভদ্রাসন বাড়ীতে জন্মিলেও আমার বাল্যস্মৃতি পৈলের নহে, ঢাকার সঙ্গে জড়িত। বাবা সে সময়ে ঢাকায় কর্ম্ম করিতেন, তখনও তিনি সদরআলার পেশকারই ছিলেন কিনা ঠিক জানি না। বোধহয় আমার জন্মের বৎসর কিংবা তাহার পূর্ব্ব বৎসর ওকালতি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। সদরআলার দপ্তরে পেশকারি করিবার সময়েই বাবা ঐ পরীক্ষা দেন। ঢাকা হইতে যাঁহারা সেবারে ওকালতি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই উত্তরপত্র কলিকাতার পথে ডাকের গোলমালে হারাইয়া যায়। পরীক্ষকেরা এইজন্য তাঁহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়াই সকলকে ওকালতির সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সনন্দের জোরে বাবা পেস্কারি ছাড়িয়া ঢাকাতেই ওকালতি আরম্ভ করেন।

ঢাকার কথা কিছু কিছু আমার মনে আছে। বোধহয় আমার তিন বছর বয়স পর্য্যন্ত বাবা ঢাকাতেই ছিলেন। আমরা যে হাভেলিতে বাস করিতাম—ঢাকা মুসলমান শহর বলিয়া স্থানীয় ভাষায় বড় বাড়ীকে অন্ততঃ সেকালে 'হাভেলি' বলিত—তাহার একটা বড় দেউড়ী ছিল। বাড়ীর নিকটেই একটা মস্‌জিদ ছিল। আমাদের বাসার জানালা হইতে মসজিদটা দেখা যাইত। সকাল সন্ধ্যা যখন মসজিদে আজান দেওয়া হইত তখন আমিও ওই জানালায় দাঁড়াইয়া দুহাতে দু' কান ধরিয়া 'আজান' দিতাম ইহা স্পষ্টই মনে আছে। আর একটা ঘটনাও মনে আছে। একদিন ওল-ভাতে খাইয়া খুব গলা ধরিয়াছিল; আর সেজন্য খাবার ঘর হইতে

ছুটিয়া পাকশালে যাইয়া মাকে খুব তদ্বি করিয়াছিলাম। ঢাকার আর কোন কথা আমার মনে নাই।

(২)

কোটের-হাট — বাখরগঞ্জ

ঢাকা হইতেই বাবা মুন্সেফ হইয়া প্রথমে যশোহরের কোন মহকুমায় যান। এখানে বেশীদিন ছিলেন না; সেজন্য মা তাঁহার সঙ্গে যশোহর যান নাই। যশোহর হইতে বদলী হইয়া বরিশালের অন্তর্গত কোটের-হাট মহকুমায় যান। এখানে বোধহয় তিন চার বৎসর ছিলেন। কোটের-হাটে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কোটের-হাটের কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে।

কোটের-হাটের মহকুমা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে।* নলচিঠির নিকটে এখনও কোটের-হাট বাজার আছে। তিন চার বছর আগে ঝালকাটি গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নিকটবর্ত্তী দু-তিনটা গ্রামেও যাইতে হয়। এসময়ে এক ভদ্রলোকের মুখে বাবার স্বাক্ষর-করা একটা দলিল তাঁদের বাড়ীতে আছে শুনিয়াছিলাম। এইরূপ দুই-একটা পুরাতন দলিলেই কোটের-হাটে যে একটা মুন্সেফি আদালত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও সাব-ডিভিসনের সৃষ্টি হয় নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও একেবারে পৃথক হয় নাই। মুন্সেফরাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। আজকালকার দিনে সাব্‌ডিভিসনাল অফিসারদের যে পদ ও মর্য্যাদা, ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় মুন্সেফদের সেই পদ ও মর্য্যাদা ছিল।

---

* পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্বে (১৩৩৩ সালে) ইহা লেখা।

কোর্টের-হাটের নীচে একটা খাল ছিল। সেখানে প্রায়ই কুমীরের উপদ্রব হইত। তাহার চারিদিকে জঙ্গল ছিল। সে জঙ্গলে প্রায়ই বাঘ দেখা যাইত। এমন কি রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শুনিতে পাইতাম। আমাদের বাসার নিকটেই একটা পুকুর ছিল। জোয়ারের সময় সেই পুকুরের জল তীর ছাপাইয়া উঠিত। কখনও কখনও আমাদের উঠান পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিত। সেই জোয়ারের জল দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইত তাহা আজও ভুলি নাই। জোয়ারের জলের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁটি, মকা—কলিকাতার মৌরালা, বেলে প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ সফরে বাহির হইত। এ সকল দৃশ্য আমার অন্তরে নানা প্রকারের কৌতূহল জাগাইয়া দিত। আমি কবি নহি, কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু কবি-কল্পনার বীজ লুকাইয়া থাকে। কোটের-হাটের জোয়ার ভাঁটার খেলা আমার মধ্যে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। জলপ্লাবনে আজিও আমার চিত্তকে মাতাইয়া তোলে।

মুন্সেফি কাছারিঘর খালের ধারে একটা উঁচু জায়গায় ছিল। তার সামনে একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠে মাঝে মাঝে গ্রামের লোকেরা আসিয়া হাট বসাইত। মাঝে মাঝে নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা বড় বড় বাঘ মারিয়া পুরস্কারের লোভে কাছারির সামনে আনিয়া ফেলিত। একবার পূজার সময় বাবা বাড়ী যাইবার মতন ছুটি পান নাই। আমাদের বাড়ীতে পূজা হইত। আমি বাড়ী যাইবার জন্য বায়না ধরিলাম। বাবা আমার কান্না থামাইবার জন্য কোটেরহাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হইত, তাঁহাদিগকে মহকুমায় আনিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেবার বিজয়ার দিনে কাছারির সামনের

মাঠে একটি বড় মেলা হইয়াছিল। এখনও সে ছবি চক্ষে ভাসিতেছে।

(৩)

কোটেরহাটে বাবার সঙ্গে আমাদের অনেক আত্মীয়কুটুম্ব চাকুরীর লোভে গিয়াছিলেন। গ্রামের ভৃত্যশ্রেণীরও অনেকে গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে বরিশাল অনেক দূরের পথ। বোধহয় নৌকায় দশ বারো দিন লাগিত। এ অবস্থায় শ্রীহট্টবাসী কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে একাকী অথবা কেবলমাত্র নিজের পরিবারবর্গের লোককে লইয়া অত দূরদেশে যাইয়া বাস করা সম্ভব ছিল না। বাবার সঙ্গে সঙ্গে এই কারণে আমাদের নিজের লোকেরা কোটের-হাটে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সেখানে সকলেই যথাযোগ্য কর্ম্ম পাইয়া-ছিলেন। জ্ঞাতিকুটুম্বেরা মুন্সেফি আদালতের আমলা হইয়াছিলেন। ভৃত্যশ্রেণীর যারা গিয়াছিল তারা পেয়াদা হইয়াছিল। কোঠেরহাটে এইরূপে আমাদের নিজেদের একটা উপনিবেশের মত জমিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু বাবার অধীনে যাঁহারা চাকুরী করিতেন, তাঁহাদের কেহই আমাদের বাসায় থাকিতে পাইতেন না, স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে হইত। এমন কি ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের যে কোন সম্পর্ক আছে, ইহাও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সম্পর্কে বাবা কাহারও দাদা, কাহারও কাকা, কাহারও মামা ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা বাবাকে সকলেই কেবল মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন, সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধন করা নিষিদ্ধ ছিল। একবার আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বাবাকে দশজনের সমক্ষে কাকা বলিয়াছিলেন। এই অপরাধে তখনই তাঁহার কর্ম্ম যায়। যতদিন বাবা কোটেরহাটে ছিলেন, ততদিন তিনি সেখানে আর চাকুরী পান নাই।

(৪)

তাঁহার বিচারে লোকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ না করিতে পারে, বাবা সে বিষয়ে অতি সাবধান ছিলেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন বছর চারেক হইবে। বাবা দু'বেলা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। একদিন প্রাতে আমরা খাইতে বসিয়াছি, মা কলমি শাক পরিবেশন করিলেন। বোধহয় ইতিপূর্ব্বে বাবা কোর্টের-হাটে কলমি শাক খান নাই। এ শাক কোথা হইতে পাইলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, এক পাটুনী বুড়ী দিয়া গিয়াছে। "দাম দিয়াছ?"—বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। "কলমি শাকের আবার দাম কি? সেও দাম চায় নাই, আমিও দিই নাই"—মা একথা কহিলেন। বাবা অমনি ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া পেয়াদা পাঠাইয়া সেই পাটুনী বুড়ীকে ডাকাইয়া তাহার শাকের দাম দিয়া, আর সে যেন কখনও আমাদের বাসার নিকটে না আসে—আসিলে বিশেষ শাস্তি পাইবে এইরূপ সাবধান করিয়া দিলেন। সেদিন বাবার আর আহার হইল না। মাকেও উপবাস থাকিতে হইল। মা বুঝিলেন, হাকিমের স্ত্রী হইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের দান বা ভেট গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

এই সামান্য কলমি শাকের জন্য বাবা এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন কেন? ইহার বিশেষ কারণ ছিল। মাও পরে সেকথা শুনিয়াছিলেন। মা'র মুখে আমি শুনিয়াছি, এই পাটুনী বুড়ীর এক অতি অকর্ম্মণ্য পুত্র ছিল। সে মাঝে মাঝে চুরির অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইত। এইজন্য তাহার মা যে হাকিমের বাড়ী যাতায়াত করে বাবা কিছুতেই ইহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন

না। যে কারণে ঢাকায় পেশকারি করিবার সময় তিনি কালী-নারায়ণ রায়ের লোকদের প্রদত্ত দুই হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই কলমি শাক সম্বন্ধেও সেই কারণেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

(৫)

সন্তানপালন সম্বন্ধে বাবা চানক্যনীতির অনুসরণ করিতেন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।"

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমাকে দেবতার মতন পূজা করিয়াছিলেন। আমি যখন যাহা চাইতাম, তখনই তাহা পাইতাম, কোনদিন আমার গায়ে বাবা হাত তুলেন নাই, অন্য কাহাকেও তুলিতে দেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহার বৈঠকখানায় আমাকে একটা "পলো" চাপা দিয়া রাখিয়া কাছে বসিয়া নিজের কাজ করিতেন। নিজের হাতে আমাকে স্নান করাইয়া দিতেন, নিজের পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে দেখিয়া আমিও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিব বলিয়া বায়না ধরিলাম। তখন আমার জন্য ছোট কোষাকুশি, ত্রিপদী রেকাবী, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম বাজার হইতে আসিল। আমিও বাবার কাছে বসিয়া কোষাকুশি লইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া 'পূজা' করিতে লাগিলাম।

(৬)

কোটেরহাটের আর একটি স্মৃতি পঁয়ষট্টি বছরেও মুছিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, এতটুকুও ম্লান হয় নাই। আমাদের বাসার পিছনে

একটা হোগ্‌লার বন ছিল। সে বনে বহু গোসাপ বাস করিত। এরা সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। কি কারণে জানি না, গোসাপ মারা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন আমার ছোট ভগিনী, তখনও ভালো করিয়া তা'র কথা ফুটে নাই, আমাদের শুইবার ঘরের মেঝেতে ঘুমাইতেছিল। মা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া পাকশালে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, দু'টো বড় গোসাপ ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় তাহার দুই পাশ-বালিশের দু'ধারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। আমিও মার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। সাপ দুটো আমার ভগিনী অপেক্ষা অন্ততঃ দেড়গুণ লম্বা ছিল। কুমিরের মতন তাহাদের মুখ। মা তো এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন শব্দ করিলেন না —চীৎকার করা তো দূরের কথা। তিনি যে ঘরে ঢুকিয়াছেন বোধহয় সে সাড়া গোসাপ দুটো পাইয়াছিল। তাহারা চোখ খুলিয়া মাকে দেখিয়া আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন মা কাঁপিতে কাঁপিতে সন্তানকে বুকে আঁকড়াইয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্য যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই মার স্নায়ুমণ্ডল যে কত স্থির এবং শক্ত ছিল, ইহা ভাবিয়া অবাক হইয়াছি।

(৭)

কোটেরহাটে আমাদের নিজের লোক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পৃথক বাসায় থাকিতেন, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং আমাদের নিজেদের পরিবার অতি ছোট ছিল। আমার পিতা পিতামহের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমার পিতামহের একমাত্র সোদর

ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সুতরাং তিন-পুরুষের মধ্যে আমাদের পরিবার কোনদিন বড় ছিল না। কোটের-হাটে মার সঙ্গে একটি মাত্র স্ত্রীলোক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। সেকালে আমাদের অঞ্চলে সম্পন্ন কায়স্থ বৈদ্য পরিবারে সর্ব্বদাই দুই চারি জন দাসদাসী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন।

তখনও ক্রীতদাসপ্রথা উঠিয়া যায় নাই। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা সামান্য মূল্য দিয়া দাসদাসী জন্মের মতন কিনিয়া রাখিতেন। এ সকল দাসদাসীর কেবল ভরণপোষণের ভার নহে ইহাদের বিবাহাদির ভারও গৃহস্বামী বহন করিতেন। আপনার পুত্রকন্যা-গণের যেরূপ বিবাহ দিতেন, ততটা সমারোহের সহিত না হইলেও এসকল দাসদাসীরও পুত্রকন্যাগণের যথারীতি বিবাহ দিতেন, এবং ইহা নিজেরই দায় বলিয়া মনে করিতেন। রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও এসকল দাসদাসী তাহাদের প্রভুপরিবারের সঙ্গে সর্ব্বদাই অতিশয় কোমল স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত। এই মহিলাটি—ইঁহাকে দাসী বলিতে আমার মনে আঘাত লাগে—আমার মাতামহের পরিবারভুক্ত ছিলেন। মায়ের বিবাহ হইলে ইনি তাঁহার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের পরিবারভুক্ত একজন হইয়া যান। মা বড় হইয়া উঠিলে ইনি আমাদের বাড়ীতেই থাকিয়া যান। বাবার সঙ্গে মা সর্ব্বদাই বিদেশে থাকিতেন। এইজন্য ইনি মাকে ছাড়িয়া আমার মাতুলালয়ে যাইতে পারেন নাই। মা ইঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন। কাঞ্চনী নামে ইঁহার এক কন্যা ছিল। আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই। বোধহয় আমার জন্মের পূর্ব্বে সে মারা যায়। বাবা এবং আমার আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহাকে 'কাঞ্চনীর মা' বলিয়া ডাকিতেন। আমার শৈশবে এবং বাল্যে ইনিই কার্য্যতঃ আমাদের

পরিবারভুক্ত গৃহিণী ছিলেন। আমি একটু বড় হইয়া দেখিয়াছি যে মা সাক্ষাৎভাবে লোকজনের সমক্ষে বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। বাবাও মার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে ভদ্রপরিবারে গুরুজনের সমক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে যখন তখন কথাবার্ত্তা বলা শিষ্টাচারসম্মত ছিল না। পারিবারিক বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবারে সর্বাপেক্ষা বয়স্কা যিনি পুরুষেরা তাঁহারই সঙ্গে পরামর্শাদি করিতেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নহে। আমার জন্মের পরে আমাদের পরিবারে এই কাঞ্চনীর মা'ই সর্বজ্যেষ্ঠা বলিয়া সকল বিষয়ে বাবা ইঁহার সঙ্গে পরামর্শাদি করিতেন। মাকে কোন কথা কহিতে বা তাঁর কাছে কিছু জানিতে হইলে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া কাঞ্চনীর-মা বলিয়াই ডাকিতেন। মা'ও বাবাকে কোন কথা জানাইতে হইলে ইঁহার মুখেই জানাইতেন। ইনি যে আমাদের নিজের লোক নহেন, ইঁহার সঙ্গে যে আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই, শৈশবে বহুদিন পর্য্যন্ত আমার এ জ্ঞান জন্মে নাই।

ইঁহাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম। ইনি যে সত্যই আমার মাসী নহেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতাম না। মাকে যতটা ভালোবাসিতাম, বোধহয় ইঁহাকে তার চাইতে বেশী ভালোবাসিতাম। ফলতঃ আমি ইঁহারই কোলে মানুষ হইয়াছিলাম, বড় হইয়া মার মুখে একথা শুনিয়াছি। অতি শৈশবে আমি মাকে যতটা না আমার মূত্রপুরীষের দ্বারা পীড়িত করিয়াছি তদপেক্ষা শতগুণ অধিক পীড়া ইঁহাকে দিয়াছিলাম, মা নিজে বহুবার ইহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আপনার সন্তানকে মা যতটা না আত্মবিস্মৃত হইয়া পালন করেন, কাঞ্চনীর মা আমাকে তদপেক্ষা বেশী আত্ম-বিস্মৃতি সহকারে লালন পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে আত্মপর-জ্ঞানশূন্য শৈশবে আমি

ইঁহার প্রতি মা'র চাইতেও বেশী অনুরক্ত ছিলাম। কোটের-হাটে থাকিবার সময় এইজন্য আমাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা যখন-তখন আমাকে ক্ষেপাইতেন। 'কাঞ্চনীর মা' মরিয়া গিয়াছে এই কথা কিছুতেই আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। ইহা যে বলিত তাহাকে তাড়া করিয়া মারিতে যাইতাম। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইয়াছে। বাংলার সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে ও এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়া লাগিয়াছে। কোটেরহাটে আমার দুই খুল্লতাত ছিলেন, একজন বাবার মাসতুত ভাই, আর একজন তাঁহার মামাত ভাই। কাঞ্চনীর মা বাবার শ্যালী স্থানীয়া ছিলেন বলিয়া ইহারা তাঁহাকে ঠাট্টা-পরিহাস করিতে পারিতেন। ইহারা 'কাঞ্চনীর মা মরিয়া গিয়াছে' না বলিয়া 'বিদ্যাসাগর মতে কাঞ্চনীর মার আবার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে'—এই কাহিনী সৃষ্টি করিয়া আমাকে দেখিলেই বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিতেন এবং এইরূপে আমাকে ক্ষেপাইতেন। কোটেরহাটের স্মৃতির সঙ্গে এই সকলই জড়াইয়া আছে। আমার বার-তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাঞ্চনীর মা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। মা ইঁহাকে বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করিতেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাবা ইঁহাকে আপনার শ্বাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া চলিতেন, বাবা-মা'র কথা-বার্তায় বা আচার আচরণে ইনি যে দাসী এভাব কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। আমার বয়স যখন তের কি চৌদ্দ সে সময়ে আমার বড় মামা বিবাহ করেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমার মাতামহী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, মাতুল পরিবারে কোন গৃহিণী ছিলেন না। আমার মায়ের একজন খুল্লতাত-পত্নী একমাত্র গৃহিণী ছিলেন। ইহারা কিন্তু আমার মাতুলদের সঙ্গে

একান্নভুক্ত ছিলেন না। আমার মাতুল দুইজন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহারা বিদেশে থাকিতেন। আমার বড় মামা বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে আনিলে, কাঞ্চনীর মা আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া আমার মাতুল পরিবারের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে বোধহয় প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর ইনি আমাদেরই পরিবারভুক্ত হইয়া ছিলেন। ইনি যে দাসী ছিলেন, আজও একথা ভাবিতে সঙ্কোচ হয়।

(৮)

কোটেরহাটের আর একটা কথা মনে আছে। সে হাসির কথা। মহকুমার বাজারে একটা কালীবাড়ী ছিল। বাজারের লোকেরা বোধ হয় বারোয়ারী উপলক্ষে কালীবাড়ীতে একবার খেম্‌টা-নাচ দিয়াছিল। বাবা এসকল নাচ-গান প্রায় দেখিতেন না। অথচ নিমন্ত্রণ-রক্ষা না করিলে লোকের অমর্য্যাদা করা হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আমাকে নাচ দেখিয়া কালীপ্রণামী দিয়া আসিবার জন্য পাঠাইতে চাহিলেন। খেম্‌টা-নাচ আমি কখনও দেখি নাই, খেম্‌টা-নাচ কাহাকে বলে তখন পর্য্যন্ত শুনিও নাই। আমাদের অঞ্চলে প্রান্তিক ভাষায় চিম্‌টি কাটাকে খেম্‌টা কহে। খেম্‌টা নাচের এই অর্থ করিয়া, সেখানে যাইলে আমার গায়ে চিমটি কাটিবে এই ভয় পাইয়া কিছুতেই সে নাচ দেখিতে যাইতে রাজী হই নাই। বাবা শেষে আমাকে পাঠাইতে না পারিয়া বোধহয় আমার কোন জ্যাঠতুত ভাইকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৯)

কোটেরহাটের আরও একটা কথা ভুলি নাই। একবার

সেখানে ওলাউঠা দেখা দেয়। সে সময়ে আমাদের বাড়ীর দাণ্ডসিং কোটেরহাটে ছিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাকে আমি দাদা বলিয়া জানিতাম ও ডাকিতাম। ইঁহার ওলাউঠা হয়। জীবন-সংশয় উপস্থিত হইলে বাহির বাটিতে যে ঘরে রোগী ছিলেন, মা ও আমি ইঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সে ঘরে গিয়াছিলাম। ঘরে বহুলোক, আমার বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহার রোগশয্যায় বসিয়া নিজের হাতে হিমাঙ্গে আবীর ঘসিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী হইলেও মা অসঙ্কোচে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর ওলাউঠা ভীষণ সংক্রামক রোগ জানিয়াও তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই মুমূর্ষু রোগীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। একথা মনে হইলে আমি সর্ব্বদাই ভাবি আমার বাবা এবং আত্মীয়স্বজনেরা যেভাবে এই ভৃত্যের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন আমি কি তা পারি? আর আমার মা আমাকে লইয়া এই সাংঘাতিক সংক্রামক রোগীর ঘরে যেমন নিঃসঙ্কোচে গিয়াছিলেন, আমার পুত্র বা পৌত্রকে লইয়া আমার পত্নী বা বধূ কি তাহা পারেন? আমাদের নানাদিকে বহু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আমরা যাহা জানি আমাদের প্রাচীনেরা তাহা জানিতেন না। কিন্তু এই জানার ফলে আমাদের মনে রোগের বা মৃত্যুর যতটা ভয় জন্মিয়াছে, ততটা ভয় তাঁহাদের ছিল না।

(১০)

এই বলিতে আর একটা কথাও মনে পড়িল। ইহা আমার শোনা কথা। মায়ের মুখে এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মুখে বাল্যে এ-কথা বহুবার শুনিয়াছি। বাবা তখন ঢাকায় কর্ম্ম করিতেন। আমি তখনও জন্মিয়াছি কি না বলিতে পারি না। একদিন অফিস

বা আদালত হইতে ফিরিবার সময়ে পথিপার্শ্বে একজন অসহায় বসন্ত রোগী পড়িয়া আছে, দেখিলেন। তাহার আলয় নাই, আশ্রয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, জ্ঞানও ছিল কি না সন্দেহ। তাহার জাত-বর্ণের পরিচয় পাইয়াছিলেন এমনও নহে। তখনও সরকারী হাসপাতালের সৃষ্টি হয় নাই। বাবা এই রোগীকে পথের ধারে এইরূপে ফেলিয়া আসিতে পারিলেন না। বাহকের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে নিজের বাসায় তুলিয়া আনিলেন এবং আপনার লোক দিয়া তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। সে ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিয়াছিল কি না শুনি নাই। কিন্তু যখনই এ কথা মনে পড়ে তখনই ভাবি আমি ত কোন জাতবর্ণের বিচার করি না, আর মানুষে দেবতাবুদ্ধি সাধন করিতেও চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বাবা যাহা করিয়াছিলেন, আমি কি তাহা পারি ?

(১১)

ঢাকার আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। এখনকার মতন সেকালে কোথাও স্কুল কলেজের ছেলেদের 'মেস' প্রতিষ্ঠা হয় নাই। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের আত্মীয়-কুটুম্বের বাসাতে থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। সে কালের লোকের ধারণা ছিল, অন্নদানে পুণ্য হয় বটে কিন্তু বিদ্যাদানে তদপেক্ষা শতগুণ বেশী পুণ্য হয়। এইজন্য সম্পন্ন গৃহস্থেরা নিঃসম্পর্কিত লোককেও নিজের বাড়ীতে বা বাসায় রাখিয়া স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আমার বাবা যখন ঢাকায় ছিলেন, সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বটে, কিন্তু ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীহট্ট, কুমিল্লা এবং পূর্ব্ব মৈমনসিংহের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ বাবার, একান্নে নহে, কিন্তু হাভেলীতে থাকিয়া পড়াশোনা করিয়া-

ছিলেন। পরলোকগত আনন্দচন্দ্র দত্ত (বরিশালের আনন্দ মাষ্টার) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে ইনি ঢাকা কলেজে পড়িবার সময় বাবার বাসাতে ছিলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরমোহন বসু, শ্রীহট্টের ও কাছাড়ের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টার পরলোকগত নবকিশোর সেন মহাশয়, শ্রীহট্টের পরলোকগত উকিল-সরকার রায়বাহাদুর দুলালচন্দ্র দেব মহাশয়, ইঁহারা বাবার বাসায় থাকিয়া ঢাকাতে পড়াশোনা করিয়াছিলেন, একথাও আনন্দ মাষ্টার মহাশয় কহিতেন।

বিদ্যারম্ভ

কোটেরহাটে বাবা ক' বছর ছিলেন মনে নাই। কোটেরহাটেই আমার বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি হয় এই কথাটা মনে আছে। তাহার পরেও বোধ হয় বছর দুই বাবা কোটেরহাটে ছিলেন। মনে হয় আমার তিন বছর বয়স হইতে সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত আমরা কোটেরহাটে ছিলাম। গ্রাম হইতে আমাদের পুরোহিত আসিয়া আমার হাতে-খড়ি করাইয়াছিলেন। ঘট স্থাপন করিয়া সরস্বতীর পূজা হইয়াছিল। পূজা শেষে স্নান করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া আমি সরস্বতীর চরণে যথাবিধি অঞ্জলি দিয়াছিলাম এবং

ত্বং সরস্বতী নির্ম্মলবরণং।
রত্ন-ভূষিত-কুণ্ডল করণং ॥

ইত্যাকার স্তোত্র পড়িয়া পুরোহিতের হাত ধরিয়া পরিষ্কার মাটির উপরে একটা কাঠি বা শরের কলম দিয়া 'আঞ্জি ক, খ' লিখিয়াছিলাম। এই 'আঞ্জি' জিনিষটা যে কি তা জানি না। ইংরেজী বর্ণমালার S অক্ষরটা উল্টাইয়া লিখিলে এই আঞ্জির মতন হয়। সংস্কৃত বা বাংলা বর্ণমালায় এনামে কোন বর্ণ নাই। বড় হইয়া এরূপ অনুমান করিয়াছি যে, বোধ হয় এই আঞ্জি প্রণবের কোন নামান্তর বা রূপান্তর হইবে। ব্রাহ্মণ বালকেরা উপনয়নের সময় ওঁ উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শূদ্রদের এ অধিকার ছিল না। মনু কহেন যে, সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই ওঁ উচ্চারণ করিবে, না হইলে সে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ নই বলিয়া আমাদের ওঁ উচ্চারণের অধিকার ছিল না। ওঁ লেখার অধিকারও ছিল না। অথচ হাতে-

খড়ির সময় ক, খ লিখিবার পূর্ব্বে মাঙ্গলিকরূপে ভগবানের নাম লেখা আবশ্যক। এইজন্যই বোধ হয় সেকালে এই 'আঞ্জি' লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ অনুমান সত্য কি না জানি না। বাংলার অন্য কোন জেলায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে-খড়ির সময়ে এরূপ 'আঞ্জি' লিখিয়া ক, খ লিখিতে হইত কি না বলিতে পারি না। আর হইলে, তাঁহারাই বা ইহার কি অর্থ করিতেন এ সন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়।

(২)

হাতে-খড়ি হইবার পূর্ব্বে আমি লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমার শৈশব-শিক্ষা বিদ্যারম্ভ হইতেই আরম্ভ হয়, ইহা সত্য নহে। আমার কথা ফুটিতে আরম্ভ হইলেই, বাবা আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া—আমাকে কাছে বসাইয়া বা কোলে লইয়া সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করাইতেন। যতদূর মনে আছে, বাল্মীকি রামায়ণের আদি শ্লোক—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্ ॥'

এইটাই সকলের আগে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। তারপরে—

রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতি

কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই শ্লোকটি শিখিয়াছিলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি শ্লোক বাবা মুখে মুখে শিখাইয়াছিলেন। বিস্তর চাণক্য-শ্লোক তাঁর নিজের কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলিও তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। একটু বড় হইলে পরে কতকগুলি শ্লোক আমার মুখস্থ হইয়া গেলে সন্ধ্যার পরে পিতাপুত্রে বসিয়া শ্লোকের প্রতিযোগিতা হইত।

খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষাদান যে আমাদের প্রাচীনেরা একেবারে জানিতেন না তাহা নহে। এই শ্লোক আবৃত্তি করাও একটা খেলার মতনই ছিল। এ ছাড়া খেলার ভিতর দিয়াই আমাদের শৈশবে আমরা ধর্ম্মশিক্ষাও লাভ করিতাম। হিন্দুর ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে, আচারের ধর্ম্ম, ক্রিয়ানুষ্ঠানের ধর্ম্ম। কহিয়াছি, কোটেরহাটে অতি শৈশবে আমি বাবা সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন দেখিয়া কোষা-কুষি লইয়া তাঁহারই মতন সন্ধ্যাহ্নিকের অভিনয় করিতাম। খৃষ্টিয়ান পরিবারের শিশুরা যেভাবে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ এবং রাত্রে শুইতে যাইবার সময়, মায়ের কোলে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, আমাদের সমাজেও ইহার অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্যূষে জাগিয়াই আমাকে দুর্গানাম স্মরণ করিতে হইত—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

ইহার সঙ্গে সঙ্গে—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

এই শ্লোকও আবৃত্তি করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে হইত। আবার রাত্রে শুইতে যাইবার সময় :—

... ... বিপত্তৌ মধুসূদনঃ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ॥

এই শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। বাবার কাছেই এসকল শ্লোক শিখিয়াছিলাম।

(৩)

হাতে-খড়ি হইবার পরে আমি "শিশুবোধ" পড়িতে আরম্ভ করি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা" বোধ হয় তাহার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও দেশের সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। "শিশুবোধে'ই আমার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত না হইলেও আমার মনে হয়, শিশু শিক্ষার জন্য শিশুবোধ অন্যান্য দিকে অতিশয় উপযোগী ছিল। চাণক্য-শ্লোক এই শিশুবোধেই প্রথম পড়িয়াছিলাম। বাবার মুখে বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বে যে সকল শ্লোক শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন এই পুস্তকে ছাপার অক্ষরে পড়িতে পাইয়া পাঠে একটা নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে—এসকল কথা এই শিশুবোধেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শিশুবোধে সকলের চাইতে মিষ্টি ছিল দাতাকর্ণর উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি বার বার পড়িয়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বরিশালে থাকিতেই বাংলা লেখাপড়া কতকটা শিখিয়াছিলাম। শিক্ষক ছিলেন আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব। মনে পড়ে যে প্রতিদিন অপরাহ্নে মা আমাকে কাপড় চোপড় পরাইয়া কাছারীতে বাবার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমি সেখানে যাইয়া তাঁহার এজলাসে উঠিয়া তাঁহার কাছে একটা চৌকিতে বসিয়া নীরবে বাংলা গভর্ণমেণ্ট গেজেট খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম বা পড়িবার ভান করিতাম। এইরূপে আমার শৈশবশিক্ষা আরম্ভ হয়।

(৬)

পিতার প্রকৃতি ও আমার চূড়াকরণ

কোটেরহাটে মুন্সেফি করিবার সময় বাবা বোধহয় দুইবার শারদীয় পূজার সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। একবারের একটা ঘটনা মনে আছে। পূজার দিন দুই পূর্ব্বে বোধহয় বাবা বাড়ী পৌঁছেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই শুনিলেন যে গ্রামের লোকেরা অন্যায় করিয়া এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে একঘরে করিয়াছেন। বাবা পরদিন প্রত্যূষে এই পরিবারের কর্ত্তাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেইদিন হইতে আপনার পরিবারের পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা সেবারে আমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজায় পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা এইজন্য বাবাকেও একঘরে করেন। ১৬ বৎসর কাল আমরা গ্রামে একঘরে হইয়া ছিলাম। তবে আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে দুই ঘর, এবং পল্লীর প্রতিবেশী শূদ্রদের দুই এক ঘর আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ইঁহারা ছাড়া গ্রামের অপর কেহ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন না এবং আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। বাবা ইচ্ছা করিলেই যখন তখন এই গোলমাল মিটাইয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু নিজের দায়ে কাহারও নিকট মাথা হেঁট করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। জীবনের শেস পর্য্যন্ত ইহা দেখা গিয়াছে

(২)

আমার বয়স যখন সাত কি আট বৎসর তখন কোটের-হাটের মহকুমা উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবাও রাজসেবা হইতে অব্যাহতি পান। অবসর পাইয়া তিনি বাড়ী আসিয়া আমার

চূড়াকরণের ব্যবস্থা করেন। আজকাল বোধহয় হিন্দু সমাজেও এই সংস্কারটা উঠিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, অথবা ইহার বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে। চূড়াকরণ অর্থ সোজা বাংলায় কান ফোঁড়া। যাহাদের উপনয়ন সংস্কার ছিল না ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে চূড়াকরণ তাহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সংস্কার ছিল। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা খুব জাঁক-জমক করিয়া পুত্রদের চূড়াকরণ করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের উপনয়ন ও অন্যান্য জাতির বিবাহাদিতে যেমন নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিতে হয়, চূড়াকরণেও সেইরূপ করিতে হইত। ইহার অধিবাস হইত। পাঁচসাতদিন ধরিয়া বাড়ীতে নহবত বসিত। কুটুম্ব-সাক্ষাতেরা গ্রামান্তর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। ব্রাহ্মণভোজন, জ্ঞাতিভোজনাদি ত হইতই। বিবাহ-বাসরে বর যেমন সভাস্থ হন এবং তাঁহার সম্মুখে যেরূপ নাচ-গান হইয়া থাকে, চূড়াকরণ উপলক্ষে যে বালকের চূড়াকরণ হইবে, তাহাকেও সেইরূপ সভাস্থ করা হইত এবং সেই সভায় নৃত্যগীত হইত।

(৩)

আমাদের অঞ্চলে আমার শৈশবে বাইএর গান বা খেম্‌টা নাচের রেওয়াজ ছিল না। তবে 'ঝুমুরওয়ালী' বলিয়া এক শ্রেণীর গ্রাম্য নর্ত্তকী পূজার সময় ও বিবাহাদিতে সভাস্থলে নাচগান করিতেন। আদিরসাত্মক গান হইত কি না জানি না। সে বয়সে কোন্ রসের কোন্ গান বিচার করিবার শক্তি জন্মায় নাই। যাত্রাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বেশীর ভাগ গান হইত। ঝুমুরওয়ালীরা সচরাচর শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত করিতেন। একটা গান ইঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম, এখনও মনে আছে।

গানটি এই—

সদা কালী কালী বলে ডাক রে রসনা।
বেদাগমে শিব উক্তি, ডাকরে মন মহামুক্তি,
নিতান্ত জেনেছি রে মন, শমন ভয় আর রবে না।

যেমন বিবাহবাড়ী সেইরূপ যে বাড়ীতে চূড়াকরণ হইত, তাহাও নৃত্যগীতাদি উৎসবের আনন্দে মুখর হইয়া উঠিত। আমার চূড়াকরণেও খুব ধুমধাম হইয়াছিল, বেশ মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই কানফোঁড়ার কথা।

(৪)

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেয়েরা জল 'সইতে' বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে ঢোল, কাঁশী ও সানাই বাজাইয়া ঢুলীরা গিয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে সেকালে এসকল পর্ব্ব উপলক্ষে ভদ্র-পরিবারের মেয়েরাও গান গাহিতেন। এই গান শেখা স্ত্রীশিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া গান না গাহিলে কোন উৎসবই পূর্ণাঙ্গ হইত না। বাড়ীর গৃহিণীরাও এ গানে যোগ দিতেন। যজ্ঞ বাড়ীর কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যে আমার মাকে দেখিয়াছি, এক একবার পুরস্ত্রীমণ্ডলে আসিয়া বসিতেন এবং গালে হাত দিয়া গলা ছাড়িয়া যে গান তাঁহারা গাহিতেছিলেন, তাহার তুই একটা পদ গাহিয়া আবার তখনই কর্ম্মান্তরে ছুটিয়া যাইতেন। হার্ম্মোনিয়াম ছিল না, বেহালা ছিল না, অন্য কোন যন্ত্র ছিল না, যন্ত্রের সঙ্গতের হাঙ্গামা ছিল না। অথচ এই পুরস্ত্রীরা নিজেদের গলা মিলাইয়াই একটা সঙ্গত করিয়া লইতেন। কখনও কখনও ইঁহাদের গান যে বেসুরা হইত না এমন নহে। আর তখনই

সুরলয়ের জ্ঞান আছে এমন মহিলা গায়িকাদের মধ্যে আসিয়া তাহা শুধরাইয়া দিতেন। আমার মায়ের গলা খুব মিষ্টি ছিল। আর বোধহয় কিছু কিছু সুরলয়ের জ্ঞানও ছিল। এইজন্য প্রায়ই অন্য কর্মের মাঝখানেও গায়িকাদের সুর ও লয় নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিলেই তিনি তাঁহাদের মাঝখানে আসিয়া গলা ছাড়িয়া সকলের গলার উপরে নিজের গলা চড়াইয়া, যেখানে বেসুরা হইতেছিল তাহার সুর ঠিক করিয়া দিয়া যাইতেন।

আমার চূড়াকরণের দিন 'জল-সওয়ার' কথা প্রসঙ্গে সেকালের ভদ্র মেয়েদের গান গাহিবার রীতির বর্ণনা করিলাম। ইঁহারা যে কেবল ঘরে বসিয়াই গান গাহিতেন এমন নহে। হিন্দুর সকল উৎসবেই 'জল-সওয়ার' প্রথাটা আছে। জল 'সওয়া' কথাটা কোথা হইতে আসিল জানি না। তবে ইহার সাধুভাষা 'সংগ্রহ করা' এ বেশ বোঝা যায়। আমাদের মেয়েরা সেকালে বারো ঘাটের জল সংগ্রহ করিতেন। ইহার অর্থ বোধহয় এই ছিল, সমগ্র বাসভূমি অথবা সমগ্র দেশের জলে অভিসিক্ত হইয়া বালককে চূড়াকরণ বা উপনয়নের সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। উপনয়নের দ্বারা ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব লাভ হইত; অর্থাৎ যে সামাজিক পদ তাহার প্রাপ্য তাহা সে পাইত। বিবাহতেও বর ও কন্যাকে এই বারো ঘাটের জল দিয়া স্নান করাইতে হইত। এ সকলের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইত। এ অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সংস্কারটা প্রচলিত ছিল। আমাদের পুরস্ত্রীরা এই জল সওয়ার সময়ে দল বাঁধিয়া মাথায় বা কক্ষে ঘটি বা কলসী লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের পথে বাহির হইতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে এই বারো ঘাটের জল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

(৫)

আমার চূড়াকরণের দিনেও মনে পড়ে মেয়েরা এইরূপে জল সইতে বাহির হইয়াছিলেন। সাত বৎসরের বালক হইলেও বোধহয় সেদিন আমাকে ভাত খাইতে দেওয়া হয় নাই। কেবল কিছু জলপান করিতে পাইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে মেয়েরা জল 'সইয়া' বাড়ী ফিরিলে সেই জলে আমাকে স্নান করান হইল। তারপর কিছু মিষ্টান্ন খাইতে পাই। তখনও আমাদের দেশে ছানার সন্দেশের আমদানি হয় নাই। সন্দেশ বলিতে আমরা ক্ষীরের ও নারিকেলের মিষ্টদ্রব্য বুঝিতাম। সন্ধ্যার পর আমি বিবাহের বরের মতন নূতন জাঁকালো কাপড় চোপড় পরিয়া সভায় যাইয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলাম। বোধহয় আসরে তখন ঝুমুরওয়ালীর গান হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাদের 'দ্বারস্থ' নাপিত আসিয়া দুইটা নূতন রূপার শলাকা দিয়া আমার কান বিঁধিয়া দিল। সে বেদনায় অস্থির হইয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম, এবং মনে আছে, নাপিতকে গালি দিতে দিতে খড়ম তুলিয়া মারিতে গিয়াছিলাম, নাপিত বেচারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল। আমাকে ধরিয়া আনিয়া কোলে করিয়া অন্তঃপুরে পাঠানো হইল। মা আসিয়া বোধহয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। মনে আছে, ইহার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত এই নাপিত আমাদের বাড়ীর সীমানায় আসিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিলেই আমি খড়ম লইয়া মারিতে যাইতাম।

(৬)

এই চূড়াকরণ ব্যাপারটা যে কি, কিসে ইহার উৎপত্তি আর

কি বা ইহার সার্থকতা তখন বুঝিবার বয়সই হয় নাই, এখনও বুঝিয়াছি এমন বলিতে পারি না। আমাদের সমাজের লোকেরা একরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতেন; ইহার সার্থকতা বুঝিতেন কিনা সন্দেহ। জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে যেমন বিনা বিচারে কেবল প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতেন, এই চূড়াকরণের অনুষ্ঠানও সেইরূপ হইত। আজকাল বোধহয় আগেকার মতন এ অনুষ্ঠান হয় না। বিবাহের অনুষ্ঠানের আনুষাঙ্গিকরূপে কানে একটা শলাকা ছোঁয়াইয়াই এখন এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ কোন খোঁজখবর লন না।

আমার মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন। সমাজগঠনের অতি শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কোন একটা অঙ্গ ক্ষত করিয়া সে যে বিশেষ কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ইহা জানাইতে হইত। ধর্ম্মের একতা, আচারবিচারের একতা—এ সকলের দ্বারা সামাজিক ঐক্য বহুপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম যখন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই, সামাজিক রীতিনীতি যখন প্রাচীন শ্রুতি ও স্মৃতির উপরে গড়িয়া উঠে নাই, তখন এক একটা বাহিরের চিহ্নের দ্বারা কে কোন্ গোষ্ঠির লোক ইহার পরিচয় হইত। বোধহয় সেই সময়ে আমাদের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই কর্ণবেধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানীর চক্ষে হিন্দুর কর্ণবেধ ও মুসলমানদিগের ত্বকচ্ছেদ একই বস্তু। এশিয়ার ও আফ্রিকার প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে একদিন আমরা হয় ইহাদের সগোত্র ছিলাম অথবা ভারতবর্ষে আর্য্যেরা আসিয়া ইহাদের এদেশীয় সগোত্রদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই অনুমানই

সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই কর্ণবেধ বৈদিক সংস্কারের অন্তর্গত নহে। সে যাহা হউক, আমার শৈশবে আমাদের অঞ্চলে চূড়াকরণ বৈদিক সংস্কারেরই মর্য্যাদা লাভ করিত।

আমার চূড়াকরণের সঙ্গে সঙ্গেই শৈশবের খেলাধূলা শেষ হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই বাবা প্রথমে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী ভাবে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ফেঁচুগঞ্জ নামক মহকুমায় মুন্সেফ হইয়া যান। তারপর চিরদিনের মত হাকিমি ছাড়িয়া শ্রীহট্ট সদরে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্টে যাইয়া বাল্যজীবন আরম্ভ করি।

(৭)

ফেঁচুগঞ্জ—শ্রীহট্ট

মা বাবার সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জে যান নাই। গ্রামের বাড়ীতে থাকিলে আমার লেখাপড়া হইবে না, আর গ্রাম্যজীবনের খেলাধূলার মাঝে পড়িয়া কি জানি আমি যদি গ্রাম্যচরিত্র লাভ করি, এই ভয়ে বাবা আমাকে ফেঁচুগঞ্জে লইয়া গেলেন। প্রাচীনকাল হইতেই আমাদিগের দেশেও গ্রাম অপেক্ষা শহরেই শিক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রভাব অনেক বেশী ছিল। বৈষ্ণব সাধনে বারংবার গ্রাম্যভাব ও গ্রাম্যভাষা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফেঁচুগঞ্জ ঠিক শহর ছিল না। কিন্তু একেবারে গ্রামও ছিল না। এখানে একটি মুন্সেফি আদালত ছিল বলিয়া কতকগুলি আমলা নানা স্থান হইতে জুটিয়াছিলেন। কেহ ঢাকা, কেহ ত্রিপুরা, কেহ বা ময়মনসিংহ হইতে আসিয়াছিলেন। এইভাবেই নানাদিকদেশের লোকসমাগমে সর্ব্বত্রই শহরের সভ্যতা ও শিষ্টাচারে একটা উদারতা গড়িয়া উঠে। এইরূপেই সর্ব্বত্র শহরগুলি সমসাময়িক সভ্যতা এবং শিষ্টাচারের কেন্দ্র হইয়া উঠে। গ্রাম্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা ও বর্ব্বরতা শহরে শুধরাইয়া যায়। এই সঙ্কীর্ণতা ও বর্ব্বরতার ভয়েই বাবা আমাকে মায়ের কাছে বাড়ীতে রাখিয়া আসেন নাই। মাও রাখিতে চাহেন নাই।

(২)

একবার ঘটনাবশে মায়ের সঙ্গে আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। বোধহয় তখন আমার বয়স আট কি নয় বৎসর হইবে। গ্রামে থাকিয়া আমি সহজেই গ্রাম্য বালকদিগের সহিত মিশিয়া গেলাম। তাহাদের সঙ্গে সারাদিন ছয় ফাঁদ

পাতিয়া দোয়েল পাখী ধরিবার চেষ্টায়, নয় মাঠে গিয়া ডাণ্ডা-গুলি খেলায়, নয় ছোট খেলার ঘর তৈরীতে কিম্বা কলাগাছ কাটিয়া চারিটা বাঁশের উপর বিঁধিয়া মহিষ কল্পনা করিয়া বলি দিয়া দুর্গোৎসবের অভিনয়ে দিন কাটাইতে লাগিলাম। সেদিনের কথা এখনও উজ্জ্বলরূপে মনে আছে। ষাট-বাষট্টি বৎসর পরেও গ্রামের সেই খেলার সাথীদের চেহারা এখনও ভুলি নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজনও আছেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সে খেলাধুলার কথা মনে করিয়া বার্দ্ধক্যেও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিতেছে। সে গ্রাম্য পথ মাঠ, সে হুড়োহুড়ি মারামারি, খেলা করিতে করিতে হঠাৎ বিরোধের উৎপত্তি ও বহু যত্নে নির্ম্মিত, বহু আদরে সাজান খেলার ঘর রাগের মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা, সকলই মনে পড়িতেছে। মনে পড়িয়া সে রস যে আর ইহজীবনে আস্বাদ করিতে পারিব না ভাবিয়া আক্ষেপ হইতেছে। তখন এসকল খেলাধুলা ছাড়িয়া শহরে যাইয়া পাঠশালার শাসনের ভিতর বাঁধা পড়িতে মন কিছুতেই চাহিত না।

কিন্তু মা'ও কিছুতেই আমাকে গ্রাম্যজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে রাখিতে চাহিতেন না। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সন্তান মূর্খ হইয়া থাকিবে এ ভাবনা তাঁহার অসহ্য ছিল। আমার পড়াশুনায় মন নাই দেখিলেই সর্বদা কহিতেন, মূর্খ হইয়া থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়া ভাল। এবারেও আমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও মা আমাকে জোর করিয়া বাবার কাছে শহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কত কান্নাকাটি করিলাম, বাড়ী হইতে বাহির হইব না বলিয়া কখন বা খুঁটি ধরিয়া কখন বা মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িলেন না। যাঁহার সঙ্গে শহরে

যাইব, আমাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে তাহাকে হুকুম দিলেন। সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। আমি কামড়াইয়া আঁচড়াইও তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। চিৎকার করিতে করিতে, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহার বন্দী হইয়া শহরের পথে চলিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া না গিয়াছি, আর শহরে না গিয়া অব্যাহতি নাই বুঝিয়াছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কান্না ও হাত-পা ছোঁড়াও থামিল না, সেও আমাকে কোল হইতে নামাইল না। মানুষ, শিশুই হউক আর বৃদ্ধই হউক, যতক্ষণ অপ্রিয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার সম্ভবনা আছে বোঝে, ততক্ষণই প্রাণপণে তাহার সহিত যুঝিয়া চলে। কিন্তু যখন অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখে তখন নিরুপায় হইয়া অনিবার্য্যকে আপনা হইতে বরণ করিয়া লয়। যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, তখন আমিও শান্তশিষ্ট হইয়া শহরের মুখে চলিতে লাগিলাম।

(৩)

কহিয়াছি, ফেঁচুগঞ্জে মা বাবার সঙ্গে যান নাই, আমি গিয়াছিলাম। ফেঁচুগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর তীরে। এখনও কলিকাতা হইতে কাছারের ষ্টীমারের পথে ফেঁচুগঞ্জ একটা বড় ষ্টেশন হইয়া আছে। ফেঁচুগঞ্জ-ঘাট আসাম রেলওয়ের একটা ষ্টেশন। কিন্তু এখনকার ফেঁচুগঞ্জ দেখিয়া আমার বাল্যকালের ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতি মনে জাগে না। সকলই যেন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। নদীর উপরেই আমাদের বাসা ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনেক ছোট পাহাড় আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে 'টিলা' কহে। ফেঁচুগঞ্জেও কতকগুলি 'টিলা' ছিল। একটা 'টিলার' উপরে আমাদের বাসা ছিল। তাহারি সম্মুখে আর

একটা টিলায় মুন্‌সেফের কাছারি ছিল। আমাদের বাসার টিলার আধখানা নাকি এখনও আছে, বাকি আধখানা ও কাছারির টিলা কুশিয়ারা গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের আপনা লোক বেশী কেহ যান নাই। আমার সমবয়স্ক কেহই ছিল না। আমি তখনও কোন পাঠশালায় যাই নাই। ফেঁচুগঞ্জে তেমন পাঠশালা ছিল কি না জানি না। বাবার কাছেই বাংলা লেখাপড়া করিতাম, এটুকু মনে আছে। হস্তলিপির উপর সেকালের লোকের খুব দৃষ্টি ছিল। বাবা প্রতিদিন আদালতে যাইবার সময়ে আমাকে বাংলা লেখা মকৃশ করিবার জন্য কাগজের মাথায় একটা লাইন লিখিয়া দিয়া যাইতেন। সেকালের পড়ুয়ারা প্রথম প্রথম কলাপাতায় মকৃশ করিত। কতকটা লেখা অভ্যাস হইবার পরে তালপাতায় লিখিবার অনুমতি পাইত। তারপর, হাতের লেখা পাকিয়া উঠিলে, কাগজে লিখিত। এখনকার মত কাগজ এত সস্তা ছিল না, এবং পয়সাও এত সচ্ছল ছিল না। সুতরাং অযত্নলব্ধ কলাপাতাতেই পড়ুয়ারা নিজেদের হাতের লেখা মকৃশ করিয়া পাকাইত। আমার বাল্যকালেও গ্রাম্যজীবনে এই পদ্ধতিই ছিল। তবে আমি নিজে আমার গ্রামের পাঠশালায় কখনও পড়ি নাই বলিলেই হয়। এই জন্য শৈশব হইতেই কলাপাতা ও তালপাতার পরিবর্তে কাগজেই লেখা অভ্যাস করিয়াছিলাম।

(৪)

বলিয়াছি যে, শিক্ষানীতিতে বাবা চাণক্যের নীতি অনুসরণ করিতেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥

আমার শৈশবে ও বাল্যে বাবা প্রায়ই এই শ্লোকটি আওড়াইতেন। কার্য্যেও এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোটেরহাটে ছিলাম। সেখানে বাবার নিকট হইতে আদরই পাইয়াছিলাম, কোন প্রকারের তাড়না পাই নাই।

কেবল এক দিনের কথা মনে আছে। তখন আমি পাঁচ ছাড়িয়া ছয়ে পা দিয়াছি। ফাল্গুন মাস, দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন। অদালতের ছুটির পরে বাবার পেয়াদারা আসিয়া আমাদের বাহিরের উঠানের নিকট হইতে মাটি কাটিয়া দোলমঞ্চ তৈয়ার করিতেছিল। পরদিনের উৎসবের আনন্দের পূর্ব্ব-আস্বাদনে বাড়ীর সকলেই স্বল্পবিস্তর মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। দোলমঞ্চ প্রস্তুত হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নাই, উৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। তারপর যখন আর জাগিয়া থাকা সম্ভব হইল না, তখন বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথে একটা ঢালু জায়গায় উপরের দিকে মুখ করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে বসিলাম। সেই মূত্র আমার পায়ের নীচ দিয়া গড়াইয়া পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমার এই মূর্খতা দেখিয়া বাবার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। ভদ্রলোকের ছেলের ভদ্রবুদ্ধি হইবে না কেন? শীলতা এবং আচারের ত্রুটি হইবে কেন? ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। বাবার হাতে বাল্যকালে যত মার খাইয়াছি তাহা লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য নহে, কিন্তু এই শীলতা ও সদাচারের ত্রুটির জন্য। এই দিনও এই কারণেই মার খাইয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে বাবা আমার গায়ে হাত তোলেন নাই বলিয়া এই প্রথম দিনের মারের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই।

(৫)

ফেঁচুগঞ্জে যখন যাই তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর

হইবে। এইখানেই আমার বাল্য শিক্ষায় চাণক্যনীতির দ্বিতীয় পর্বের পূর্ণ প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বাবা যে লেখা মক্‌শ করিতে দিয়া যাইতেন তাহা না করিয়া রাখিলে মার খাইতে হইত। তবে প্রতিদিনই যে এই দণ্ড ভোগ করিতাম তাহা নহে। প্রতিদিন বাবাও আমার লেখা হইয়াছে কি না ইহা তদারক করিতেন না। যেদিন করিতেন এবং লেখা হয় নাই দেখিতেন, সেদিন কিন্তু রেহাই ছিল না।

(৬)

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের বাসার নীচেই নদী এবং পিছন দিকে একটা খাল ছিল। বাবার ছিপে মাছ ধরার সখ ছিল। অতি বাল্যকাল হইতে আমিও মাছ ধরিতে আরম্ভ করি। ফেঁচুগঞ্জে যাইবার আগে কখন মাছ ধরিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। ফেঁচুগঞ্জের কথা খুব মনে আছে। আর বিশেষ মনে আছে এই জন্য যে, এই মাছ ধরার বাতিকেই তখন আমার লেখাপড়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। প্রাতঃ-কালে বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার ভয়ে হয় নামতা মুখস্থ না হয় লেখা মক্‌শ করিতে হইত। তবে মনটা পড়িয়া থাকিত সেই খালের ঘাটে। বাবা কাছারি চলিয়া গেলেই আমিও ছিপ লইয়া খালের ধারে যাইয়া বসিতাম। বাবা বাড়ী ফিরিবার সময় হইলে আমিও বাড়ী আসিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া লেখা মক্‌শ করিতে চেষ্টা করিতাম। বাবা ভাবিতেন যে, সারাদিনই আমি লেখাপড়া করিয়াছি। সুতরাং মুখ হাত ধুইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজে মাছ ধরিতে যাইতেন। অন্য কি মাছ ধরিতাম মনে নাই, তবে প্রায়ই যে এইরূপে নদী বা খাল হইতে খালুই ভরিয়া পাব্‌দা মাছ লইয়া আসিতাম ইহা মনে পড়ে। ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতির মধ্যে পিতা

পুত্রে মিলিয়া এই মাছ ধরিবার স্মৃতিটা সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা এমন উজ্জ্বল হইয়া আছে।

ফেঁচুগঞ্জে বাবা বোধহয় পাঁচছয় মাস মাত্র ছিলেন। ফেঁচুগঞ্জের কাজ স্থায়ী ছিল না। সেখানকার স্থায়ী মুন্‌সেফ ছুটী হইতে ফিরিয়া আসিলে বাবা অবসর লইয়া চিরদিনের মত মুন্‌সেফির লোভ ছাড়িয়া শ্রীহট্টে যাইয়া জেলার আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। যতদূর মনে পড়ে, বোধহয় ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি বা শেষভাগে বাবার সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। এইখানেই আমার সমগ্র বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সে স্মৃতি জড়িত হইয়া শ্রীহট্ট আমার জন্মভূমি না হইলেও এখনও পবিত্র তীর্থভূমি হইয়া আছে।

(৭)

শ্রীহট্ট শহরে

বাবার এক মাতুল রাজমোহন মুন্সী সে সময়ে শ্রীহট্টের জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। আমরা প্রথমে যাইয়া তাঁহার বাসায়ই উঠি। তারপর বাবা নূতন বাসা করিয়া সেখানে উঠিয়া যান। আমরা শ্রীহট্ট যাইবার কিছুদিন পরেই রাজমোহন মুন্সী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। সে কথা এখনও আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে ফরাশের পাশে যে সকল বাংলা নজির জড় করা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহারি ভিতরে কয়েকখানা হাজার টাকার নোট পাওয়া যায়। সেকালে লোকের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা যে কত কঠিন ছিল, চোর ডাকাতের উপদ্রব যে কত বেশী ছিল, এই ঘটনাতে তাহার প্রমাণ হয়। টাকাকড়ি লোকে সচরাচর সিন্দুকেই রাখিত। চোর ডাকাতেরা সেইখানেই গৃহস্থের টাকাকড়ির খোঁজ করিত।

সুচতুর মুন্‌সী মহাশয় এমন যায়গায় তাঁহার সঞ্চিত নগদ সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে চোরডাকাতের চক্ষু পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি একথা পরিবারের কাহাকেও বলিয়া যান নাই। সুতরাং দৈবকৃপাতেই কেবল তাঁহার আপনার লোকের হাতে এই নোটগুলি পড়ে।

(৮)

এখন যেখানে জেলার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে সেখানে একটা পাকা বাড়ী ছিল। বহুদিন বোধহয় সে বাড়ীতে কোন লোকজন বাস করে নাই। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল আর পিছনে একটা বিস্তৃত জলাভূমি ছিল। বাবা সেই বাড়ীটাই মাসিক আট টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমরা যখন সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম তখন সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম। তারপর অল্পদিনের মধ্যে সে বাড়ীর হাতায় আমাদের দুই তিন জন আত্মীয় আসিয়া বাসা প্রস্তুত করেন। সেই পাকা বাড়ীরও আধখানা শ্রীহট্টের তদানীন্তন স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নবকিশোর সেন মহাশয় আসিয়া দখল করেন। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার বাসা নবকিশোর বাবুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া এই পাকা বাড়ীতেই ছিল। এখন সে বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। যাঁরা আমার বাল্যজীবনের সাক্ষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঁচিয়া আছেন। ইনি শ্রীহট্টের মুন্‌সেফ আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন; এখন ওকালতি করেন না। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রুক্মীণীমোহন কর, মাতৃ সম্পর্কে আমার আত্মীয়, মাতুল পর্য্যায়ভুক্ত। এই অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীহট্টে আজিও শিক্ষিত অশিক্ষিত

হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। প্রাচীন অর্থে ও প্রাচীন আদর্শে শ্রীহট্টে যদি এমন কোনও লোক-নায়ক বা সমাজপতি থাকেন—তাঁহার সেদিকে লোভের লেশমাত্র নাই বলিয়া, সর্বসম্মতিক্রমে রুক্মিণীবাবুই সেই পদ ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। তিনি বড় জমিদার নহেন, তাঁহার কোন তেজারতিও নাই; সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র। কিন্তু শ্রীহট্ট শহরে বা জেলায় এমন কোনও ধনী বা জমিদার নাই, লোকসমাজে যাঁহার কথার দাম রুক্মিণীবাবুর অপেক্ষা বেশী।

[এইটা লেখা হইবার পরে, তাঁহার পুত্র শ্রীমান রজনীমোহনের পত্রে জানিলাম, ফাল্গুন মাসের ২৩শে তারিখ রুক্মিণীমোহন কর মহাশয় তাঁহার কর্ম্মোচিত লোক লাভ করিয়াছেন।]

(৯)

আমরা যখন প্রথম এই পোড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠি তখন শ্রীহট্টে বাঘের ভয় ছিল। শহরের উত্তরে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখন সেগুলিতে লোকের বসতি হইতেছে। আমার বাল্যকালে এই পাহাড়গুলি বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গল হইতে শীতকালে মাঝে মাঝে শহরে বাঘ পর্য্যন্ত আসিত।

প্রায়ই শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বাঘ মারিয়া কালেক্টারের কাছারির সামনে আনিয়া ফেলিত। আমাদের এই পোড়ো বাড়ী পর্য্যন্ত কখনও বাঘ আসে নাই কিন্তু মনে পড়ে দু' একবার খুব বড় বুনো বিড়াল দেখিয়া বাঘের ছানা ভ্রমে আমরা বালকেরা ভয়ে ছুটিয়া পলাইয়াছিলাম। কেবল বুনো বিড়াল নহে, খট্টাসেরও উৎপাত ছিল অনেক; সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাত ছিল সাপের।

প্রথম প্রথম পাশের জঙ্গল থেকে ঢোঁড়াশ সাপ আসিয়া প্রায়ই ঘরের দুধ খাইয়া যাইত। কখনও কখনও আমাদের মালি বর্ষার প্রথমে যখন শাকশব্জীর বাগান করিত তখন ভীষণ গোক্ষুরা সাপ ফণা তুলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইত। আর সে জয় মা বিষহরি, জয় মা বিষহরি, বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইত। মনসাকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় বিষহরি বলিত। এত সাপের ভয় সে অঞ্চলে ছিল বলিয়াই শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ঘরে ঘরে মনসা পূজা হইত। পদ্মপুরাণেই এই মনসা পূজা প্রচার হয়। আর পূর্ব মৈমনসিংহেই এই পদ্মপুরাণের সৃষ্টি হয়।

(১০)

বিষহরি বা মনসা পূজা সেকালে আমাদের অঞ্চলে একটা অতি প্রধান পর্বাহ ছিল। দুর্গোৎসব সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে এই চারিদিন-ব্যাপী পূজার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু বিষহরি বা মনসা পূজা প্রায় ঘরে ঘরেই হইত। শ্রীহট্ট শহরে তেমন বেশী দেখি নাই। বোধহয় শহর অঞ্চলে সাপের ভয় তেমন ছিল না বলিয়াই সেখানে সর্পকুলের দেবতার পূজার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যে সকল স্থান বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত এবং মাঠজঙ্গলের সাপ গ্রামের ভিতরে যাইয়া উঠিত, সে সকল অঞ্চলে এই সাপের দেবতাকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক ছিল। এই সকল নিচু জায়গায় বর্ষাকালে গোচারণের মাঠ একেবারে ডুবিয়া যাইত। এই জন্য বর্ষার জল নামিতে আরম্ভ করিলেই গ্রামের গোধন সকল গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইত। বর্ষার চার মাস গৃহস্থকে প্রতিদিন নৌকা করিয়া গিয়া

জল-প্লাবিত মাঠ হইতে গরুর জন্য ঘাস কাটিয়া আনিতে হইত। এই ঘাস কাটা সর্বদা নিরাপদ ছিল না। মাঝে মাঝে শুনা যাইত যে ঘাস কাটিতে যাইয়া লোক সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। এই সকল কারণেই সেকালে আমাদের অঞ্চলে বিষহরি বা মনসা পূজার এত প্রচলন ছিল। আর প্রায় সকলেই মনসার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত। মনসার রং সাদা, প্রায়ই বাহন বিস্তৃত-ফণা কালনাগ ছিল। মনসার আভরণ ছিল সাপ, শিরে মুকুট ছিল সাপ, কাণে কুণ্ডল ছিল সাপ, হাতে বালা ছিল সাপ, বাহুতে বাজু, গলায় হার, কটিতটে মেখলা সকলই ছিল সাপ। মনসা পূজার মন্ত্র কি ছিল মনে নাই। তবে পূজায় ছাগাদি বলির বিধান ছিল। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা হইত। ভাসানের দিন দেশময় নৌকায় বাচখেলা হইত। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় বাচখেলা শব্দ প্রচলিত ছিল না। আমরা ইহাকে নাও দৌড়ান বা নৌকা দৌড় কহিতাম। জলাকীর্ণ পল্লীগ্রামে সকল গৃহস্থেরই ঘাসের নৌকা ছিল। এসকল নৌকা লম্বা ও হালকা, অনেকটা ছিপ্ নৌকার মতন। সুতরাং এসকল ঘাসের নৌকাতে যখন আট দশ জন, বা কখন কখন লম্বা নৌকা হইলে, ষোল কুড়ি জন পাশাপাশি বসিয়া তাতে বৈঠা ফেলিয়া বাহিয়া চলিত তখন এসকল তীরের মতন ছুটিত। নৌকা দৌড়ের সময় সারি গান হইত। প্রত্যেক নৌকার গলুইয়ে একজন দাঁড়াইয়া সারি গানের মূল গায়ক হইত। প্রত্যেক সারি গানেই একটা মূল দোহা ছিল। সকলে সেটাই গাহিত। আর মূল গায়ক অনেক সময় নিজে কবিতা রচনা করিয়া সেই দোহার সঙ্গে জুড়িয়া দিত। এসকল কবিতা অনেক সময় স্থানীয় সমাজের সুকীর্ত্তি কুকীর্ত্তির কথাও প্রচার করিত। সারি গানের একটা দোহা মাত্র মনে আছে। বাড়ী ফিরিবার সময় সকলেই এই সারিটা গাহিয়া ফিরিত।

সে দোহাটা এই—

'ঘাটে লাগাওরে নাও ওরে ভাই মাঝি।
যে ঘাটে লাগাইবায় নাও দেখবায় ফুলের পানি ॥'

ইহা হইতে বুঝা যায় এই মনসা পূজা, মনসার ভাসান ও নৌকা দৌড়ান এসকলের ভিতর দিয়া সেকালে আমাদের গ্রাম্যজীবনে কতটা আনন্দ উল্লাস উছলিয়া উঠিত। মেয়েরা বাচের নৌকার সঙ্গে যাইতেন না। কিন্তু এসকল নৌকা যখন সারি গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত তখন ঘাটে ঘাটে পুরস্ত্রীরা আসিয়া দাঁড়াইতেন; এবং যেই একখানা নৌকা তাঁহাদের ঘাটের পাশ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে যাইত তখন ইঁহারা উলু দিয়া আত্মপরনির্বিশেষে সকল খেলোয়াড়কেই উল্লাসে অভিনন্দিত করিতেন। মাঝে মাঝে এই নৌকা-দৌড় উপলক্ষে মারামারি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিক সৌহার্দ্য ও শান্তি নষ্ট হইত না। মনসাপূজা হিন্দুরই পূজা। কিন্তু মনসার প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া এই নৌকা-দৌড়ের আনন্দ উৎসবে মাতিয়া যাইতেন। এই বাচ-খেলায় কোন সাম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান এবং মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন। তখনকার দিনে ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সামাজিকতার অভাব ছিল না। একে অন্যকে নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের মত দেখিতেন।

(৮)

শ্রীহট্টে পড়াশুনা ও বাল্যজীবন

শ্রীহট্টে যাইয়াই আমার রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমি কখনই বাংলা পাঠশালায় যাই নাই, একেবারেই ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হই। তবে শ্রীহট্টে যাইয়া বাবা প্রথমে আমাকে ফারসী শিখিবার জন্য এক মৌলবীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই মৌলবীর নিকটে যাইয়া ফারসী বর্ণমালা শিখিয়াছিলাম। হিন্দু যেমন সরস্বতীর নাম লইয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিত, মুসলমানেরা সেইরূপ আল্লাহ্ ও রসুলের নাম লইয়া—লা এলাহ্ এল আল্লাহ মহম্মদ রসুল আল্লা—বলিয়া প্রতিদিনের পড়া সুরু করিত। মৌলবীর নিকটে যাইয়া আমাকেও অন্যান্য পড়ুয়ার মতন এই মুসলমানী মন্ত্র পাঠ করিয়াই আলেক বে, পে, তে, সে, পড়িতে হইত। বর্ণমালা শিখিয়া আমি 'বন্দেনামা' পডিতে আরম্ভ করি। কিন্তু এইখানেই আমার ফারসী পড়া শেষ হয়। বন্দেনামার প্রথম দু-চার লাইন মুখস্থ হইতে না হইতেই বাবা আমাকে মৌলবীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া দেন।

(২)

আমি যখন ইংরেজী স্কুলে যাই তখন শ্রীহট্টে কোন সরকারী স্কুল ছিল না। শুনিয়াছি পূর্ব্বে নাকি একটা সরকারী স্কুল ছিল কিন্তু খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা শ্রীহট্টে গিয়া বসিলে ক্রমে তাহাদের হাতেই লোকশিক্ষার ভার আসিয়া পড়ে। পাদ্রীদের স্কুল খোলা হইলে পূর্ব্বেকার সরকারী স্কুল উঠিয়া যায়। ১৮৬৬ইং অব্দে আমি যাই। তখন শহরে দুইটি ইংরেজী এণ্ট্রেন্স্ স্কুল ছিল,

দুইটাই পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত। একটা শহরের পূর্বদিকে আর একটা ইহার প্রায় কমবেশী এক মাইল দূরে শহরের পশ্চিম প্রান্তে ছিল। পূর্ব প্রান্তের নাম ছিল নয়া শড়ক। স্কুলের নামও ছিল নয়াশড়ক স্কুল। পশ্চিম প্রান্তের নাম ছিল সেখ-ঘাট। স্কুলেরও ঐ নাম ছিল। যতদূর মনে আছে বোধহয় সেখঘাটের স্কুলই বড় ছিল। নয়াশড়ক স্কুলে এণ্ট্রেন্‌স্ পর্য্যন্ত পড়ান হইত কিনা ঠিক মনে নাই, সেখ্‌ঘাট স্কুলে পড়ান হইত জানি। নয়াশড়ক আমাদের বাসার নিকটে বলিয়া আমি প্রথমে নয়াশড়ক স্কুলে ভর্ত্তি হই। তাহার অল্প দিন পরেই সেখঘাট স্কুলে যাইয়া প্রবেশ করি।

শ্রীহট্টের আগেকার সরকারী স্কুলের কথা বেশী কিছু শুনি নাই, তবে শ্রীহট্টে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক ইংরেজ সরকার নহে, পাদ্রীরা, ইহা জানি। রেভারেণ্ড ডব্‌লিউ প্রাইজকে শ্রীহট্টের আধুনিক শিক্ষা-গুরু বলিয়া ইংরেজীনবিসেরা আজিও সম্মান করেন। শ্রীহট্টে প্রথমে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন প্রাইজ সাহেব তাঁহাদের সকলেরই গুরু ছিলেন। আমি প্রাইজ সাহেবকে দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার নিকটে পড়ি নাই। বোধহয় তখন তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়াছিলেন। আব্‌-ছায়ার মতন তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখ এখনও স্মৃতিতে জাগে। শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকেরা শহরের সাধারণ পুস্তকাগারে প্রাইজ সাহেবের নাম ও স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। প্রাইজ সাহেব বাস্তবিক পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের যে স্থান শ্রীহট্টের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে প্রাইজ সাহেবেরও সেই স্থান। শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেকটর স্বর্গীয় নবকিশোর সেন, উকিল-সরকার স্বর্গীয় দুলালচন্দ্র দেব, ইহারাই শ্রীহট্টের ইংরেজী শিক্ষিতদের

প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। নবকিশোর সেন সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া ডেপুটি ইন্স্পেকটর হন। দুলালচন্দ্র দেব মহাশয় ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বি. এ. ও পরে বি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহট্টে যাইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহারা দুইজনেই শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজীনবীসদিগের সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আর ইহারা দুইজনেই প্রাইজ সাহেবের শিক্ষা ও সস্নেহ সহবাস হইতে নিজেদের জীবন ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত, বাংলার খৃষ্টিয়ান সমাজের অন্যতম অধিনায়ক, হাইকোর্টের উকিল এবং ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ান হেরল্ড কাগজের সম্পাদক, পরলোকগত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন। ইনিও প্রাইজ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ কলেজ হইতে একই বৎসরে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। বোধ হয় ডাফ সাহেবের নিকটে ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেরণা ইনি প্রাইজ সাহেবের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন।

(৩)

আমি যখন সেখঘাট স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হই, প্রাইজ সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্কুলে আর রীতিমত পড়াইতেন না। তবে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্ররা বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার নিকটে ইংরেজী সাহিত্যাদি পড়িতেন, ইহা মনে পড়ে। জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় কলিকাতা হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে শ্রীহট্টে গিয়া সেখঘাট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হন। তবে নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। জয়গোবিন্দবাবু

বেশীদিন শ্রীহট্টে শিক্ষকতা করেন নাই। বি. এল. পরীক্ষা দিবার জন্য অল্পদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইঁহার স্থানে স্বর্গীয় দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখঘাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সেখঘাট স্কুলে আমি কতদিন পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। তবে বছরখানেকের বেশী বোধ হয় নহে। এই সময়ে, কি উপলক্ষে ঠিক মনে নাই, শহরের খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠীদিগের একটী বিরোধ বাধিয়া উঠে। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা হিন্দু ধর্ম্মের অপমান করিতেছেন বলিয়া হিন্দু অভিভাবকেরা তাঁহাদের বালকদিগকে পাদ্রীদের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লন এবং নিজেদের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। আমিও তখন সেখঘাটের স্কুল ছাড়িয়া এই হিন্দু স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হই।

(৪)

সেখঘাটের স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা সূর্য্যঘড়ি ছিল। সূর্য্যের গতি দিয়া এই ঘড়ির সময় নিরূপণ হইত, কিন্তু মেঘলা দিনে ইহা সম্ভব হইত না। এই জন্য স্কুলবাড়ির ভিতরে একটা জল-ঘড়িও ছিল। তখনও দেশে কলের ঘড়ি বেশী আমদানি হয় নাই। দামও এত বেশী ছিল যে লোকে সচরাচর কিনিতে পারিত না। এই জল-ঘড়ি ছিল জলভরা একটা হাঁড়ি ও ছোট ছিদ্রসহ পিতলের বা কাঁসার একটা বাটি। এই হাঁড়িতে জল পুরিয়া তাহাতে বাটিটা ভাসাইয়া রাখা হইত। বাটির ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া বাটিটা ভরিতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিত। আর বাটি ডুবিয়া গেলেই ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যাইত। এই হাঁড়ি ও বাটি স্কুলের লাইব্রেরী-ঘরের এক কোণায় থাকিত। বৈকালে ৪টার সময় স্কুল ছুটি হইত। তখন ছোট ছোট ছেলেরা ছুটি পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিত এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

নানা ছল করিয়া বাটির জল ভরিতে কত দেরী আছে দেখিতে যাইত। আর এদিক ওদিক দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী কেহ নাই দেখিলে পেন্সিলের খোঁচা দিয়া ঘড়ির গতি বাড়াইয়া দিত। আঙ্গুল দিয়া দিত না, কেননা ভিজা আঙ্গুলই দুষ্কর্মের সাক্ষী থাকিত। আর ছুটির সময় হইয়া আসিলে স্কুলের চৌকিদারকে ডাকিয়া ঘড়ির কাছে দাঁড় করাইত, যেন বাটি ডুবিবামাত্র ছুটির ঘণ্টা বাজাইতে পারে।

(৫)

পাদ্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শহরের হিন্দু অভিভাবকেরা একটা স্কুল খোলেন এবং আমি সেখঘাট স্কুল ছাড়িয়া এই স্কুলে যাইয়া ভর্তি হই, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই স্কুল শহরের উত্তর প্রান্তে একটা ছোট টিলার উপরে এক 'বাংলা'তে বসে। কিছুদিন পূর্বেও সেই 'বাংলা'টা ছিল। এখন বোধ হয় সেই টিলায় ঐ 'বাংলা'র ভিটাতেই ডাক্তার সাহেব বা সিভিল্ সার্জ্জন বাস করেন। এই স্কুলটা বোধ হয় কম বেশী এক বছর ছিল। এই স্কুলের সঙ্গে আমার বাল্যজীবনের একটা বিশেষ ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। এই সময় শ্রীহট্টে সোডা লেমনেডের একটা কল যায়। ছোট শহর, গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস, এখানে সোডা লেমনেডের কাটতি হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। তবে ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে শ্রীহট্টে চা-বাগান খোলা হয়। চীনেরা বহুদিন হইতেই চা পান করিয়া আসিতেছিল। চীন হইতে ইউরোপীয়েরা চা পান শিখিয়া নিজেদের দেশে চায়ের পাতা আমদানি করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ গল্প আছে, প্রথম যখন বিলাতে চা আমদানি হয় তখন কোন কোন ইংরেজ গৃহিণী চায়ের পাতা সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া পাতাগুলি রোষ্ট মাংসের উপর ছড়াইয়া দিতেন। ক্রমে কি করিয়া

চা পান করিতে হয় ইহারা শেখেন। ইহার বহুল প্রচার হইলে চায়ের ব্যবসার সূত্রপাত হয়। এই সময়েই প্রথমে আসামের জঙ্গলে চায়ের গাছ আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই চা বাগানেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। আমার শৈশবে কাছারে এবং শ্রীহট্ট শহরের আশে পাশে অনেকগুলি চা বাগান হয়। এসকল বাগানের মালিক ও মেনেজার ইংরাজ ছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে কয়েকজন ইংরাজ গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের প্রয়োজনেই শ্রীহট্টের কোন ব্যবসায়ী আমাদের ক্ষুদ্র শহরেও একটা সোডা-লেমনেডের কল লইয়া যান। কল মাত্রই লোকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। আমরা, বালকের দল, কি করিয়া কলে সোডা লেমনেড প্রস্তুত হয় ইহা দেখিবার জন্য অনেক সময় এই দোকানে যাইয়া ভিড় করিতাম। ক্রমে দু' একজন এক একটা সোডা-লেমনেড কিনিতেও আরম্ভ করে। বোধ হয় ইহাতে কলওয়ালার চোখ খুলিয়া যায়। শহরের ও শহরতলীর দশ পনের জন ইংরাজ ছাড়াও যে সোডা লেমনেডের খরিদ্দার জুটিতে পারে ইহা বুঝিয়া সে আমাদের স্কুলে প্রতিদিন ঝুড়ি ভরিয়া সোডা ও লেমনেড পাঠাইতে আরম্ভ করিল। বন্দুকের মত শব্দ করিয়া ছিপি উড়িয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জল উথলিয়া উঠে, ইহা দেখিবার জন্য ছেলেরা চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইত। আর অনেকেই লেমনেড কিনিয়া খাইতেও আরম্ভ করে; মুসলমানের ছোঁয়া জল খাওয়াতে জাত যায় একথা কাহারও মনে উঠে নাই। কাহারও কাহারও মনে উঠিলেও জাত রক্ষার জন্য তাহারা লেমনেডের লোভ ছাড়িতে রাজী ছিল না। সুতরাং প্রতিদিন এই নূতন হিন্দু স্কুলের বালকদিগের মধ্যে বিস্তর সোডা-লেমনেড বিক্রী হইতে আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা ইহার খোঁজও পাইলেন না, সন্ধানও করিলেন না। অজ্ঞাতসারে হিন্দুর জাতকুল নষ্ট হইতে আরম্ভ

করিল। অভিভাবকেরা খবর পাইলে কি করিতেন তাহা বলা যায় না।

(৬)

এই সময়ে, অথবা ইহার অল্পদিন পূর্বে, বিস্কুট খাওয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী কাছারের হিন্দু সমাজে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। শ্রীহট্ট হইতে কাছার বোধ হয় সত্তর পঁচাত্তর মাইল দূরে। কিন্তু চলাচলের সুবিধা না থাকিলেও দুই শহরের মধ্যে লোক যাতায়াত করিত। কাছারের প্রায় সকল চাকুরিয়াই শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। চায়ের ব্যবসা আরম্ভ হইলে শ্রীহট্টের লোকেরাই কাছারে গিয়া চা বাগানের কেরানী হন। এই জন্য দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও শ্রীহট্ট ও কাছাররে হিন্দুসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাছারের নূতন ইংরেজীনবীসেরা যখন নিজেদের সখের বৈঠকে চায়ের সঙ্গে প্রথমে বিলাতী বিস্কুট খাইলেন, তখন সে কথা কাছারেও চাপা রহিল না, শ্রীহট্টেও রাষ্ট্র হইতে দেরী হইল না। উভয় সমাজই এই অভাবনীয় অনাচারের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অনাচারী বিদ্রোহীরা তখন যথারীতি মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজচ্যুতির নিদারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইল। সমাজপতিগণের মনের গতি যখন এরূপ ছিল, তখন শ্রীহট্টের হিন্দু বালকেরা দলে দলে মুসলমানের তৈয়ারী সোডা-লেমনেড পান করিতেছে—একথাটা রাষ্ট্র হইলে শ্রীহট্টেও স্বল্পবিস্তর একটা হুলুস্থুল বাধিয়া যাইত।

(৭)

শহরে রাষ্ট্র হয় নাই বটে, কিন্তু দুর্দৈববশে আমার এই

দুষ্কর্মের কথা বাবার কানে উঠিতে বেশী দিন লাগিল না। আমার ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমার হাতে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। যখন যাহা প্রয়োজন হইত লোক দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া দিতেন। মা'ও এবিষয় অত্যন্ত কড়া শাসন করিতেন। হাতে পয়সা পড়িলে ছেলে নষ্ট হইয়া যায়, তখনকার সমাজের শিক্ষিত অভিভাবকদিগের মধ্যে এই আশঙ্কাটা অতিশয় প্রবল ছিল। এই জন্য ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি কোন দিন হাতে পয়সা পাই নাই। অথচ লোভে পড়িয়া অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে স্কুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম, সে লেমনেডের পয়সা দেওয়া হয় নাই। একদিন কাছারি যাইবার সময় বাবা পোষাক পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় অপরিচিত এক মুসলমান আসিয়া আমার খোঁজ করিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিল, স্কুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম তার দাম বাকী আছে। বোধহয় দু' আনা কি তিন আনা তার পাওনা ছিল। বাবা আমাকে ডাকিয়া তাহার মোকাবিলা করাইয়া তখনই তাহার প্রাপ্য পয়সা দিয়া দিলেন। আর সে চলিয়া যাইবা মাত্র আমাকে বেদম প্রহার করিলেন। সেদিন হইতে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া পাদ্রী-স্কুল হইতে ছাড়াইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এখানেও যদি জাত ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে ইংরেজী পড়াই বন্ধ করিতে হইবে। আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইল।

(৮)

সেবারে, কি কারণে মনে নাই, পূজার পরে মা বাবার সঙ্গে শহরে আসেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মা যতদিন না শহরে আসিয়াছেন ততদিন আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ ছিল। বোধহয় হয় মা চার পাঁচ মাস গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন। ইহার পরে মা যখন শহরে আসিয়া আমার লেমনেড খাওয়ার কাহিনী শুনিলেন ও এই অপরাধে আমার যে দণ্ড হইয়াছে দেখিলেন, তখন বাবাকে বুঝাইয়া আমার এই দণ্ড খণ্ডন করিলেন। ছেলেটাকে মূর্খ করিয়া রাখিয়া ফল কি? আর কালের গতিতে সমাজে কত অনাচার ত চলিয়া যাইতেছে, লেমনেড খাওয়া ত সামান্য কথা। এইজন্য ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কিছুতে কর্ত্তব্য নয়। সমাজের বাঁধন কতটা যে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল মা যতটা জানিতেন বাবার তখনও ততটা জানিবার অবসর হয় নাই। আমার মাতুলেরা ও জেঠতুতো খুড়তুতো ভায়েরা যে সকল কথা মায়ের কাছে কহিতেন বাবার কাছে তাহা মুখে আনিতে সাহস করিতেন না।

(৯)

এসম্বন্ধে একটা ঘটনা মনে আছে। একবার নবদ্বীপের একজন গোঁসাই শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইনি পদাবলী কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। বোধহয় ভাগবতেও কিছু দখল ছিল। বাহিরে বৈষ্ণবের আচরণীয় তিলক কণ্ঠি প্রভৃতি ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া উপবীতও ছিল। কিন্তু জাতটাত মানিতেন না। বৈষ্ণব গোঁসাইরা নিরামিষাশী। এই গোঁসাই ঠাকুর দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন ভিতরেও তেমন সৌখীন ছিলেন এবং রূপের অনুরূপ নাগরিক প্রবৃত্তি এবং ভোগলিপ্সাও ছিল। মদ্যপান করিতেন কিনা জানি না, আমাদের জানিবার অবসরও ছিল না, কারণ বাবা সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের বংশে বোধহয়

কেহ কখনও মদ্যপান করেন নাই। গোঁসাই ঠাকুর কিন্তু সুবিধা মত পাইলে মাছ মাংস ছাড়িতেন না। শ্রীহট্টের ভদ্র সমাজে বন্য বরাহের মাংস একেবারে বর্জ্জনীয় ছিল না। পাহাড়তলীতে ও বনজঙ্গলে, এখনকার কথা বলিতে পারি না আমার বাল্যকালে, বন্য বরাহের খুবই উপদ্রব ছিল। কৃষকেরা বরাহের উৎপাতে আপনাদিগের শস্যাদি রক্ষা করিতে বিস্তর বেগ পাইত। মাঝে মাঝে দাঁতাল বরাহ গ্রামে ঢুকিয়া সুবিধা পাইলে মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিত। সুতরাং শিকারীরা প্রায় পার্বত্য অঞ্চলে বরাহ শিকার করিতেন। অন্ত্যজ জাতিরা বন্য এবং গৃহপালিত উভয় জাতীয় শূকরের মাংসই স্বচ্ছন্দে ভোজন করে। কিন্তু বন্য বরাহ শিকার হইলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিও সুযোগ পাইলে ইহার উপরে ভাগ বসাইতে ছাড়িতেন না। শ্রীহট্ট শহরে মাঝে মাঝে শাক্ত ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে বন্য বরাহ মাংস আমদানী হইত। বন্য বরাহের মাংস অতিশয় সুস্বাদু, কোমল ও স্নেহযুক্ত। এই গোঁসাই ঠাকুরের শ্রীহট্টে অবস্থিতি কালে একবার আমার জেঠতুত ভাই কতকটা বরাহ মাংস সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমার পিতৃকুল বৈষ্ণব হইলেও মাতৃকুল ঘোর শাক্ত। আমার মাতামহীর পিত্রালয়ে এককালে রীতিমত মদ চোলাই হইত। ইংরেজের আবগারী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও একেবারে সেখানে এ কাজ বন্ধ হয় নাই। সে সমাজে বন্য বরাহের মাংস হিন্দুর অখাদ্য ছিল না। সুতরাং মা এই মাংস রাঁধিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

তবে বাবাকে লুকাইয়া এ'কাজটা করিতে হইল। গোঁসাই ঠাকুর বন্য বরাহের ব্যঞ্জনের সন্ধান পাইয়া তাহা আস্বাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার জেঠতুত ভাই মাকে আসিয়া সে কথা বলেন। মা প্রথমে ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিজের রান্না খাইতে

দিতে রাজী হন নাই, বোধহয় শেষে হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনাতেই দেশে জাতটা যে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে মা ইহা বেশ টের পাইয়াছিলেন। আর এই কারণেই জাত রাখিবার জন্য ছেলের লেখাপড়া বন্ধ করা তাঁহার চক্ষে কিছুতেই সমীচীন বোধ হইল না। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া আমাকে আবার স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। মা যদি এটি না করিতেন, তবে আমি আমরণ হয়ত গ্রাম্য জীবনের সঙ্কীর্ণতা এবং দলাদলির মধ্যেই পড়িয়া থাকিতাম। অথচ আমার মা বর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই।

(১০)

এই প্রথম লেমনেড খাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়িল। সেই বছরেই বোধহয় কিংবা তার পরের বছর চৈত্র মাসে একদিন হঠাৎ অতি প্রত্যূষ হইতে আমার পাৎলা দাস্ত আরম্ভ হয়। বাবা এসকল বিষয়ে সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবারবর্গের খবর রাখিতেন। কাহারও অতি সামান্য অসুখও প্রায় তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারিত না। এসময়ে মা শ্রীহট্টের বাসায় ছিলেন না। আমি বাবার কাছেই শুইতাম। অত ভোরে পায়খানায় যাইতেছি দেখিয়া বাবা শশব্যস্ত হইয়া আমার সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন। চৈত্র বৈশাখ মাসে শ্রীহট্টে প্রায় বিসূচিকার আক্রমণ দেখা যাইত। এ বছরও শহরে কলেরা দেখা দিয়াছে। আমার সামান্য পেটের অসুখেই বাবা অত্যন্ত ভয় পাইলেন। সেদিন কাছারিতে গেলেন না। এইজন্য আমার অসুখের কথা শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। অপরাহ্নে আদালতের যত উকীল, হাকিম ও অন্যান্য কর্ম্মচারী আমাকে দেখিতে আসিলেন। লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। আমার দাস্ত তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেশ পিপাসা আছে। এই পিপাসার

উপশমের জন্য ডাক্তার আমাকে লেমনেড দিতে বলিলেন। অমনি বাজার হইতে লেমনেড আসিল। অবশ্য মুসলমানের কলে, মুসলমানেরই তৈয়ারী, মুসলমানের ছোঁয়া লেমনেড। বাবা নিজের হাতেই সেই লেমনেড গ্লাসে ঢালিয়া আমার মুখে ধরিলেন। এই লেমনেড খাইয়া যে মার খাইয়াছিলাম, তখনও সে কথা ভুলি নাই। এবার বাবার উপরে তার শোধ তুলিবার জন্য সেই ঘর-ভরা লোকের মাঝখানে, মুসলমানের ছোঁয়া জল কিছুতেই লইব না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। বাবা বলিলেন, এতে দোষ নাই। ঔষধেতে এসকল আচারবিচার চলে না। ঔষধ সকল অবস্থাতেই নারায়ণের প্রসাদ বা চরণামৃতের মত, ঔষধরূপে নারায়ণ। এইরূপ সাধ্য সাধনার পরে আমি অনেক কেঁড়েলি করিয়া শেষে বাবার নিজের হাতে মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাইলাম।

(১১)

বাবা একদিকে আমার জাতকুল রাখিবার জন্য ইংরেজী পড়া বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন; আবার অন্যদিকে এই লেমনেড খাওয়ার কিছুদিন পূর্বে বা পরে পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া অজ্ঞাতসারে আমাকে নিজের হাতে সাহেবীয়ানায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইসময় শ সাহেব নামে এক ইংরেজ শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। তিনি সপরিবারে কিছুদিন শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। বোধহয় শ্রীহট্ট হইতে অবসর লইয়া বিলাত চলিয়া যান। শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার 'বাংলা'র যাবতীয় ভারী ভারী আসবাব নিলাম হয়। বোধহয় শ সাহেবের এগারো বার বছরের একটি বালক ছিল। জজ সাহেবের আসবাবের মধ্যে এই বালকের ব্যবহারোপযোগী ছোট চেয়ার, টেবিল, আলনা, টেপয় বা ত্রিপদী প্রভৃতি ছিল। বাবা এই নিলামে

ইংরেজ বালকের এই আসবাবগুলি আমার জন্য কিনিয়া আনেন। ইহার ফলে এগারো বারো বছর বয়স হইতেই চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হই। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য আসবাবের ও বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ বাবা ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। অতি অল্প লোকেই এই মোটা কথাটা সচরাচর তলাইয়া দেখেন। ইংরেজ বালকের ব্যবহারোপযোগী টেবিল ও চেয়ারের ভিতর দিয়া বাল্যকালেই আমার ভিতরে সাহেবীয়ানার দিকে একটা ঝোঁক জন্মিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সাহিত্যের চর্চার সঙ্গে প্রথম যৌবনে এই আসক্তিটা কতকটা উৎকট আকারেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

(১২)

আমরা বৈষ্ণব গোঁসাইদিগের শিষ্য হইলেও আমাদের আত্মীয় কুটম্বেরা ঘোর শাক্ত ছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল আমার মাতৃকুলই যে শাক্ত ছিলেন তাহা নহে, বাবার মাতৃকুলও শাক্ত ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ কর্ম্ম উপলক্ষে শহরে বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বাবার একজন আপনার মাসতুত ভাই ছিলেন। ইঁহাকে আমি জেঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের বাসার নিকটেই আমার এই জেঠামশাই তাঁর এক আত্মীয়ের একই হাতায় বাস করিতেন। এঁরা দুজনে শহরের কারণ সাধকদিগের একরূপ দলপতি ছিলেন বলিলেও হয়। এমনও শোনা গিয়াছে, জ্যোৎস্না রাত্রে রাজপথে চলিতে চলিতে ইঁহারা মাঝে মাঝে নদী ভ্রমে শুখনা ডাঙ্গায় সাঁতার কাটিবার প্রয়াস করিতেন। একবার নাকি ইঁহাদের একজন বাতাসা ভাবিয়া টিকিয়া চিবাইয়া—মা একি করিলে, বাতাসার স্বাদ পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিলে—

বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। আমার জেঠামহাশয় একবার শুম্ভ নিশুম্ভ বধের যাত্রার পালা দেখিতে যাইয়া যে বালককে চণ্ডী সাজাইয়া আসরে নামান হইয়াছিল তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের বাসায় কারণের এতটা ব্যবহার ছিল বলিয়া আমি আমার জেঠাইমায়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের ওখানে যাইয়া খাইতে বড় নারাজ ছিলাম। তিনি আমার জন্য কত যত্ন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন, কিন্তু খাইতে বসিয়াই আমার মনে হইত, এসকল ভাল ভাল তরকারীতেও বুঝি মদ দেওয়া হইয়াছে। মাকে আসিয়া একথা বলিতাম। মা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু এত মদ যাঁরা খান তাঁদের খাদ্যে মদ দেওয়া হয় না ইহা আমার ধারণাতে আসিত না। বাল্যকাল হইতে সেই যে মদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল ইহাতেই আমাকে এই দীর্ঘ জীবনে অশেষ প্রলোভনের মধ্যেও সুরাপানের অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রলোভন বলিলাম এও কেবল একটা কথার কথা মাত্র। কারণ মদের প্রলোভন যে কি ইহা আমি এজীবনে অনুভব করি নাই।

(১৩)

১৮৬৯ ইংরেজীতে আবার গভর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয়। পাদ্রীদের স্কুল ছাড়িয়া যাহারা হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের ইজ্জৎ রাখিবার জন্য নিজেরা নূতন স্কুল করিয়াছিলেন তাঁদের চেষ্টাতেই এই গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার বাবা তাহাদের মধ্যে ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখঘাট মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনিই নূতন গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখঘাট স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকেরাও গভর্ণমেণ্ট

স্কুলে আসিয়া যোগ দেন। ইহার ফলে সেখঘাট স্কুল একপ্রকার উঠিয়া যায়। একরূপ বলিতেছি এইজন্য যে তখনও ঐ স্কুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল কিনা মনে নাই। আর এও অনুমান হয় গভর্ণমেণ্টের কতৃপক্ষেরা পাদ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া এই নূতন গভর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপন করেন নাই। পাদ্রীরাও বোধ হয় আর এ ভার বহন করিতে পারিতেছিলেন না।

শ্রীহট্ট শহরের নিকটে এক ছোট পাহাড়ের উপরে একটি বড় পাকা কোঠা ছিল। এই কোঠাতে তখন বারিক আফিস বা পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের দপ্তর ছিল। এই বাড়ীতেই গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পাহাড়কে মনারায়ের টিলা বলিত। এখন গভর্ণমেণ্ট স্কুল আর সেখানে নাই। শহরের মাঝখানে নদীর ধারে উঠিয়া আসিয়াছে। স্থানটি অতি মনোরম। শহরের কোলাহল হইতে অনেক দূরে। একেবারে উত্তর প্রান্তে বলিলেই হয়। টিলার নীচ হইতে একটা পাকা সিঁড়ি কোঠার বারাণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়া উঠিয়াছে। স্কুলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমরা সমস্ত শহরের দৃশ্যটা দেখিতে পাইতাম। পাহাড়ের নীচে খানিকটা সমতল ভূমি ছিল। সেটাই আমাদের খেলার মাঠ ছিল। দক্ষিণ দিকে টিলার গা বাহিয়াও ইচ্ছা হইলে আমরা উপরে উঠিতে পারিতাম। নামিবার সময় সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া অনেকেই পাহাড়ের গা দিয়া ছুটিয়া নামিত। উত্তর দিকে একটা গভীর খাদ ছিল। সেই খাদ দিয়া ঝর্ণার জল কল্ কল্ করিয়া দিবানিশি প্রবাহিত হইত। ইহারই পূর্বদিকে আর একটা অপেক্ষাকৃত নীচু টিলা ছিল, এখনও আছে। আমার বাল্যকালে এই টিলায় জজ সাহেব থাকিতেন। সুতরাং আমরা বালকের দল সেদিকে বড় যাইতাম না। বোধহয় ১৮৭৯ কি ১৮৮০ ইংরেজীতে গভর্ণমেণ্ট স্কুল মনারায়ের টিলা হইতে

শহরের মাঝখানে লালদীঘি নামে যে একটা বড় দীঘি আছে তাহার পশ্চিম পারে উঠিয়া আসে। এখান হইতে এখন নদীর ধারে উঠিয়া গিয়াছে।

(১৪)

আমাদের স্কুল শহরের এক প্রান্তে হইলেও আমরা হাঁটিয়াই স্কুলে যাইতাম। সেকালে শ্রীহট্টে দুখানা মাত্র গাড়ী ছিল। একখানা টম্‌টম্, আর একখানা সাধারণ চার চাকার গাড়ী। দুখানাই দুজন উকীলের ছিল। একজন নিজেই তাঁহার টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আদালতে যাইতেন। ইহার বংশধরেরা এখন কে কোথায় আছেন জানি না। অন্য গাড়ীখানা ছিল ৺ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের। ইনি একজন বড় জমিদার। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রায় সুখময় চৌধুরী বাহাদুর শহরের একজন গণ্যমাণ্য লোক, অনারারী মেজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার। ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী আসাম ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের দলপতি। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে দুর্গাচরণ চৌধুরী ও ব্রজনাথ চৌধুরী এই দুইজনের দুইখানা গাড়ী ছিল। তবে ইঁহারাও যে সর্ব্দা গাড়ী চড়িয়া আদালতে যাইতেন, তাহা নহে। শহরের সকল সম্ভ্রান্ত লোকই পায়ে হাঁটিয়া নিজেদের কর্ম্মস্থলে যাইতেন। তবে হাকিম এবং উকিলদের সঙ্গে একজন করিয়া লোক খুব বড় বাঁশের ছাতা তাঁহাদের মাথার উপরে ধরিয়া যাইত। এ ছাতার পরিধি সাত আট হাত হইবে। ইহারাই নথীপত্রের বোচকাও পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। এই ছাতাই সেকালে আমাদের শহরে বড়লোকের নিদর্শন ছিল।

এখন যেমন তখনও সেইরূপ সাড়ে দশটায় স্কুল বসিত ও চারিটায়

ছুটি হইত। মাঝখানে দেড়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা খেলার বা খাবার ছুটি হইত। এই ছুটির সময়ে এখনকার মত আমার বাল্যকালে স্কুলের হাতায় কোন খাবার জিনিষ বিক্রী হইত না। ছেলেরা বাড়ী হইতে কোন জলপানির পয়সাও পাইত না। ছুটির পরেই বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে যা কিছু খাইতে হইত।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার বাল্যকালে শ্রীহট্ট শহরেও এখনকার মতন সন্দেশ, রসগোল্লা বা লুচি, কচুরি, গজা প্রভৃতি খাবার মিলিত না। ছানার সংবাদ তখনও সে দেশে পৌঁছায় নাই। বাজারে এক জিলাপি মাত্র পাওয়া যাইত। আটা ময়দা মিলিত না, শহরে প্রস্তুত হইত না, বাহির হইতেও আমদানি হইত না। নারিকেলের মিষ্টদ্রব্যই গৃহস্থেরা বিশেষ বিশেষ পর্বাহে বা যজ্ঞাদিতে ব্যবহার করিতেন। এই সকল মিষ্টান্নে সুনিপুণ স্ত্রীশিল্পের পরিচয় পাওয়া যাইত। নারিকেলের চিঁড়া জিরা এবং গঙ্গাজলী নামে সন্দেশ আজিও পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। আমার বাল্যকালে এছাড়া আর কোন মিষ্টান্ন আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। আর এসকল বাজারে মিলিত না।

বালকেরা চারিবেলাই ভাত খাইত। প্রাতঃকালে গরম ভাত এবং ঘিই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে হাঁসের ডিম সিদ্ধ কিম্বা কোন তরকারী ভাতেও পাইতাম। দশটার সময় স্নানান্তে আবার ভাত ডাল ও একটা মাছের তরকারী দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া স্কুলে যাইতাম। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ভাতই খাইতাম। এসময় নিরামিষ ব্যঞ্জনাদিই বেশী থাকিত। আমার এক জেঠাইমা আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। এই জেঠাইমা ঠিক আমাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন না। তবে তাঁহার সন্তানাদি কেউ ছিল না। অসহায় বৈধব্যে বাবা

তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন। এই ভাবেই ইনি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া যান এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। ইঁহার পাকশালে যে নিরামিষ রান্না হইত স্কুল হইতে আসিয়া আমাদের খাইবার জন্য তাহা রাখা হইত। এইরূপে মধ্যাহ্ন আহার অপেক্ষা এই বৈকালের আহারেই বেশী তরিতরকারী মিলিত।

মায়ের বাৎসল্যের বিশিষ্টতা

আমাদের বাসায় আমরা প্রায় আট দশ জন বালক ছিলাম। অনেকেই আমাদের সম্পর্কিত; দু'একজন একেবারে নিঃসম্পর্কিতও ছিল। শহরে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা ইহাদের ছিল না বলিয়া ইহাদের অভিভাবকেরা বাবাকে ইহাদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। সাধ্যাতীত না হইলে বাবা কোনদিন এরূপ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেন না। এইজন্য আমার নিজের ভাই না থাকিলেও সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত প্রায় আট দশ জন বালক আমাদের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিত। প্রতিদিন স্কুল ছুটি হইলে আমরা সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিতাম, মা প্রায়ই নিজের হাতে আমাদের সকলকে খাওয়াইয়া দিতেন। একটা বড় গাম্‌লায় একরাশ ভাত লইয়া বসিতেন, আমরা বৃত্তাকারে তাঁহার সম্মুখে ও পাশে বসিয়া যাইতাম। আমার ভগিনীও আমার সঙ্গে বসিয়াই খাইত। এ খাওয়ানোর কথা জীবনে ভুলিব না, মরণেও ভুলিয়া যাইব কিনা জানি না। কারণ এ কেবল সামান্য ভাত ডাল খাওয়ানো ছিল না, ইহা আমাদের পরিবারে একরূপ প্রতিদিনের বাৎসল্য-উৎসব ছিল।

আর এ কথা মনে আছে ও চিরদিন মনে থাকিবে এইজন্য যে, এই খাওয়ানোর ভিতর দিয়া আমার মায়ের চরিত্রের একটা দিক আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কত বছর ধরিয়া এইরূপে দিনের পর দিন স্কুল হইতে আসিয়া সকলে মিলিয়া মায়ের হাতে খাইয়াছি। কিন্তু একদিনও আমি মায়ের সন্তান বলিয়া এক কণা মাছ বা অন্য সুস্বাদু বস্তু অপর অপেক্ষা বেশী পাই নাই। ক্ষুধায় অধীর হইয়া

খাইতে বসিয়াছি, মুহূর্ত বিলম্ব সয় না, কতবার চাহিয়াছি যে প্রথম গ্রাস আমার মুখে পড়ুক, কিন্তু সেই বৃত্তের মধ্যে আমি পাশেই বসি আর মাঝখানেই বসি, যেখানেই বসি না কেন, সর্বদা অপর সকলের পরে মায়ের হাত আমার মুখের কাছে আসিত। ইহাতে আমি চটিয়া যাইতাম। মা কেবল এই খাওয়াইবার সময় নহে অন্য সময়েও বাড়ীতে কোন বিশেষ খাবার হইলে বা বাবার মক্কেলদিগের নিকট হইতে মিষ্টান্নের বা ফলাদির ভেট আসিলে আর সকলকে না দিয়া কখনও আমাকে তার একটুকুও দিতেন না। মার এই ব্যবহারে আমি কেবল চটিয়া যাইতাম তাহা নহে, কিন্তু ক্রমে আমার এই ধারণা হয় যে ইনি আমার বিমাতা ; আমার নিজের মা আমার শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বড় হইয়াও এ সন্দেহটা একেবারে যায় নাই। তখন মা আমাকে একদিন ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁর কথাগুলি কতকটা এখনও আমার মনে আছে। মা কহিলেন—

এখন তুই বড় হইয়াছিস, এখনও কি তুই বুঝিবি না, কেন আমি তোর আগে অপর ছেলেদের যত্ন ও আদর করি। তাদের মা এখানে নাই। আমার আদরযত্নে একটু ত্রুটি হইলে তাদের প্রাণে কত লাগিবে ? তোমাকে ইচ্ছা করিলেও আমি অযত্ন করিতে পারি না। তাহাদের অযত্ন হওয়া অতি সহজ।

আমি কহিলাম—তা যেন হল। কিন্তু কৃপা আমার ছোট ভগিনী যত যত্ন পায় আমি তো তাও পাই না। আমার আগে কৃপা সর্ব্বদাই খাইতে পায় কেন ?

মা কহিলেন—এসংসারে যা আছে সকলি তোমার ও তোমারি থাকিবে। কৃপা ত দু'দিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। এও কি বুঝ না ? যখন ইহা বুঝিলাম তখন মাকে একথা বলিবার আর অবসর পাইলাম না।

শ্রীহট্টের সামাজিক জীবন

আজিকালি বাংলায় তথাকথিত ভদ্র হিন্দু সমাজে আহারে ব্যবহারে জাতিবিচার উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ষাট বৎসর পূর্বে কলিকাতাতেও এবিষয়ে এতটা উদারতা বা ঔদাসীন্য দেখা যায় নাই। শ্রীহট্টের মতন প্রান্তিক জেলায় জাতের খুবই কড়াকড়ি ছিল। তবে আমাদের সমাজে কোনদিনই যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব ছিল এমন বোধ হয় না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণীকে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বলিত। পশ্চিম বাংলায় যে অর্থে ব্রাহ্মণ কায়স্থের গ্রাম কথাটা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে আমার বাল্যকালে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের গ্রাম এই কথা ব্যবহৃত হইত। ভদ্রলোক বলিতে কায়স্থ ও বৈদ্যকেই বুঝাইত। ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র এই ভাবটাই ছিল। কিন্তু ইঁহারা যে কায়স্থ বৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ এই ভাবটা ছিল না। ইহার একটা কারণ বোধহয় এই ছিল যে ঢাকার এত কাছে হইলেও আমাদের অঞ্চলে বল্লালী কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণেরা সকলেই বৈদিক। বারেন্দ্র বা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সে জায়গায় নাই; কিম্বা রাঢ় বা বরেন্দ্রভূমি হইতে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের পূর্বপুরুষ আদিতে শ্রীহট্টে গিয়া থাকিলেও নূতন সমাজে এসকল ভেদ জাগাইয়া রাখেন নাই বা রাখিতে পারেন নাই। আমার বাল্যকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র এসকল কথা পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমাদের ব্রাহ্মণেরা যে বৈদিক শ্রেণীর ইহাও জানিতাম না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই এই মাত্র জানা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে আবার শ্রেণী বিভেদ আছে ইহা সাধারণ লোকে জানিত না। তবে সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল

ব্রাহ্মণের হাতে খান না ইহা জানা ছিল। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সমাজের সকল ব্রাহ্মণের যখন নিমন্ত্রণ হইত তখন প্রায় প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র পাকশাল প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। এসকল নিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে যাহাকে ফলার বলে তাহার ব্যবস্থা ছিল না। দই, চিঁড়া কিম্বা ভাতেরই ব্যবস্থা হইত। সাধারণ শ্রেণীর জন্যই দই চিঁড়ার আয়োজন হইত। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্যদিগের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করিতে হইত। আর তখন প্রায় প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের জন্য পৃথক হাঁড়ির সংস্থান না করিলে চলিত না। এই যে ব্রাহ্মণেরা একে অন্যের হাতে খাইতেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যেও একটা জাতবিচার ছিল। তবে কে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একথা সাধারণ লোকে জানিত না, এ প্রশ্নও তাহারা করিত না। ব্রাহ্মণেরা প্রায় সকলেই পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্থ বৈদ্যাদি তখন আমাদিগের সমাজে মোটামুটি শূদ্র পর্য্যায়েই পড়িতেন। কায়স্থেরা যে পতিত ক্ষত্রিয়, এ কথা তখনও উঠে নাই। শ্রীহট্টের বৈদ্যদিগেরও উপনয়ন সংস্কার হইত না। তাঁহারা উপবীত ধারণ করিতেন না। বৈদ্যে কায়স্থে আদান প্রদান হইত। এইসকল কারণে সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আর লৌকিক বিদ্যায় এবং ধনসম্পত্তিতে ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিজেদের জীবিকার জন্য ইঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। শূদ্রের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদিতে দেবতার নিকটে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরাই ভোগ রাঁধিতেন এবং আমাদের পুরোহিতেরা নিঃসঙ্কোচে আমাদের বাড়ীতে দেবপূজা উপলক্ষে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা অঞ্চলে শুনিয়াছি,

ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই কেবল দেবতাকে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দেওয়া যায়। কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির নাকি এ অধিকার নাই। তাঁহারা কেবল দেবতাকে কাঁচা ভোগই দিতে পারেন। আমরা এ অদ্ভুত কথা শুনি নাই। আমাদের জেলায় এরূপ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব পূর্বে কখনও ছিল না। কালবশে এখন এই ভাবটা নব্যশিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব যে রক্ষা পাইত এ কথাটা জানা ছিল, এবং এমন দুই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার আমাদের অঞ্চলে ছিলেন, যাঁহারা শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না। তবে ইঁহারা বিষয়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের ছোটোখাটো জমিদারী ছিল, টাকা লগ্নি করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে শাস্ত্রীয় ব্যবসায় বা কর্ম্ম অধ্যয়ন অধ্যাপন, ইহারা তাহা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিতেন না। নিজেদের জমিদারীর জোরে ব্রাহ্মণ্যকে ঠেকা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমার বাল্যকালে কেবল একটি মাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা জানিতাম, যাঁহারা কায়স্থ বৈদ্যদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ মোহান্ত ব্রজবিদেহী শান্তদাস বাবাজী এই পরিবারের লোক ছিলেন। পূর্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী। ইনি আমার সতীর্থ ছিলেন। একই বৎসর শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আসিয়া ভর্তি হই। তারাকিশোর বাবুর পরিবারের লোকে শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বেশ একটু জমিদারী তাঁহাদের ছিল, এবং কুসীদ ব্যবসায়ও করিতেন বলিয়া ইঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইতে পারিয়াছিলেন। এরূপ আরও দু'

চারটি বিষয়ী ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন, যাঁহারা শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না।

(২)

এ ছাড়া শ্রীহট্টে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই শূদ্র মুখাপেক্ষী ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর ভদ্রলোকদিগের নিকট অন্ন-ঋণে আবদ্ধ হইয়া ইঁহারা সেকালে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যজন-যাজন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও ইঁহারা অধিকাংশ স্থলেই সেই ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষাও লাভ করিতেন না। পূজা-পদ্ধতির হাতে-লেখা পুঁথি ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিত। সেই পুঁথি মুখস্থ করিয়াই ইঁহারা যজমানদিগকে মন্ত্র পড়াইতেন, নিজেরাও দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক ছিল না বলিলেও হয়। ভদ্রলোকদিগের গ্রামে টোল ছিল। এসকল টোলে ভিন্ন গ্রাম হইতে বড় বড় ব্রাহ্মণ বালকেরা আসিয়া ব্যাকরণ এবং স্মৃতি পড়িতেন। কিন্তু যাঁহারা টোলে পড়িয়া কোন উপাধি পাইতেন, তাঁহারা সাধারণ যজন-যাজন ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। হয় নিজেরা টোল খুলিতেন, না হয় দুর্গোৎসবাদিতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ীতে তন্ত্রধারকের কর্ম্ম করিতেন। এসকল যজ্ঞাদিতে পুরোহিত ছাড়া এক একজন তন্ত্রধারক থাকিতেন। তন্ত্রধারকেরা পুরোহিতকে মন্ত্র পড়াইয়া পূজার অর্ঘ্যাদি দেওয়াইতেন। সাধারণ পুরোহিতেরা অতি অল্পই লেখাপড়া জানিতেন।

(৩)

ঐ সকল অবলম্বনে নানা কৌতুককর গল্পও সৃষ্টি হইয়াছিল।

একটা গল্প শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। এক ব্রাহ্মণ যুবক একবার সাবিত্রী-ব্রত করাইতে যান। তাঁহার পিতাই এসকল ব্রত করাইতেন। কিন্তু এদিন অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ব্রতের পুঁথি হাতে দিয়া পুত্রকে পৌরোহিত্য করিতে যজমানের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। পুত্র এই পুঁথি লইয়া যজমান-বাড়ী যাইয়া ব্রত করাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী-ব্রতের অনুষ্ঠানে এক জায়গায় লেখা ছিল সপ্তসূত্রেন বেষ্টয়িত্বা ইত্যাদি, অর্থাৎ সাতটা সুতো দ্বারা ব্রতের স্থানকে বেষ্টন করিতে হইবে। পুরোহিতপুত্র হাতের লেখা পুঁথিতে স'কে 'ম' পড়িয়া বসিলেন। সুতরাং সপ্তসূত্রেন না পড়িয়া সপ্তমুত্রেন বেষ্টয়িত্বা পড়িলেন। পড়িয়া ব্রতকারিণীকে কহিলেন, ঠাকুরাণী, একটু উঠিতে হইবে। মহিলাটি আরও পূর্বে এই ব্রত করিয়াছিলেন। সুতরাং পুরোহিত-পুত্রের বিদ্যার এই পরিচয় পাইয়া তাঁহার আর এইবার ব্রত সমাপন করা হইল না।

(৪)

শ্রীহট্টের সাহারা

শ্রীহট্ট সাহাপ্রধান স্থান। শহরে সাহারাই ধনসম্পদে হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ। আমার বাল্যকালে আমরা সাহাদিগকে শুঁড়ি বলিয়া ভাবিতাম। এইজন্য শহরের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা ইঁহাদিগের সঙ্গে পানাহার করিতেন না।

হস্তিনা তাড়িতেনাপি ন গচ্ছেৎ শৌণ্ডিকালয়ম্

এই প্রাচীন অনুশাসন স্মরণ করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রলোকেরা সাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতেন না। আমরা বালকের দল, সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠদের মুখে এই শ্লোকটা শুনিতাম। আমার বাবা সাহাদিগের বাড়ীর পুকুরে পা পর্য্যন্ত ধুইতেন না।

শহরের বড় বড় ধনী সাহারা তাঁহার মক্কেল ছিলেন। ইঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আসিলে যতক্ষণ ফরাস হইতে হুঁকো না সরান হইয়াছে, ততক্ষণ তাহাতে বসিতেন না। মুসলমান-দের জন্য যেমন ফরাসের সম্মুখে স্বতন্ত্র চেয়ার বা কেদারা সাজান থাকিত, সাহাদিগের জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল। ইঁহারা আজকালকার কথায় অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া গণ্য ছিলেন। অথচ বিদ্যাবুদ্ধিতে কিংবা ধনসম্পদে ইঁহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

(৫)

শ্রীহট্টে সাহারা সেকালে প্রায়ই বৈদ্যকায়স্থদের ছেলেমেয়ে আনিয়া নিজেদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেন। দরিদ্র বৈদ্যকায়স্থেরা টাকার লোভে উপযুক্ত মূল্য লইয়া সাহাদিগকে নিজেদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতেন। বিক্রয় বলিতেছি এইজন্য যে ইহা স্বজাতির মধ্যে বিবাহে যে বরপণ বা কন্যাপণ গৃহীত হয় সেরূপ ছিল না। সাহাদের পরিবারে কোন কায়স্থ বৈদ্য বালক-বালিকার বিবাহ হইলে তাহারা আর কায়স্থ-বৈদ্যদের সমাজে থাকিতে পারিত না। পিতৃপরিবারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া যাইত। মেয়েরা বিবাহের পরে বাপের বাড়ী আসিতে পারিত না। ছেলেরাও নিজেদের পিতৃমাতৃকুলের স্বজনদিগের সঙ্গে পানাহার করিতে পাইত না। মুসলমান বা খৃষ্টান হইলে হিন্দু যেমন একেবারে জাতিচ্যুত হয়, সাহাদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া বৈদ্য-কায়স্থ ছেলেমেয়েরাও সেইরূপ হইত। অধিকাংশ স্থলে গোপনেই এসকল সম্বন্ধ হইত। মা-বাপ লুকাইয়া কন্যা বিক্রয় করিতেন।

বৈদ্যকায়স্থ অপেক্ষা সাহারা দেখিতে খারাপ নহেন। বিশেষতঃ

ইঁহাদের মেয়েরা সুন্দরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রূপের মোহে অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থবৈদ্য যুবকেরাও নিজেদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে সাহা বাড়ীতে যাইয়া লুকাইয়া বিবাহ করিতেন। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্ট শহরের কায়স্থবৈদ্যরা নিজেদের পরিবারস্থ বালকদের জন্য এই কারণে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। কোন কারণে কোন বালক বা যুবক স্কুল হইতে যথাসময়ে বাড়ী না ফিরিলে ইঁহাদের মুখ শুকাইয়া যাইত।

(৬)

একদিন আমাদের বাসাতেও এইজন্য একটু উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার এক মাসতুতো ভাই তখন আমাদের বাসায় থাকিয়া জিলা স্কুলে পড়িতেন। ইনি আমা অপেক্ষা তিন চার বছর বড় ছিলেন। চিক্কণ শ্যামকান্তি, টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, সুগোল সুঠাম দেহযষ্টি, প্রথম যৌবনের সাড়া পাইয়া তখন অতি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। একদিন শনিবারে তিনি স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁহার খোঁজ নাই। মা প্রথমে নিজেই চারিদিকের আত্মীয়কুটুম্ব বাড়ীতে তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইহাতে কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা বাবার কানে কথাটা তুলিতেই হইল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দুই একটি কায়স্থ বালক এরূপে স্কুল হইতে পলাইয়া গোপনে সাহা বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিল। আমাদেরও সেই আশঙ্কা হইল। অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। পরদিন রবিবার, সেদিনও তাহার খোঁজখবর মিলিল না। এই দুইদিন মায়ের চোখের জল থামে নাই। সোমবার পূর্ব্বাহ্নে স্কুলে যাইবার সময় ভায়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত। বাবা ভয়ে কোন কথা বলিলেন না।

মা ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিলেন। ফলতঃ সে সময়ে শ্রীহট্টের কায়স্থবৈদ্য পরিবার সাহাদের ভয়ে একরূপ জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়ে নিজেদের ছেলেদিগকে শাসন পর্য্যন্ত করিতে সাহস পাইতেন না। কি জানি তাহারা রাগ করিয়া সাহা বাড়ীতে গিয়া যদি জন্মের মত জাতিচ্যুত হইয়া পড়ে।

(৭)

এখন আমরা জানিয়াছি, সাহারা এবং সুবর্ণবণিকেরা কোনদিন হীন জাতি ছিলেন না। প্রাচীন বর্ণবিভাগে ইঁহারা বৈশ্য ছিলেন, অথচ ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বর্ণাশ্রমই মানিতেন না। যুগাবতার ভগবান বুদ্ধদেব প্রাচীন বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞ এবং যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রভাব নষ্ট গিয়াছিল। নূতন বৌদ্ধ সমাজে বর্ণভেদ ছিল না। শ্রমণ ও গৃহস্থ, বৌদ্ধেরা এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং বৌদ্ধ সমাজের শক্তি নষ্ট হইলে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। এই যুগসন্ধি সময়ে যে সকল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ নিজেদের শীল ও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিলেন। এইভাবেই সাহা, সুবর্ণবণিক, যোগী প্রভৃতি হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হইলেন। নতুবা কুলে, শীলে, বিদ্যায় বা বিনয়ে, সদাচারে বা সাংসারিক সম্পদে ইঁহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না, এবং হীন নহেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণের নিকটে নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সমাজ-ব্যবস্থা বিসর্জ্জন দিতে নারাজ হইয়াই ব্রাহ্মণ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন। বিগত

২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা এসকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন। আমার বাল্যকালে এসকল কথা কাহারও জানা ছিল না, সুতরাং তখনকার লোকে সাহাদিগকে শুঁড়ি ভাবিয়া সমাজের বাহিরে রাখিয়াছিল। হিন্দুসমাজ এখনও প্রকাশ্যভাবে এই পুরাতন অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। তবে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে একদিকে বর্ণাশ্রম যেমন ভাঙিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ সাহা, সুবর্ণবণিক, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতার মূল কারণ জানিয়া তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা এখন আর ইহাদিগকে আগেকার মত হীন চোখে দেখেন না।

(৮)

সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও অন্যান্য পরিবার

শহরের হিন্দু সমাজে একদিকে সাহা এবং অন্যদিকে কায়স্থবৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকদের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রকারের কৌমগত বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না। জমি-জেরাত লইয়া যেমন হিন্দুতে সেইরূপ হিন্দু-মুসলমানেও মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হইত না। শ্রীহট্ট শহরে এবং বোধহয় সমস্ত জেলার মধ্যেই শহরতলীর মজুমদারেরা মুসলমান সমাজে অগ্রণী ছিলেন। আমার বাল্যকালে সৈয়দ বকৃত মজুমদার মহাশয় এই পরিবারের কর্তা ছিলেন। ইনি অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। একাধিকবার হজ করিয়া হাজি উপাধি পাইয়াছিলেন। ধনে, মানে, বিদ্যায়, শীলতায় ইঁহারা শহরে অতিশয় সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইঁহাদের বাড়ী শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমারত ছিল।

যেমন বাড়ী সেইরূপ তার সাজসজ্জাও ছিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান, ভিতরে বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠন শোভিত বৈঠকখানা, ইংরেজী ফ্যাসানে সজ্জিত। বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচারীরা শ্রীহট্টে আসিয়া ইঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তখন শ্রীহট্ট বাংলার ছোটলাটের এলাকাভুক্ত ছিল। ছোটলাট সফরে গিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থিত হইতেন। আসামে একটা পৃথক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইলে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৪ ইংরেজীতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সে সময়ে আমার মনে আছে মজুমদার মহাশয়েরা খুব ঘটা করিয়া তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন।

কিন্তু সেকালে শ্রীহট্টের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই জানিত, মজুমদার মহাশয়ের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজে তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস দস্তিদার। দস্তিদার নবাবী উপাধি, দাস কৌলিক পদবী। আমার মায়ের মাতামহ বংশ দাস ছিলেন। ইঁহাদেরও দস্তিদার উপাধি ছিল। হরমণি দস্তিদার নামে আমার এক মাতুল ছিলেন। তিনি সচরাচর গ্রামের বাড়ীতেই বাস করিতেন। শহরে আসিলে আমাদের বাসায়ই উঠিতেন; সে সময় প্রায়ই মজুমদার মহাশয়দের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞাতি বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতেন।

শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে এক ঘর দাস দস্তিদারও ছিলেন। শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ আসন ছিল। মজুমদার মহাশয়দের মত না হউক, ইঁহারাও গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। হরমণি দস্তিদার মহাশয় ইঁহাদেরও জ্ঞাতি ছিলেন। তখন আমরা জানিতাম মজুমদার এবং দস্তিদার, উভয় পরিবার একই বংশের। এক শাখা কোন কারণে মুসলমান হন, আর এক শাখা হিন্দুই থাকিয়া

যান। দস্তিদারদের তখনকার একমাত্র কুল-প্রদীপ নবকৃষ্ণ দস্তিদারের এক ক্লাশে আমি পড়িয়াছি। তখন ইঁহার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর ঘনিষ্ট বন্ধুতাও জন্মিয়াছিল। কিছুদিন হইল নবকৃষ্ণ দস্তিদার মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে এখন বোধ-হয় একজন আসামে হাকিমি করেন, প্রাদেশিক সার্ভিসভুক্ত। আর একজন কিছুদিন পূর্বে নূতন আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। মজুমদারেরা যে এককালে ইঁহাদের জ্ঞাতি ছিলেন, দস্তিদারেরা ইহা স্বীকার করিতেন। সেকালে মজুমদারেরাও এসম্বন্ধ অস্বীকার করিতেন না। বাল্যকালে আমরা জানিতাম, শ্রীহট্টের মুসলমান মজুমদারেরা এবং হিন্দু দস্তিদারেরা উভয়েই হবিগঞ্জের অন্তর্গত দাসপাড়া গ্রাম হইতে আসিয়া সহরতলিতে বাড়ী করেন।

(৯)

মহরম পর্ব ও সাহজালালের দরগা

শহরের দক্ষিণে নদী। এই নদীর নাম সুর্ম্মা, সুরমা নহে। অনেকে সুর্ম্মাকে সুরমা ভাবিয়া থাকেন। সুর্ম্মা ফার্সী শব্দ, অর্থ কাজল। এই কাজল অর্থে ফার্সী সুর্ম্মা নামেই আমাদের নদীর নাম হইয়াছিল। এই নদী যখন মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তখন তাহার জল নাকি কালিন্দীর জলের মতন কজ্জল বর্ণের ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণ দিয়া এই সুর্ম্মা নদী প্রবাহিত। নদীর পারে খিভা নামে একটা বড় মুসলমান গ্রাম আছে। খিভার মুসলমানেরা সে অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাদের লাঠির প্রতাপে নিকটবর্তী হিন্দু মুসলমান সর্বদাই শঙ্কিত থাকিত। মহরমের সময় ইহারা যখন

ভাবোন্মত্ত হইয়া লম্বা লম্বা লাঠি উচাইয়া, দীন দীন রবে শহরের মাঝখান দিয়া তাজিয়ার কবর দিবার জন্য ইদ্‌গার ময়দানের দিকে ছুটিয়া যাইত, তখন বাস্তবিকই লোকে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। অন্যান্য গ্রামের তাজিয়ার সঙ্গে পাঁচজন কনেষ্টবল ও একজন হেড কনেষ্টবল থাকিতেন, খিভার আখড়ার তাজিয়া যখন বাহির হইত তখন শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ সাহেব স্বয়ং এবং মাটি দিবার দিনে আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া এই মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে ছুটিতেন। এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা যে হইত না তাহা নহে, কিন্তু সে মাথা ফাটাফাটি হইত মুসলমানে মুসলমানে, লাঠালাঠি হইত এক আখড়ার সঙ্গে আর এক আখড়ার, হিন্দু মুসলমানে কোন দিন কোন বিবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা শহরের অন্যান্য হিন্দুদিগের সঙ্গে ইদ্‌গার ময়দানের চারিদিকের ছোট ছোট টিলাতে গিয়া ভিড় করিয়া বসিতাম। মাঝখানে লাঠিখেলা আগুনখেলা প্রভৃতি হইত। শান্তিতে নির্ভয়ে, ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে লইয়া এই তামাসা দেখিতাম। তখন মুসলমানের পর্ব উপলক্ষে এসকল আমোদ প্রমোদে হিন্দুরা নির্বিঘ্নে যোগদান করিতেন; আর মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের পর্বাহে তাহাদের আমোদ প্রমোদে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন।

(১০)

শ্রীহট্ট বহু শতাব্দী হইতে মুসলমানদের একটা পীঠস্থান হইয়া আছে। শহরের উপকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সাহজালালের সমাধি আছে। এই সমাধির সংলগ্ন একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা, হিন্দু মুসলমান সকলেই ইহাকে সাহজালালের দরগা বলিয়া জানেন। সাহজালাল চিরকুমার ছিলেন। জীবনে

তাঁহার এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কখনও ভঙ্গ হয় নাই। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রমণীমুখ দর্শন করেন নাই। এইজন্য মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরেও তাঁহার কবরের নিকটে কিংবা কবরসংলগ্ন মসজিদের চত্বরে স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার নাই। স্ত্রীলোকেরা মস্‌জিদের নীচে, দরগার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া পীর সাহেবের উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি-অঞ্জলি অর্পণ করেন এবং দরগায় সিন্নি দেন। মুসলমান এবং হিন্দু মহিলা উভয়েই সমভাবে সাহজালালের মস্‌জিদ দেখিতে গিয়া এইরূপে এই দরগা পরিক্রমণ করিয়া থাকেন।

(১১)

শ্রীহট্টের সাহজালালের দরগা যেমন মুসলমানদিগের একটা পীঠস্থান, দুর্গাবাড়ী সেইরূপ হিন্দুদিগেরও ছোটখাট এক পীঠস্থান। কেহ কেহ বলেন যে, তন্ত্রোক্ত ৫২ পীঠের মধ্যে শ্রীহট্ট একটা পীঠ। সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে পড়িয়া এসকল পীঠস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টে সতীর হাত পড়িয়াছিল। শ্রীহস্ত হইতেই শ্রীহট্ট নাম হইয়াছে। অনুমান সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে আমার বাল্যকালে কথাটা শোনা ছিল। আর এইজন্যই শ্রীহট্টের দুর্গাবাড়ী সে অঞ্চলে হিন্দুদিগের একটা পীঠস্থান হইয়াছিল। হিন্দু যাত্রীরা শ্রীহট্টে যাইয়া একদিকে যেমন দুর্গাবাড়ীতে পূজা দিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ সাহজালালের মস্‌জিদ পরিক্রমণ না করিয়া এবং সাহজালালের দরগাতে সিন্নি না দিয়া ফিরিতেন না।

ফলতঃ সে অঞ্চলের হিন্দুরা সাহজালালকে নিজেদের দেবতার আসনে না তুলিয়া ছাড়েন নাই। সাহজালালকে তাঁহারা মহাদেবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকির মিলিয়া গাঁজা দিয়া সাহজালালের সিন্নি

দিতেন। এই গাঁজারসিন্নি দিবার সময় একটা পদ গান হইত।

হো! বিশ্বেশ্বর লাল!

তিনলাখ পীর সাহ জালাল!"

হিন্দু দেবতা মহাদেবের সঙ্গে সাহজালালের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল, যাহাতে মুসলমান তীর্থস্থান মক্কার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক মহাশক্তিশালী শিবলিঙ্গ নাকি কা'বার মসজিদে বন্দী হইয়া আছেন। কিন্তু মহাপ্রলয়ের শক্তি রাখিলেও এই শিবলিঙ্গ মৃত। তবে ইহার মাথায় যদি কোন এক নিষ্ঠাবান হিন্দু একটি বিল্বপত্র দিতে পারে, তাহা হইলে ইনি অমনি প্রলয় হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দুনিয়ার সমুদায় মুসলমানকে নিঃশেষে নষ্ট করিবেন। কোনও উপায়ে শিবোপাসক কোনও হিন্দু মক্কার চতুঃসীমানার মধ্যে যাইবামাত্র কা'বার মস্‌জিদ চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। তখন মুসলমানেরা চারিদিক অন্বেষণ করিয়া সেই হিন্দুর সন্ধান পাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও সমাজকে বাঁচাইয়া থাকে। বাংলা দেশের আর কোথাও এ কাহিনী প্রচলিত আছে কিনা জানি না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টে ইহা খুব প্রচলিত ছিল। আর ইহাও একটু একটু যেন মনে পড়ে, হিন্দুর শিবকে এই তিন লাখ পীর সাহজালাল মক্কায় নিয়া বন্দী করিয়া রাখেন, একথাও তখন শুনিয়াছিলাম। গাঁজার সিন্নি ও মন্ত্রের সঙ্গে ইহার কোনও নিগূঢ় যোগ আছে কি?

(১২)

মণিপুরী উপনিবেশ

শ্রীহট্ট শহরে বহুদিন হইতে একটা মণিপুরী উপনিবেশ গড়িয়া

উঠিয়াছে। প্রথম মণিপুর যুদ্ধের পরে ইংরেজ মণিপুরের পরাজিত রাজা গম্ভীর সিংহকে শ্রীহট্টে আনিয়া রাজবন্দী করিয়া রাখে। গম্ভীর সিংহ যে বাড়ীতে ছিলেন আমার বাল্যকালে লোকেরা তাহাকে মণিপুরী রাজবাড়ী কহিত। গম্ভীর সিংহকে আমি দেখি নাই। তাঁহার কোন ছেলেপিলে ছিল কিনা তাহাও জানি না। তবে আমার বাল্যকালে শহরে অনেক মণিপুরী বাস করিতেন। শহরের পূর্বপ্রান্তে নদীর ধারে একটা বড় মণিপুরী পাড়া ছিল। মণিপুরী রাজবাড়ী শহরের প্রায় মাঝখানেই ছিল। ইহার আশে-পাশে অনেক মণিপুরী বাস করিতেন। মণিপুরীরা বোধহয় একসময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন পরে বৈষ্ণব হইয়া যান। সমগ্র মণিপুর এখন বৈষ্ণব, রাধাকৃষ্ণের উপাসক ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পন্থাবলম্বী। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের গোঁসাইয়েরা মণিপুরীদিগের গুরু, নবদ্বীপ ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। মহাপ্রভুর জন্মতিথি দোলপূর্ণিমায় বিস্তর মণিপুরী যাত্রী প্রতি বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন, অন্যান্য বৈষ্ণব পর্বাহেও আসেন। মণিপুরের আধুনিক সামাজিক ইতিহাস হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার প্রচেষ্টার একটা বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। গোস্বামীপাদেরা সমগ্র মণিপুর সমাজকে বৈষ্ণব মন্ত্রে ও আচারে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়াছিলেন। মণিপুরের প্রাচীন সমাজের কথা কিছু জানি না, তবে তাহাদের বর্ত্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতিনীতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষপরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেস অধিকার ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহারা চিরদিন এমনই সহজ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। মণিপুরীদিগের বাড়ী দেখিলে দেবালয় বলিয়া মনে

হইত, এমনই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গাছপালা এমনই সযত্নে রক্ষিত, তৈজসাদি এমনই ঘসা মাজা ও যা সামান্য আসবার থাকিত তাহা এমনই পরিপাটী করিয়া ঘরে ও বারান্দায় সর্বদা সাজান থাকিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। যেমন ইহারা ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, সেইরূপ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে নিজেদের দেহপুরকেও সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত। আমার বাল্যকালে কখনও নোংরা মণিপুরী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ফুল দিয়া নিজেদের অঙ্গ সাজাইয়া রাখিত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কানে ফুলের দুল পরিত। পুরুষেরা কখনো কখনো ফুলের এবং কচি পল্লবের মালা ধারণ করিত। আর রমণীদের ললাটে চন্দন তিলক এবং পুরুষদিগের ললাটে চন্দনের ছাপ ত থাকিতই, ইহা ছাড়া বাহু ও বক্ষ প্রায় সর্বদা চন্দনচর্চিত থাকিত। মণিপুরীরা দেখিতে গৌরবর্ণ, কেহ বা উজ্জল শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ মণিপুরী কখনও দেখি নাই। ইহাদের দেহ সুগোল সুঠাম, চোখ কোমল ও স্নিগ্ধ। মুখের গঠন মঙ্গোলিয়া জাতিদিগের ছাঁচে গড়া। চক্ষু আকর্ণায়ত হইলেও নাক উঁচু নয়, কিন্তু ইহাতে মণিপুরীদিগের সহজ রূপকে নষ্ট করিত না। মণিপুরীদিগের সমাজে এখন কিরূপ জানি না ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে বাল্য বিবাহ ছিল না। চৌদ্দ পনেরর ত কথাই নাই, আঠার উনিশ বছর পর্য্যন্ত মণিপুরী বালিকারা অনূঢ়া থাকিত। এ অবস্থায় মণিপুরী সমাজে বরকন্যার পছন্দ অপছন্দ উপেক্ষা করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। বোধ হয় ইহাদের মধ্যে একপ্রকারের গান্ধর্ব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। মণিপুরী সমাজে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। অবরোধ প্রথা ত ছিলই না, বরঞ্চ মণিপুরী মহিলারা, আজকাল ইংরেজীতে যাহাকে ইকনমিক ফ্রীডম্

বা আর্থিক স্বাধীনতা কহে, ইহাও ভোগ করিতেন। ইঁহারা নিজেদের স্বামীর বা পুত্রের কিংবা পরিবারের অন্যান্য পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বরঞ্চ এমনও শোনা যাইত, মণিপুরে মহিলারাই পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, পুরুষেরা একপ্রকার নিজনিজ পরিবারের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী সমাজেও ইহার কতকটা প্রমাণ পাইতাম। অন্ততঃ কোন মণিপুরী স্ত্রীলোক যে কেবল ঘরে থাকিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন, অর্থোপার্জনে স্বামীর সহায় ছিলেন না, এমন দেখি নাই। মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা ঘরে যেমন গৃহকর্ম্ম করিতেন, সেইরূপ নিজেদের অথবা পরিবারের পুরুষদিগের তৈয়ারী পণ্য মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। সন্তানবতী রমণীরাও মাথায় মোট ও পিঠে কাপড় দিয়া নিজেদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী জিনিষ ফিরি করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী খেস ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। মণিপুরীরা সস্তা মশারিও বুনিতেন। ইহা ছাড়া কাঠের কাজে ইঁহাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শহরের চেয়ার টেবিল ইঁহারাই যোগাইতেন। বাঁশ এবং বেত দিয়া মোড়া, পেটি প্রভৃতিও মণিপুরীরাই প্রস্তুত করিতেন। এই সকল শিল্পে ইঁহারা অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে রথযাত্রার দিন খুব সমারোহ হইত। শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা মণিপুরীদিগের একটা বিশেষ পর্ব ছিল। প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন মণিপুরী গৃহস্থ বাড়ী হইতেই এক একখানা রথ রাজপথে বাহির হইত। এমন হাল্কা, এমন সুন্দর সজ্জিত, এমন রসকলার নিদর্শন বোধ হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশের রথে দেখা যায় না। মণিপুরীরা বাঁশ দিয়া এই রথ নির্ম্মান করিতেন। চাকাও বাঁশের হইত কিনা মনে পড়ে না। ইহা অসম্ভব হইলে, এসকল রথের

চাকাতেই কেবল যা কিছু কাঠ থাকিত, আর সবই বাঁশের ছিল। রথের ঠাট বাঁশের, কিন্তু তাহার আস্তরণ পাতার। কাঁঠাল পাতা দিয়াই অধিকাংশ স্থলে রথের চালা ও বেড়া গাঁথা হইত। আর কচি আমের পল্লব কিংবা বকুলের ডালে মাঝে মাঝে চাঁপা ও অন্য সুগন্ধ ফুল গাঁথিয়া রথ সাজান হইত। চন্দনচর্চিত দেহে গুলঞ্চের মালা পরিয়া মণিপুরীরা যখন হরিধ্বনি করিয়া, খোল করতাল সঙ্গে কীর্তন গাহিয়া সারি সারি রথ রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেন, তখন শহরে এক আশ্চর্য্য শোভা হইত। এসকল রথ এমন হাল্কা বলিয়া যে ভরসহ ছিল না এমন নহে। এই রথের উপরে মানুষ চড়িয়া কলা, আনারস প্রভৃতির হরির লুঠ দিতে দিতে যাইতেন।

কিন্তু মণিপুরী রাস শ্রীহট্টে ইঁহাদের সর্বপ্রধান উৎসব ছিল। এ রাস এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত সঙ্গীত রসজ্ঞ এবং সঙ্গীত রসলিপ্সু, সঙ্গীতের চর্চা ঘরে ঘরে। মহিলারা প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রসযাত্রায় ইঁহারা বাংলা দেশের মতন মূর্তি রচনা করেন না। নিজেরা রাসলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাটমন্দিরে পল্লীর সকল বালক বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করিয়া থাকেন। বৃত্তাকারে সুসজ্জিত বালকবালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আট নয় বছরের বালক বালিকা হইতে আঠার বছরের অনূঢ়া যুবতী পর্য্যন্ত এই অভিনয়ের সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইঁহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা মিলিয়া খোল করতাল সহকারে রাসলীলা কীর্তন করেন, আর বালক-বালিকারা হাতে হাত ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মৃদুমধুর নৃত্য-কলা সহকারে এই লীলার অভিনয় করেন। যাহারা রাসে নাচে তাহাদের একজন কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দুইপাশে দুইজন করিয়া

রাধা সাজিয়া থাকে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই। আমার বাল্যকালে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রার সময়ে এই জীবন্ত মণিপুরী রাস দেখিবার জন্য শহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।

(১৩)

দোল-দুর্গোৎসব

আমাদের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হইত গ্রামে। পূজার সময় আমরা সকলেই বাড়ী যাইতাম। আমি একটু বড় হইলেই পূজার ফুল তুলিয়া, বিল্বপত্র বাছিয়া তাহার অংশীদার হইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় ধূপধুনা জ্বালাইতাম। মণ্ডপে ঢুকিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু বারান্দায় উঠিয়া বড় বড় ধুহুচিতে ধূপ দিয়া মণ্ডপ-ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিতাম। খড় মাটি দিয়া প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, স্বচক্ষে দেখিতাম, ইহা সত্য। কিন্তু বিল্ব ষষ্ঠির রাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রতিমাতে পুত্তলিকা বুদ্ধি থাকিলেও সপ্তমী দিন প্রত্যুষে পুরোহিত যখন কলাবধূকে স্নান করাইয়া মন্ত্রপূত করিয়া দুর্গা প্রতিমার পাশে আনিয়া রাখিতেন, তখন হইতে প্রতিমাতে আর প্রতিমা বুদ্ধি থাকিত না। পূজার ক'দিন এ'যে মাটির পুতুল, কিছুতেই ইহা ভাবিতে পারিতাম না। নবমী দিন সন্ধ্যা আরতির সময় মনে হইত, যেন বিজয়ার আসন্ন বিরহ ভাবিয়া দেবী বাস্তবিক কাঁদিতেছেন। বিজয়ার সন্ধ্যার পরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে প্রাণে ঘোর অবসাদ আসিত। এখন মনস্তত্বের দিক দিয়া এ অবসাদ কেন হয়, বুঝি। তিনদিনের

নিরবচ্ছিন্ন উল্লাস ও উৎসাহের পরে উৎসবের অবসানে এ প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্যে এ জ্ঞান হয় নাই, হওয়ার কথাও ছিল না। সুতরাং বিজয়ার অবসাদ যে দেবতার বিরহ হইতে হয় নাই, ইহা বুঝিতাম না। তখনও দেবতায় বিশ্বাস ছিল, তবে এ দেবতা যে কি বস্তু এ প্রশ্ন মনে উঠে নাই। দেবতা মানুষের মতনই, অথচ মানুষ নহেন, এতটুকু ধারণা হইয়াছিল।

এইসকল পারিবারিক পূজাপার্বণের ভিতর দিয়া যা কিছু ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এ শিক্ষা মতের শিক্ষা ছিল না, ভাবের শিক্ষা এবং অনুভূতির শিক্ষা ছিল। প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা বেশী কিছু বোধ জন্মে নাই। তার পরেও জন্মিয়াছে কিনা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এইসকল পূজাপার্বণের ভিতর দিয়া অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস সাধন করিয়াছিলাম। এই সাধনই ধর্ম্মসাধনার গোড়ার কথা। আমরা চোখে যাহা দেখি, কানে যাহা শুনি, এসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহার অতীতেও যে বস্তু আছে, ইহাই ধর্ম্মসাধনের বুনিয়াদ। প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত পূজাপার্বণের ভিতর দিয়া ধর্ম্মজীবনের এই ভিত্তি গাঁথা হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। আর এইজন্যই নিজে সে সকল বর্জ্জন করিয়াও আমার মা বাবা যে-সকল পূজা পার্বণ করিতেন, তাহা যে পাপকার্য্য এ অপরাধের কথা কখনও কল্পনা করি নাই। আমার পক্ষে এখন এসকল পূজার অনুষ্ঠান পাপ হইতে পারে; পাপ হইবে, মিথ্যা আচরণ বলিয়া, যাহা আমি বিশ্বাস করি না তাহার ভাণ করিব বলিয়া; কিন্তু আমার পিতৃমাতৃকুলের গুরুজনেরা ঐ সকল প্রতিমাপূজাতে যে পাপাচরণ করিতেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

আমাদের শ্রীহট্টের বাসায়ও প্রায় সর্বদাই ব্রতপূজা প্রভৃতি

হইত। প্রতি শনিবারে শনিপূজা হইত। মা প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। এছাড়া জ্যৈষ্ঠ-মাসে মা সাবিত্রী ব্রত করিতেন। সারা মাঘ মাস প্রতি রবিবারে স্বর্য্যের ব্রত করিতেন। এসকল ব্রতের কথা মায়ের কাছে বসিয়া শুনিতাম। আর ব্রতশেষে প্রসাদের ভাগ ত পাইতামই।

(১৪)

যাত্রাগান ও পুরাণ পাঠ

শ্রীহট্ট শহরে মাঝে মাঝে যাত্রা গান হইত। আমাদের বাসাতেও হইত, প্রতিবেশীদের বাড়ীতেও হইত। আমি প্রায় সর্বত্রই এসকল যাত্রা শুনিতে যাইতাম। আমার বাল্যকালে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা ব্যতীত রাম-বনবাস, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি যাত্রাও হইত। কিন্তু আমাদের বাসায় মা কিছুতেই নিমাই-সন্ন্যাস বা রাম-বনবাসের পালা হইতে দিতেন না। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, এইজন্যই রামের বনবাস বা নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। কৃষ্ণ-যাত্রার মধ্যে ঢাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী এবং বিচিত্র-বিলাস এই তিনটি পালার কথাই বিশেষ মনে আছে। এসকল পালা মহাজন পদাবলীর অনুকরণে রচিত। অনেক সময় গোস্বামী মহাশয় বোধ হয় তাঁহার সঙ্গীতে প্রাচীন পদ যোজনা করিয়া দিতেন। রসের অনুভূতিতে এসকল পদ মহাজন পদাবলী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না।

শ্রীহট্ট শহরে সেকালে মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদিগের বাসায় পুরাণ পাঠও হইত। কিন্তু এই পুরাণ পাঠে কোন প্রকার লোকশিক্ষা হইত না। অনেক স্থলে একখানা পুঁথি জলচৌকির উপরে রাখা

হইত। আর তাহার সম্মুখে থালা বা রেকাবী থাকিত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ঐ বাঁধা পুঁথিকে প্রণাম করিয়া ঐ থালার উপরে নিজেদের প্রণামী রাখিয়া দিতেন। এই পুরাণ পাঠটা অনেক সময় গৃহস্থের পুরোহিত বা গুরুঠাকুরের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহের একটা উপায় মাত্র ছিল।

আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর নিজে যখন আসিতেন, তখন তিনি এই পুরাণ পাঠ উপলক্ষে অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে কিছু পড়িতেন, অন্য সময়ে তাঁহার পুঁথিখানা বাঁধিয়া জলচৌকির উপরে সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাদের বাসায় যখন পুরাণ পাঠ হইত, তখন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পর্য্যন্ত এইরূপে বাঁধা থাকিত না। আমার মনে পড়ে দু'একবার আমার জেঠতুত ভাই—ইনি বাবার মুহুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাংলা নজীর খড়োয়া দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখিতেন। এই প্রচ্ছন্ন নজীরকেই লোকে প্রণাম করিয়া প্রণামী দিয়া যাইতেন। কখনও কখনও—আমাদের পরিবারে হয় নাই কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে,—দুষ্ট বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপে মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এইসকল ঘটনা এবং কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শহরে যখন যেখানে পূজাপার্বণ হইত অথবা যাত্রাগানাদি হইত সেখানেই নিমন্ত্রিতদিগকে নিজেদের অবস্থানুযায়ী প্রণামী দিতে হইত। যাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে পূজাপার্বণ বা যাত্রাগানাদির ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহারা এই সূত্রে তাঁহাদের প্রণামীর টাকা ফেরত পাইতেন। যাঁহাদের বাড়ীতে যে বৎসর পূজা-পার্বণ বা যাত্রাগানাদি হইত না, তাঁহারা এই পুরাণপাঠ উপলক্ষে এই টাকা ফেরত পাইতেন।

কেহ কেহ এই পুরাণ পাঠের প্রণামী নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থেরা এই প্রণামীর টাকা নিজেদের গুরুপুরোহিতকেই দান করিতেন।

(১৫)

হিন্দুয়ানীর বন্ধন ছেদন

শ্রীহট্টে থাকিতেই আমি হিন্দুয়ানীর বন্ধন ছিঁড়িতে আরম্ভ করি। আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে। ফলতঃ তখন পর্য্যন্ত আমার অন্তরে কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয়ই হয় নাই। জিজ্ঞাসা জাগে সন্দেহ হইতে। তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বাস্তবিক আমার অন্তরে কোন সন্দেহ জাগে নাই। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা সত্যই আছেন কি নাই, এ প্রশ্ন মনে ওঠে নাই। পরজীবনেও কখনও উঠিয়াছিল কিনা মনে নাই। ঈশ্বর আছেন একজন, যিনি দুনিয়ার মালিক, সকল হিন্দুতেই এ বিশ্বাস করেন। আমার বাবাও এই বিশ্বাস করিতেন। এই একেশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতায় যে কোন বিরোধ আছে, ইহা তিনি ভাবিতেন না। ফলতঃ যখন তিনি দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপ্রতিমার নিকটে প্রণাম করিতেন, তখন এই দেবতা যে ঈশ্বর নহেন এই সন্দেহ তাঁহার অন্তরে জাগিত না। আবার কালীপূজার সময়ে কালী যে ঈশ্বর নহেন, ইহা তিনি ভাবিতেন না। দোলের সময়ে রাধাকৃষ্ণ যে ঈশ্বর নহেন, এরূপ কল্পনাও করিতেন না। যখন যাঁহার পূজা করিতেন, তখন তাঁহাকেই ঈশ্বর-জ্ঞান করিতেন, অথবা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান করিতেন। এই হাওয়ার মধ্যেই আমি বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম। যেমন হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তেম্‌নি মুসলমানের উপাস্য সম্বন্ধেও

বাবার ঈশ্বর-বুদ্ধি দৃঢ় ছিল। ঈশ্বর যে এক, এই ঈশ্বর যে মাটি ও খড়ের প্রতিমা নহেন, এই ঈশ্বর যে রক্তমাংসের মানুষ নহেন, এ সকল সামান্য কথা তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন। মোস্‌লেম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব ছিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে কোন বিরোধ আছে, তাঁহার কথায় বার্তায় কখনও এ ভাব প্রকাশ পাইত না। মুসলমানের ঈশ্বর এক ও হিন্দুর ঈশ্বর অন্য এ কল্পনা তিনি কখনও করেন নাই। এইজন্য মুসলমানের পর্বাহে তিনি মুসলমান বন্ধুদিগের সঙ্গে স্বচ্ছন্দচিত্তে লৌকিকতার আদান প্রদান করিতেন। বকূর ঈদের সময় প্রতিবাসী মুসলমান জমিদারের বাড়ীতে ভেট পাঠাইতেন। বোধ হয়, খৃষ্টমাসের সময়ে জজসাহেবের বাড়ীতেও আমাদের বাড়ী হইতে এরূপ ভেট যাইত।

(১৬)

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস না জন্মিলেও, হিন্দু আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে অতি অল্প বয়স হইতেই আমি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমাদের শ্রীহট্টের বাসায় প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। শ্রীহট্টে খুব উৎকৃষ্ট কলা পাওয়া যায়। কলা, দুধ, চিনি এবং আতপ চাউল শনির ভোগে লাগিত। সোমবার ও শুক্রবার শ্রীহট্টে হাটবার ছিল। এই দুই দিন চারিদিকের পল্লী হইতে তরিতরকারী ফল ও অন্যান্য পণ্য হাটে আসিয়া জমা হইত। প্রতি শুক্রবারের হাট হইতে আমাদের বাসায় শনির সেবার জন্য যে সময়ের যে ফল তাহা যত্ন করিয়া কিনিয়া আনা হইত। কলা বারোমাসই আসিত। একবার শনিবারে পুরোহিত শনির ভোগ সাজাইতে গিয়া কলা পাইলেন না। চাকরকে ডাকিলেন; সে বলিল, হাট হইতে সে শনির বরাদ্দ কলা কিনিয়া আনিয়া রাখিয়া-

ছিল। মা তখন শহরের বাসায় ছিলেন না, আর মা যখন বাসায় থাকিতেন না, তখনই আমার ভাগ্যে যত অনর্থ ঘটিত। বাবার কানে শনির কলা নাই, একথাটি গেল। অমনি তিনি মাজেরাস্থলে গিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকরের উপরে তম্বি আরম্ভ হইল। সে কৈফিয়ৎ দিল, সে কলা আনিয়াছিল, এখন সে কলা কি হইয়াছে, তাহা সে জানে না। বোধ হয় সে ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছিল যে, আমিই সে কলা খাইয়াছি। দেবতার নৈবেদ্যের কলা বা অন্য কোন ফল আমি যে খাইতে পারিতাম না, এমন নহে। এসকল বিষয়ে দেবতার ভয় অপেক্ষা আমার লোভ তখন বেশী ছিল; আর হাওয়ারই কথা। দুর্গা পূজা বা কালী পূজার সময়ে যে ছাগ-শিশু বলি দিবার জন্য আনা হইত, বলির পূর্বে যে তাহার প্রতি অনেকের লোভ পড়িত না, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। শনির সেবার কলাতে আমার লোভ হয় নাই এ কল্পনা করি না। বোধ হয় আমিই এই কলা খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমিই যে এ অপরাধে অপরাধী, বাবা কথাটা শোনা মাত্রই ধরিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র খড়ম তুলিয়া আমাকে মারিতে যান। আমি এই আক্রমণের মুখে ছুটিয়া পালাইলাম। বাবাও আমার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। আমাদের হাতাতেই আমার এক পিসতুত ভাই ছিলেন। আমি একেবারে ছুটিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে বধূঠাকুরাণীর ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। আমাদের অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দু আচারে মামাশ্বশুরের পক্ষে ভাগিনেয়-বধূর মুখদর্শন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে মামাশ্বশুর ভাগিনেয়-বধূর মুখ দেখিলে তখনই স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। সুতরাং বাবা আমার পিছনে পিছনে আমার পিসতুত ভাইয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিতে পারিলেন না; আমিও সেদিন তাঁহার প্রহার হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

(১৭)

প্রহারের ভয়ে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস গড়িয়া উঠে না। ভিতরে যার দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি কখনও নষ্ট হয় না। আহারাদি সম্বন্ধে হিন্দুয়ানীর বিধিনিষেধ আমি কোনদিন মানিতাম বলিয়া আমার মনে পড়ে না। যাহাদের জল চল্ নয়, তাহাদের ছোঁয়া পানীয় বা খাদ্যের প্রতি কোন দিন আমার কোন প্রকারের বিতৃষ্ণা ছিল না। অতি শৈশবে এই সকল নিষিদ্ধ খাদ্যাদি খাইতাম না, কিন্তু খাইতে কোন দিন কোন অপ্রবৃত্তি ছিল না। একটু বড় হইলে এসকল বিধিনিষেধ অনর্থক বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষ যাহাকে বন্ধন ভাবে, তাহাকেই কখনই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে পারে না। আমিও একটু বড় হইবার পরে পানাহার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের প্রচলিত ছুঁৎমার্গকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করি। আমার বাবা এসকল মানিয়া চলিতেন। কিন্তু ইসলাম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া এসকল সম্বন্ধে তাঁহার কোন শ্রদ্ধা সম্ভব ছিল কি না, সন্দেহ হয়।

আমার মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাওয়ার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই লেমনেড খাইতে আমার মনে কেশাগ্র পরিমাণ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। বাবার কঠোর শাস্তিতেও মুসলমানের ছোঁয়া জলের প্রতি আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণার উদয় হয় নাই। দুর্গা প্রভৃতি যখন মানিতাম, প্রাণ খুলিয়া দুর্গোৎসবের সময় পূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম; আর্ত্ত হইলে চোখ বুজিয়া কালীর নিকট মানত করিতাম। তখনও হিন্দু আচারে যাহাকে অভক্ষ্য বলে তাহা ভক্ষণ

করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে একটিমাত্র পাঁউরুটি বিস্কুটের দোকান ছিল। এই দোকানেই আবার আটা ও ময়দা পাওয়া যাইত। এই সময়ে আমাদের দূর সম্পর্কের এক ভাগিনেয় কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া শ্রীহট্টের বাসায় আসিয়া উঠেন। ইনি আমার অপেক্ষা বয়সে একটু বড় ছিলেন। বোধ হয় ইহার স্বজনেরা কলিকাতায় সামান্য ব্যবসায় করিতেন। সেই উপলক্ষে তিনি কিছুদিন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইনি মুসলমানের পাঁউরুটী বিস্কুট যথেচ্ছা খাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই আমার ও আমাদের বাসার অন্যান্য বালকদের এই অভক্ষ্য ভক্ষণে দীক্ষা লাভ হয়। খাতাপত্র বাঁধিবার জন্য কাই দরকার হয়। এই কাই প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা কিনিবার অছিলায় আমরা শহরের পাঁউরুটীর দোকানে ঢুকিতাম। আর এক পয়সার ময়দা কিনিয়া হাতে ধরিয়া লোককে দেখাইতে দেখাইতে এই দোকান হইতে বাহির হইতাম, কিন্তু জামার পকেটে অথবা ধুতির ভিতরে গরম গরম রুটি বিস্কুট লইয়া আসিতাম, এবং অভিভাবকেরা রাত্রে শুইতে গেলে এগুলি বাহির করিয়া সকলে খাইতাম। এইরূপে শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার জাতবর্ণের বিচারের বন্ধন ভিতরে ভিতরে একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়।

(১৮)

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহট্টে অনেক দিন হইতেই একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কে ইহার স্থাপয়িতা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন কালিকাদাস দত্ত মহাশয় প্রথম যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া

শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইনি পরে কুচবিহারের দেওয়ান হন। যাঁরা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপন করেন, মনে হয় কালিকাদাস দত্ত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহকে শ্রীহট্টে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শ্রীহট্টে আমার পঠদ্দশার সময়, কালিকাদাস দত্ত মহাশয় মৈমনসিংহে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সে ১৮৫৩—১৮৬৩ ইংরাজীর মধ্যে। আমি শ্রীহট্ট শহরে যাই ১৮৬৬ ইংরাজীতে। শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের আমার প্রথম স্মৃতি রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে এক বক্তৃতা হয় তাহার সঙ্গে জড়িত। এই বক্তৃতা হয় নয়াসড়ক স্কুলে। আব্ছায়ার মত মনে পড়ে যেন বক্তা ছিলেন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়। সে বক্তৃতা বুঝিবার আমার তখন বয়স হয় নাই। বক্তৃতার কথাও কিছু মনে নাই। কেবলমাত্র এটুকু মনে আছে, সে বক্তৃতা শুনিতে অনেক লোক গিয়াছিলেন, আমিও সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে বোধ হয় ১৮৬৮।৬৯ ইংরাজীতে সীতানাথ দত্ত শ্রীহট্টে গিয়া আমাদের স্কুলে আমি যে শ্রেণীতে পড়িতাম সে শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হন। সীতানাথ এখন সীতানাথ তত্বভূষণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সভাপতি।

সীতানাথের বাড়ী শ্রীহট্টে, আমদেরই অঞ্চলে। ইহার এক পিতৃব্য কলিকাতায় বড়বাজারে কড়াইপটিতে ব্যবসা করিতেন। সেই সূত্রে শ্রীহট্টে যাইবার পূর্বেই সীতানাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব হইতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের প্রথম শিষ্যদিগের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। শ্রীনাথ বাবুর সংসর্গে সীতানাথ বালক হইলেও কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে গিয়া সীতানাথ আমার সহপাঠীদের মধ্যে কতকটা নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার উদ্যোগে শ্রীহট্টে একটা ছাত্রসমাজ বা ছাত্রদিগের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে ব্রাহ্মসমাজের নিজের কোন বাড়ী হয় নাই। স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক উপাসনা হইত। এইখানেই এই ছাত্রসমাজেরও সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস আমার সহপাঠী ছিলেন। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুন্দরীমোহনের বড় দাদা ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁসা ছিলেন। সুন্দরীমোহন বোধ হয় তাঁহার নিকট হইতেই ব্রাহ্মমতে প্রথম দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সুন্দরী-মোহন সীতানাথের এই ছাত্রসমাজের সভ্য হন। আমাদের স্কুলের আরও কতকগুলি বালক ও যুবক ইঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এইরূপে একটা ছোট ব্রাহ্ম যুব সমাজ গড়িয়া উঠে।

আমি কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যোগ দিই নাই। সীতানাথ ও সুন্দরী-মোহন আমাদের ক্লাসে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি কোন দিনই পড়াশুনাতে ভাল ছিলাম না। স্কুলে ইঁহারা যখন প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন, আমি তখন অনেক দূরে ও নীচে পড়িয়া থাকিতাম। সুতরাং ইঁহাদের সঙ্গে কোনপ্রকারের ঘনিষ্ঠ সখ্যের যোগ ছিল না। মতামত লইয়া আমি তখনও মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করি নাই। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রবল অবিশ্বাস তখনও জন্মে নাই। সুতরাং ধর্মে মতবাদের দিক দিয়া সীতনাথ প্রভৃতির ব্রাহ্মসমাজ আমাকে টানিতে পারে নাই। হয়ত পারিত সহজ বাল্যবন্ধুর আকর্ষণে। কিন্তু সে বাঁধনের তখনও সূত্রপাত হয় নাই। সীতানাথ, সুন্দরীমোহন আমাকে ও আমার মত পড়ায় অপটু সহপাঠীদের আমলেই আনিতেন না। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্বা-

ভিমান ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনপ্রকারের সংস্রবে ব্যাঘাত জন্মায়। অভিমান অভিমানকে জাগায়, বিনয়কে জাগাইতে পারে না। পড়াশুনায় আমি তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না, সে আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু তাঁহারা ইহার সঙ্গে যে আবার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জুড়িয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা সহ্য হইল না। সুতরাং যাহারা ইঁহাদের উপাসনা প্রভৃতিতে উপহাস করিত আমি তাহাদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। যেমন একদিকে কতকগুলি নূতন ইংরাজী-নবীস কেশবচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ আবার এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী কেশবচন্দ্রের বিরোধী এবং বিদ্বেষী হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজের খুব টিপ্পনী কাটিতেন ; ইঁহাদের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রূপ এবং কুৎসা শুনিয়া আমি বেশ আনন্দ লাভ করিতাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠিলেই এসকল বিদ্রূপ ও কুৎসার আবৃত্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতাম। ইহার মুল কারণ ছিল আমার সহপাঠী ব্রাহ্ম বালকদিগের ধর্ম্মাভিমান।

তবে আহারাদির আচার বিচারে যেমন কার্য্যতঃ হিন্দুয়ানীর সমর্থন করিতাম না সেইরূপ ধর্ম্মের মতবাদ সম্বন্ধেও কোনদিন গোঁড়ামির পক্ষপাতী ছিলাম না। ব্রাহ্মসমাজের কথা বিশেষ তখনও জানি নাই। তবে প্রাচীন হিন্দুয়ানী ও নবীন ব্রাহ্মসমাজের মাঝখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছেন, এ কথাটা ছাত্রাবস্থায় শ্রীহট্টে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল না। লোকমুখে কেবল এইমাত্র শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আদিম বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার যুবক অনুচরেরা যেভাবে ও যে পরিমাণে

ইংরাজের অনুকরণে একটা নূতন ধর্ম্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন দেবেন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী হইয়াছেন। এইজন্য আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেবেন্দ্রনাথের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীহট্টের যুবক ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় আমি গোঁড়া হিন্দু-য়ানীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মহর্ষির মধ্যপথের উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষতা করিতাম। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার তখনকার মনোভাব প্রকাশ পাইত। কেশবচন্দ্রের যুবক অনুচরদিগের ধর্ম্মাভিমানের উত্তাপ ইহারও মূলেও ছিল।

(১৯)

দুর্গোৎসবের স্মৃতি ও গ্রামের জীবনে সাম্যনীতি

কহিয়াছি, আমার বাল্যশিক্ষায় বাবা চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এইজন্য আমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে সুস্থ অবস্থায় কখনও কঠোর শাসন ব্যতীত আর কিছু পাই নাই। বলিয়াছি, এই সময়ে কোন দিন আমার হাতে এক কপর্দ্দকও পড়ে নাই। কাগজ কলম বই যখন যাহা প্রয়োজন হইত বাবা বাজার হইতে আনাইয়া দিতেন। বছরে এক জোড়া জুতা বরাদ্দ ছিল। কেবল এই জুতা কিনিবার সময় কোন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বাজারে যাইতে পাইতাম। নতুবা অন্য সময়ে বাজারমুখো হইতে পর্য্যন্ত পারিতাম না। ১৮৭২ ইংরাজীর পূজার সময়ে আমি ষোল বছরে পা দিয়াছি, আর এই সময়েই সর্বপ্রথম বাবা আমার হাতে পূজার বাজারের কোন কোন সাজসজ্জা কিনিবার জন্য কিছু টাকা

দেন। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে এযাবৎকাল বেলোয়ারী লণ্ঠন ও দেওয়ালগির ও শামাদান যৎসামান্য ছিল। পূজার সময়ে মোমবাতির আলো দিয়াই যথাসম্ভব রোশনাই করা হইত। চণ্ডী-মণ্ডপের সম্মুখে কলাগাছ পুঁতিয়া তার সঙ্গে চেরা বাঁশ বিঁধিয়া সারি সারি মাটির প্রদীপ দিয়া সন্ধ্যা আরতির সময় আলোকমালা রচিত হইত। তখনও কেরোসিন তেলের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুল ব্যবহার হয় নাই। এই বৎসরই (১৮৭২) প্রথমে আমার হাতে টাকা পড়াতে আমাদের বাড়ীতে হিঙ্কসের দুই-পলিতার ওয়াল ল্যাম্প যায়। সেই আনন্দের স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে।

কিছুদিন পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' আমার দুর্গোৎসবের স্মৃতি লিখিয়া-ছিলাম। এই দীর্ঘ জীবনে নানা প্রকারের বহু আনন্দ উৎসব দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হইত তার মতন আনন্দ উৎসব জীবনে কখনও সম্ভোগ করি নাই। এখনও তার আমেজ প্রাণে লাগিয়া আছে। শরতের প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে এখনও প্রাণে সে আনন্দের সাড়া জাগে। দুর্গোৎসবের পূর্বের পক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় পিতৃ-পক্ষের কোন পরিচয় পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রায় সকল ভদ্র গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মন্ত্রে পল্লীর সমস্ত জলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে দৃশ্য ও সে মন্ত্রের ধ্বনি এখনও যেন চোখে ভাসিতেছে ও কানে জাগিতেছে। পিতৃপক্ষ আসিলেই আমরা বুঝিতাম, পূজার আর দেরী নাই। মহালয়ার দিন হইতেই দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেরও

ছুটি হইত। বাবা নিয়মিত মহালয়ার পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতেন, কোন বৎসর শহরেই এই শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পূজার জন্য বাড়ী যাইতেন, কোন বৎসর বা বাড়ীতে যাইয়া এই শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই বাড়ী যাওয়ার আনন্দ জীবনে ভুলিব না। বৎসরান্তে আমাদের পাইয়া গ্রামবাসীদের কি আনন্দ! আর পূজার আনন্দ! তার তুলনা দিতে পারি পরজীবনে এমন কিছু পাই নাই। পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে, তখনও তাহা জানি নাই। কিন্তু এই প্রতিমা দেখিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করিতাম।

তারপর পূজার সময় অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনার আনন্দ। বোধন হইতে প্রতিদিনের চণ্ডীপাঠ। অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু সেই পাঠের ধ্বনিই যেন 'হৃৎকর্ণ রসায়ন' ছিল। পূজার পূর্ব হইতেই গ্রামে গ্রামে গানের দল গড়িয়া উঠিত। সখের যাত্রার দল নয়। আমাদের দেশে এসকলকে 'সখী-সংবাদের' দল কহিত। ইহারা একরূপ পদাবলীই গান করিত। তখন জানি নাই, এখন বুঝিয়াছি যে, এইসকল সখের কীর্তনের দল কখনও মান, কখনও বিরহ, কখনও বা কুঞ্জভঙ্গ পালা গান করিত। দুই তিন দল মিলিয়া এক আসরে পরস্পরের প্রতিযোগিতা হইত। কলিকাতা অঞ্চলেও একসময়ে এইরূপ গান হইত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'একাল ও সেকাল'এ ইহা বর্ণিত আছে। মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দ্দারেরা একে অন্যের সঙ্গে কবির লড়াই করিতেন। পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বাবা আমাদের বাড়ীতে নবমীদিন রাত্রির পূর্বে কখনও এই কবি-গান হইতে দিতেন না।

দশমীদিনই আমাদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে গ্রাম নিমন্ত্রণ হইত। সে কথা স্মরণ করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে

জাতবর্ণের বিচার সত্ত্বেও কতটা যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা বুঝিতে পারিতেছি। জাতকুলের মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু জাত্যাভিমান ছিল না। একই জাতের বা শ্রেণীর মধ্যে কুলমর্য্যাদা লইয়া রেষারেষি হইত বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বা জাতের মধ্যে কোন প্রকারের প্রতিযোগিতা ছিল না। আর তথাকথিত অতি নিম্ন জাতের লোকেরও একটা অপূর্ব আত্মসম্মান বোধ ছিল। গ্রামের যে সকল অসহায় গরীবেরা বারোমাস প্রয়োজনমত অকুণ্ঠা সহকারে আমাদের বাড়ী হইতে চাল ডাল নুন তেল চাহিয়া লইয়া যাইত, পূজার সময় অথবা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে যে ভাবে ও যে লোকের মারফত গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ হইত সে ভাবে ও সে লোকের মারফত গ্রামের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের নিমন্ত্রণ না হইলে তাহারা কখনও আমাদের বাড়ীতে পাত পাড়িতে আসিত না। আর বাবা যেমন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদের ভোজনের সময় একরূপ গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সেই মত যাহাদিগকে অস্পৃশ্য কহে তাহারা যখন আপনাপন জাতের পংক্তি করিয়া উঠানে খাইত বসিত, তখন বাবাকে তাহাদেরও অভ্যর্থনা করিতে হইত। আমি বড় হইলে পরিবেশনের ভার আমার উপরেও পড়িয়াছিল, আর সে সময় মনে আছে, মা আমাকে সর্বদা কহিয়া দিতেন,—এসকল গরীব লোকদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিবে। তাঁর সে কথাগুলি পর্য্যন্ত মনে আছে। তিনি কহিতেন—'তোমার বাড়ীতে ভদ্রলোকেরা যাঁরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন তাঁরা খাইতে আসেন না। তাঁরা নিজের বাড়ীতে যা খাইতে পান না এমন কিছু তুমি ইঁহাদিগকে দিতে পার না। আর ইহারা কি খাইলেন না খাইলেন সে কথা লইয়া জটলা করিবেন না। গরীবেরা নিমন্ত্রণ বাড়ীতেই ভাল জিনিষ খাইতে পায়। আর তাদের মুখেই ভদ্র-

পরিবারের সুনাম দুর্নাম রটে। তারা তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাদেরই বেশী করিয়া যত্ন ও আদর করিবে।'

প্রাচীন গ্রাম্য-জীবনে সাম্য সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়িল। আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদের মধ্যে সামাজিক পংক্তিভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক একটা মোটা মুলীবাঁশের উপরে দশ পনের জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিতেন। কলাপাতায় খাদ্যাদি পরিবেশন হইত, আর কাঁসার বা পিতলের ঘটিতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটি হইতে চার পাঁচ জন মিলিয়া পান করিতেন। একবার এই জমিদার জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পিঁড়ি পাতিয়া থালা গ্লাশ সাজাইয়া করজোড়ে যাইয়া তাহাদিগকে আহার স্থলে ডাকিয়া আনিলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্ঞাতিবর্গ খাইতে চলিলেন। খাবার ঘরের দরজায় গিয়া ইঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। বসিতে অনুরোধ করিলেও নড়িলেন না। তখন তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে গৃহস্বামী জানিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া বলিলেন, তুমি কি আমাদের অপমান করিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাশ আছে; আমরা গরীব, তোমাকে যখন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখন ত এইরূপ পিঁড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাদের আর সামাজিকতা চলে না, আমরা তোমার বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করিতে পারি না। জমিদার মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে তিনি যে স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। পরে মুলীবাঁশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল।

(১১)

পারিবারিক কথা—কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। এইজন্য এবৎসর পূজার পরে শ্রীহট্টে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আবার আমাদিগকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধ পাকা-দেখার দিনই ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও আমাদের দেশে বরপণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয় নাই। তবে যেক্ষেত্রে বরের পক্ষ কন্যাপক্ষ অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে কুলমর্য্যাদা স্বরূপ স্বল্পবিস্তর অর্থোপহার দিতে হইত। কত দিতে হইবে, সম্বন্ধের সঙ্গেই তাহা উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হইত। আমার ভগিনীর সম্বন্ধ হয় ত্রিপুরা জেলায় সরাইল পরগণার একটা বিশিষ্ট গ্রামে। পূর্বেই বোধ হয় বলিয়াছি যে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এবং পূর্ব ঢাকার বৈদ্যরা শ্রীহট্টের কায়স্থদিগের অপেক্ষা বেশী কৌলিন্যের দাবী করিয়া থাকেন। যাঁহাদের পরিবারে আমার ভগিনীর বিবাহের কথা স্থির হয়, তাঁহারা বৈদ্য এবং এইজন্য কুলমর্য্যাদায় আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে একটা বর-পণ দিবার কথা হইয়াছিল। কত টাকা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ২০০ টাকা হইবে। ইহাতেই বরপক্ষীয়েরা রাজী হন, এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। আমাদের অঞ্চলে বিবাহের প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে 'পানে-খিলি' কহে। এই দিন বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে ভেট আসে। এবং বোধ হয় ইহার পরে কন্যার বাড়ী হইতেও বরের বাড়ীতে যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি যায়। কলিকাতায় যাহাকে পাকা-দেখা বলে তাহাতে বরপক্ষীয়েরা

কন্যাকে এবং কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে যাইয়া আশীর্বাদ করিয়া আসেন। আমার মনে হয় আমাদের এই পানে-খিলিও কতকটা ইহার মতন। তবে পানে-খিলি অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অনেক বেশী। এই দিনে বর কন্যা উভয়ের বাড়ীতেই নহবৎ বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়েরা পল্লীর স্ত্রীলোকদিগকে ভদ্রাভদ্র নির্বিশেষে পান-সুপারী এবং ভাঁড়ে করিয়া তৈল উপহার দিয়া থাকেন। পুরুষেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া তাম্বুলাদির দ্বারা অভ্যর্থিত হন—ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞাতি-ভোজনও হইয়া থাকে। বাবা এই অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। বোধ হয় গ্রামের সামাজিকেরা যথারীতি আমন্ত্রিতও হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে নহবৎ বসিয়াছিল। অন্তঃপুরে পুরস্ত্রীরা আসিয়া জড় হইয়াছিলেন। বরপক্ষের লোকের অপেক্ষায় আমরা পথ চাহিয়াছিলাম। এমন সময় বরের পিতার নিকট হইতে একটি লোক একখানি পত্র লইয়া আসিল। তিনি পূর্ব্বকার টাকা অপেক্ষা আরও দুইশত টাকা বেশী বরপণ হিসাবে হোক বা কুলমর্য্যাদা হিসাবেই হোক চাহিয়া বসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার বাবাকে ভাল করিয়া চিনেন নাই। চাপ দিয়া টাকা লইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি কখনও ছলচাতুরী বা কলকৌশল সহ্য করিতে পারিতেন না। বাবা ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। বরের পিতাকে লিখিলেন যে, পূর্বে যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে আরও দু'শ কেন হয়ত তার চাইতে বেশী টাকাও দিতে রাজী হইতে পারিতেন; কিন্তু বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, দেশময় একথা রাষ্ট্র করিয়া এরূপ চাপ দেওয়াতে তিনি এক পয়সাও দিতে রাজী নন। উৎসবের আয়োজন সকলই

বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে বিষাদের ছায়া আসিয়া ঘেরিল।

পর দিবস বাবা সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন যে, এই অগ্রহায়ণ মাসেই যেরূপ করিয়া হউক কন্যার বিবাহ দিবেন। সে সময়ে আট দশ বৎসরের মধ্যে সচরাচর ভদ্র পরিবারের বালিকাদের বিবাহ হইত। কিন্তু আমার বাবা আমার ভগিনীকে যেমন তৎকালোচিত বাংলা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, সেইরূপ একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়াও রাখিয়াছিলেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে বালিকাদের বিবাহ অল্প বয়সে হইলেও পুরুষেরা বেশীদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেন। ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কেহই প্রায় বিবাহ করিতেন না। ২৪।২৫ বৎসরের বর ও ৮।১০ বৎসরের কন্যা বড়ই বেমানান হইত। বোধ হয় এইজন্য বাবা আমার ভগ্নীকে ১২ বৎসর বা তার চাইতেও আর একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়াছিলেন। আর বেশীদিন তাহাকে ঘরে রাখা যায় না। বিশেষতঃ কন্যার বিবাহের জন্য আদালত হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহ না দিয়া শহরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। এই সম্বন্ধের পূর্বেও আরও কয়েকটি সম্বন্ধের কথা আসিয়াছিল। সেকালের লোকেরা প্রজাপতির নির্বন্ধেই মানুষের বিবাহ হয় বিশ্বাস করিতেন। কার ভাগ্যে বিধাতা কোন্ বর লিখিয়াছেন বলা যায় না। এইজন্য ভাল মন্দ যে সম্বন্ধই আসুক না কেন তাঁহারা কোনটাই খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে পূর্বে যে সকল প্রস্তাব আসিয়াছিল তাহার মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইয়া সেইখানে কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বরের বয়স ২৫।২৬ হইবে। নিকটবর্ত্তী কাছাড় জেলায় পুলিসে কর্ম্ম করিতেন, ইন্‌সপেক্‌টার ছিলেন। বংশ মর্য্যাদায় আমাদেরই সমকক্ষ। বরের খুল্লতাত

বাঁচিয়াছিলেন। তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করেন। বাবা এইখানেই কন্যার বিবাহ দিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু আমি তখন বড় হইয়াছি। পুত্র যে বয়সে মিত্রের মর্য্যাদা লাভ করে সেই বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার বড়মামা তখন আমাদের বাড়ীতে। আমার এক জ্ঞাতি জেঠতুত ভাই বাবার কাজকর্ম্ম করিতেন। আর বাবার পরিবারভুক্ত দাসীপুত্র দাগু সিং,—ইহারা সকলেই তাঁহার অমাত্যের মত ছিলেন। পারিবারিক ব্যাপারে বাবা ইহাদের অনুমতি না লইয়া কেবল নিজের রায়ের উপরে কোন কাজ করিতেন না। নিজের মনে নূতন সম্বন্ধ করা স্থির করিয়া সকলের আগে মাকে যাইয়া বলিলেন, এবং মার সম্মতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা সম্মতি দিলেন। তারপর আমার বড়মামাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। আমার জেঠতুত ভাই, দাগা (দাগু সিং) এবং আমি আমরা সকলেই তাঁহার রায়ে রায় দিলাম। আমাদের সম্মতি পাইয়া বরের খুল্লতাতকে লিখিলেন যে, ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যদি তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করেন এবং ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী আছেন। পাইকের হাতে অমনি এই চিঠি গেল। সেদিন বোধহয় ৯ই কি ১০ই অগ্রহায়ণ। এই চিঠি যাওয়ার পরেই আমাদের সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাদের কাহারোই ইচ্ছা নয়, এখানে বিবাহ হয়। কারণ বর শ্রীহট্ট এবং কাছাড় দুই জেলাতেই বদ্ধ মাতাল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাবার মুখের উপরে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। এখন সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বরকে কাছাড় হইতে আসিতে হইবে, কর্ম্ম হইতে ছুটি লইয়া। যদি কোন কারণে ২২শে তারিখের মধ্যে

না আসিয়া পৌঁছিতে পারেন তবেই সকল দিক রক্ষা পায়। বরের খুল্লতাত মহাশয় বাবার চিঠির জবাবে ২২শে অগ্রহায়ণই বিবাহের দিন ঠিক করিলেন, এবং বরকে তখনই ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন, একথা জানাইলেন। তখন আমরা অনন্যোপায় হইয়া আর একটা টেলিগ্রাম জাল করিয়া বরকে তখনই ছুটি লইয়া আসিতে বারণ করিব স্থির করিলাম। সে জাল 'তার' লেখা হইয়াছিল মনে পড়ে, কিন্তু পাঠান হইয়াছিল কিনা মনে পড়ে না। পানে-খিলির দিন ধার্য্য হইল। নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহের পূর্ব্বকৃত্য অনুষ্ঠান সব হইল। বাড়ীতে আবার নহবৎ বসিল। গ্রামের আত্মীয় স্বজনে ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকে আমাদের বাহির বাড়ী ভরিয়া গেল। পুরস্ত্রীরা অন্তঃপুরে আসিয়া জড় হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ জামাতার অনেক কীর্ত্তিকথা লোকের মুখে মায়ের কানে পৌঁছিয়াছিল। আমাদের গ্রামের অনেক ভদ্র এবং ভৃত্যশ্রেণীয় লোকেরা কাছাড়ে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা বরের স্বভাব চরিত্রের কথা জানিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই সময়ে গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। ইহাদের কাহারো কাহারো মুখে সে সকল কথা অন্তঃপুরে মায়ের কানে পৌঁছিল। যে দিন হইতে মা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন সেইদিন হইতেই তাঁহার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ ছিল। এই পানে-খিলির দিন প্রাতে তিনি আর আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বাহিরে যখন নহবৎ বাজিতেছে, লোকসমাগমে বহির্বাটি কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে, অন্তঃপুরে পুরস্ত্রীরা আসিয়া জুটিয়াছেন, সেই সময়ে মা চীৎকার করিয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিলেন। একখানা বঁটি সম্মুখে রাখিয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার পূর্ব্বে, কন্যাকে আপনি হত্যা করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইবেন। বাবা মহা সঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে কথা দিয়াছেন।

আর সমগ্র দেশের লোকে জানিত তাঁহার কথা কখনও টলে না। অন্যদিকে মার এই সাংঘাতিক আপত্তি। মার সম্মতি ব্যতিরেকে এই শুভকর্ম্মের সূত্রপাত হইতেই পারে না। কোন পারিবারিক ব্যাপারে পতি পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না—এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ —বাবার ইহাই আদর্শ ছিল। সুতরাং তাঁর নিজের কথা থাকুক বা যাক, তাঁর মান থাকুক বা অপমানই হোক, কন্যার বিবাহ ব্যাপারে সহধর্ম্মিণীর এই ঘোরতর আপত্তি বাবা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। মর্ম্মন্তুদ উৎকণ্ঠায় একবার অন্তঃপুরে ও একবার বহির্বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দেখিয়া আমরা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি মার কাছে যাইয়া তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম যে এতটা পাকা কথার পরে এ বিবাহও যদি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, বাবা এ আত্মগ্লানি কিছুতেই সহিতে পারিবেন না। এ আঘাতে তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইবে। আমার তখন সেইরূপ ধারণাই হইয়াছিল। মা আমার কথা শুনিয়া কহিলেন, আর করিব কি, কপালে যাহা ছিল তাহাই হউক। বল গিয়া পানে-খিলি দিতে। আমি বাবাকে আসিয়া সে কথা বলার পর বিবাহের এই প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান হইল। এইরূপে বিষাদের ছায়াতলে আমার ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বরের রূপ কন্দর্পের মত ছিল। তখনকার হিসাবে লেখাপড়াও বেশ জানিতেন। স্বভাবচরিত্রও অন্যান্য হিসাবে একরূপ নিষ্কলঙ্ক ছিল। কিন্তু এক অতিশয় পানাসাক্তিতে সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। ইহাই তাঁহার অকালমৃত্যুরও কারণ হয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে আমার ভগিনী বিধবা হন। বৈধব্যের চারি পাঁচ মাস পরে তাঁহার একটি কন্যা সন্তান হয়। সকলেই তাহারা এখন ওপারে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীহট্টে সুরেন্দ্রনাথ

ইহার বৎসরখানেক পূর্বে ১৮৭১ ইংরাজীর নভেম্বর মাসের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান। বিলাত ও ভারতবর্ষ এখন প্রায় এঘর-ওঘর হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলাত যান তখন এইরূপ ছিল না। রাজা রামমোহন রায় প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী। তাঁহার পরে তাঁহার বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ য়ুরোপে গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই শিক্ষার্থীরূপে বোধ হয় প্রথম বিলাত যান। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্। তবে তাঁহার কর্ম্ম-জীবন বোম্বাই প্রদেশে অতিবাহিত হয়, বাংলায় নহে। ইঁহার পরে তিনজন বাঙ্গালী এক জাহাজে বিলাতে যাইয়া একই সঙ্গে সিভিলিয়ান হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন—রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। সেকালের বিলাত-ফেরতা বাঙ্গালীরা পোষাক পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে, চাল-চলনে সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ইঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াই নবীনচন্দ্র 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে লিখিয়াছিলেন :—

সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্প প্রাণ।

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে যাইয়া সাহেবী ভাবেই চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গেও বাংলায় কথা কহিতেন কিনা সন্দেহ। ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যেভাবে থাকিতেন, সুরেন্দ্রনাথও সেই ভাবেই চলিতে থাকেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন : সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ সর্বদা সাহেব সাজিয়া

থাকিতেন, তাঁহার ব্রাহ্মণীও সেইরূপ বিবি সাজিয়া বেড়াইতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়িয়া শহরের সর্বত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও সেযুগের ইংরাজ মহিলাদের মত 'মেয়ে-জিনে' চড়িয়া অশ্বপৃষ্ঠে অপরাহ্নে হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন। সে সময়ে ম্যাক্কার্টিস নামে একজন আর্মেণী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহট্টে ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। ইঁহারা তিনজনে যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন আমরা বালকের দল তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রায় রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই সময়ে সাদারল্যাণ্ড নামে একজন ফিরিঙ্গি সিভিলিয়ান শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাদারল্যাণ্ড একজন অতিকায় পুরুষ ছিলেন। এরূপ গল্প শোনা গিয়াছে যে, ইনি যখন প্রথমে শ্রীহট্টে বদলী হইয়া যান, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তরে বা এজলাসে এমন চৌকী ছিল না যে তাঁহার বিশাল বপু ধারণ করিতে পারে বা তাহার ভার সহ্য করিতে পারে। আরও গল্প আছে যে, সাদারল্যাণ্ড সাহেব প্রতিদিন সান্ধ্য ভোজের সময় একটা আস্ত মিষ্টি কুমড়া নিঃশেষ করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে শ্রীহট্টে গেলে সাদারল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইহা বড় ভাল লাগে নাই। এই স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়া একটা অনুকম্পার ভাব উঁকি মারিত। সাদারল্যাণ্ড সুরেন্দ্রনাথকে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মর্য্যাদা না দিয়া এইরূপে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে ও স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীহট্টের ইংরাজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে একটা অসন্তোষ এবং বিরোধ অলক্ষ্যে ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী

ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইয়া যে মঞ্চে ইংরাজ বিবিরা বসিয়াছিলেন সেই মঞ্চে আপনার স্বামীর পদোচিত আসন দখল করিয়া বসেন। এই হইতেই সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির আয়োজন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ এমন কোন গুরু অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তাঁহার উপরে এরূপ কঠোর দণ্ড বিহিত হইতে পারে। মূল ব্যাপারটা কিছুই নহে। একটা ফৌজদারী মামলার নথীতে যে সকল কথা লেখা ছিল সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাহার প্রত্যেক কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ না করিয়া সহি করিয়াছিলেন। ম্যাসপ্রেট (Muspratt) নামে একজন সিভিলিয়ান তখন শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। তিনি সমুদয় নথীপত্র পরীক্ষা করিয়া বলেন, সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ অসাবধানতা। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কহেন যে, যে-সময়ে তিনি এই ভুল নথী সহি করেন তখন তাঁহার উপরে অত্যধিক কাজের চাপ পড়িয়াছিল। জজ সাহেব হাইকোর্টকে লেখেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলেই তাঁহার এই সামান্য অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হাইকোর্ট এবিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেন জানি না। তবে গভর্ণমেণ্ট এই সামান্য অপরাধ বিচার করিবার জন্য একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মন্তব্যের ফলে অযথা কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। আমি তখন শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ি। মোটামুটি সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দামার সকল কথাই জানিতে পারি। তখনই এই ধারণা জন্মে যে, ইংরাজের আদালতে ইংরাজ যদি বাঙ্গালীর পিছনে লাগে তবে বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিচার লাভ একরূপ অসম্ভব। এইভাবেই আমার প্রথম যৌবনেই স্বাদেশিকতার উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে।

স্কুলের পাঠ শেষ—প্রবেশিকা পরীক্ষা

স্কুলে পড়াশুনায় আমি কোনদিনই আমার শিক্ষকদের কি আমার সহপাঠীদের গণনায় আসিতাম না। তবে মোটের উপর বাংলা এবং ইংরাজীতে হীন ছিলাম না। যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন জজ সাহেব, তাঁহার নাম আমার মনে নাই, একদিন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া ইংরাজী রচনায় আমাদের ক্লাশের ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার রচনার তারিফ করিয়াছিলেন। কথাটা মনে আছে এইজন্য যে, সতীর্থেরা জজ সাহেবের এই প্রশংসাবাদ আমার লেখার গুণে পাই নাই, কিন্তু পিতৃপরিচয়ে পাইয়াছিলাম ইহা বলিয়া জজ সাহেবের উপরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করিয়াছিল। আসল কথাটা এই যে, আমি বাংলা কি ইংরাজী কোন ব্যাকরণই মন দিয়া পড়ি নাই, এইজন্য আমার লেখাতে বিস্তর ব্যাকরণ ভুল থাকিয়া যাইত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাহার মধ্যে একটা প্রাঞ্জলতা থাকিত। আমি সর্বদাই কান দিয়া ভাষার বিচার করিতাম, ব্যাকরণের জ্ঞান দিয়া নহে। আর ব্যাকরণ শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে কখনও শব্দের অভাব অনুভব করিতাম না। প্রথম প্রথম শব্দেরও অপপ্রয়োগ হইত, কিন্তু মোটের উপর লেখা শুনাইত ভাল। ক্লাশের বই অপেক্ষা বাহিরের বই বেশী পড়িতাম। আর এ বিষয়ে আমার প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু—বছরখানেক হইল (১৩৩৪) ইনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—সর্বদাই আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার প্ররোচনায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া বাহিরের

অনেক বই পড়িত। সেগুলি প্রায় সকলই ইংরাজী কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া অন্যান্য স্কুলের কথা জানি না, আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় ইংরাজী শিখাইবার সময় শব্দের মূল ধাতু সর্ব্বদা শিখাইতেন।

(২)

বিশপ ট্রেঞ্চের Study of Words আমরা তাঁহার নিকট মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রচলিত ইংরাজী শব্দের প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিত। একজন অতি বড় পণ্ডিতের নাম হইতে অত্যন্ত মূর্খতাব্যঞ্জক ইংরাজী dunce শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা পড়িয়া আমার অদ্ভুত আনন্দ হইয়াছিল। লণ্ডনবাসী ছোটলোক ইংরাজেরা 'হেয়ারকে' 'এয়ার' বলে আর 'এয়ারকে' 'হেয়ার' বলে এবং nকে হেন্ উচ্চারণ করে। এসকল কাহিনী পড়িতে বড়ই আমোদ হইত। এক ব্যক্তি ইতালীয় নগর ভেনিস্ লিখিতে যাইয়া একটার জায়গায় দুটো n দিয়াছিল। এই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে যাইয়া একজন লণ্ডন-বাসী ইংরাজ বলিয়াছিল, there is only one 'hen' in Venice : তাহার উত্তরে আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, ভেনিসের লোকেরা তবে ডিম পায় কোথা হইতে? ট্রেঞ্চের পুস্তকে এরূপ অনেক গল্প আছে। এসকল পড়িতে বড়ই মজা লাগিত। শ্রীহট্টের স্কুলে থাকিতেই এইরূপে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় আমাদিগকে যে ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন সেই ভিত্তির উপরেই পরজীবনে ইংরাজী ভাষার উপরে যা কিছু দখল লাভ করিয়াছি তাহা গড়িয়া উঠে। স্কুলে থাকিতেই বাহিরের ইংরাজী বই কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম; আর বসু মহাশয়ের প্রসাদেই শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি

কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পরিয়াছিলাম।

(৩)

আমার ছাত্রাবস্থায় ছেলেদের মধ্যে একটা সংস্কার ছিল যে, ইংরাজীতে যে একটু ভাল হয়, গণিতে সে অধিকাংশ সময় ভাল হইতে পারে না। আমারও সেই দশাই হইয়াছিল। পাটীগণিত এবং বীজগণিত কিছুতে ভাল করিয়া পড়িতে পারিতাম না। এসকল অঙ্ক কষিতে হইলে মাথায় যেন বজ্রপাত হইত, কিন্তু ইহারই সঙ্গে আবার জ্যামিতি পড়িতে খুব ভাল লাগিত। কেন এরূপ হইয়াছিল তখন বুঝি নাই। এখন বুঝিয়াছি যে যাহাতে কোন একটা সার্বজনীন তত্ত্বের সন্ধান পাইতাম তাহাই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিত। শুষ্ক হিসাবে কিছুতে মন বসিত না। পাটীগণিত এবং বীজগণিতের মূল তত্ত্বের সন্ধান পাইলে বোধহয় তাহার প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিত না। আজকাল কিরূপে এসকল শিখান হয় জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রথম হইতেই যদি কেবল কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম মুখস্ত না করাইয়া গণিতের মূল তত্ত্বগুলি শেখান হয় তবে অনেক বালক, যারা গণিত-বিদ্যাকে তিক্ত বা কষায়রূপে বর্জন করিয়া চলে, তাহারা তাহাতে রস পাইতে পারে।

(৪)

যেমন ইংরাজীতে সেইরূপ বাংলা সম্বন্ধেও স্কুলে থাকিতেই আমি অনেক বাহিরের বই পড়িয়াছিলাম। শ্রীহট্টের স্কুল ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর নবকিশোর সেন মহাশয় আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন।

তিনি আমাদের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন, একথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির একজন এজেণ্ট ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটি প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সেবা করিয়াছিলেন। ইহারাই বহু ইংরাজী গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ করিয়া দেশময় প্রচার করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে ইহাদের প্রকাশিত গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী বাক্স বোঝাই হইয়া বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য সেন মহাশয়ের নিকটে আসিত। এই সূত্রে অনেক বাহিরের বাংলা বই পড়িতে পাইয়াছিলাম। 'চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা', 'চীনদেশীয় তন্তুবায়ের কথা', এসকল স্কুল বুক সোসাইটির গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এছাড়া তখনকার খাঁটি বাংলা কথা-সাহিত্যের 'গুলে বকোয়ালী' এবং 'কামিনী কুমার' এই জাতীয় পুস্তকও বাল্যেই পড়িয়াছিলাম। 'অন্নদা মঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর'ও আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম। স্কুলপাঠ্য 'চারুপাঠ', 'পদ্যপাঠ', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক', রঙ্গলালের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছিল। বাংলা বর্ণমালা অভ্যস্ত হইলেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মোটের উপরে সবটাই বাড়ীতে পড়ি। নবকিশোর সেন মহাশয় নূতন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যখন যে বই প্রকাশিত হইত তখনই তিনি তাহা কিনিতেন। এই সূত্রে শ্রীহট্টে থাকিতেই মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাথ বধ', 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'চতুর্দশ পদাবলী' পড়িতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' জন্মাবধি তাহার পরিচয় লাভ করি। সকলটাই যে বুঝিতাম এমন নহে। কিন্তু বুঝি বা না বুঝি, সেকালের বাংলা সাহিত্যের যখন যাহা হাতে পড়িত তখনই তাহা আগ্রহাতিশয্য সহকারে পড়িতাম। প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' সকলের চাইতে ভাল লাগিয়াছিল।

স্কুলের পাঠ শেষ—প্রবেশিকা পরীক্ষা

(৫)

১৮৭৩ ইংরাজীতেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। সেকালে ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে এই পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পরীক্ষা হইত। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীর আবেদন ও ফিস্ পাঠাইতে হইত। ঐ সময় আমার বয়স ১৬ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাকে সে বৎসর হেডমাষ্টার মহাশয় পরীক্ষা দিতে দিলেন না। তবে আসল কথাটা ছিল, আমি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিব বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই। এইজন্য পড়াশুনা করিয়া ভালরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব এই আশায় আর এক বছর আমাকে স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এবারেও স্কুলের পড়াতে আমি বেশী মন দিই নাই।

তবে এই বৎসরে আমি সংবাদপত্রে একটু-আধটু লিখিতে আরম্ভ করি। তখনও শ্রীহট্টে ছাপাখানা হয় নাই। স্থানীয় কোন সংবাদ-পত্র ছিল না। ঢাকায় দুখানি বাংলা সাপ্তাহিক ছিল, 'ঢাকাপ্রকাশ' ও 'হিন্দুহিতৈষিণী'। তখন পূর্ব্ববঙ্গে আর কোথাও কোন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি ১৮৭৪ ইংরাজীতে 'ঢাকাপ্রকাশ' এবং 'হিন্দুহিতৈষিণী'তে দুই একটি লেখা পাঠাইয়াছিলাম। একটি হাইকোর্টের জজ অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে লিখিত, 'হিন্দুহিতৈষিণী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশে'ও দুই একটা গদ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কবিতাটি পয়ার মাত্র ছিল। বড় হইয়া অবধি আমি অনেক সময় কহিয়াছি যে, ১৮ বৎসরের পূর্বে যে কবিতা লেখে না সে মানুষ নয়। ১৮ বছরের পরে যে কবিতা লেখে সে হয় পাগল

না হয় করি। আমি এই দুইয়ের একটাও আশা করি নাই। সুতরাং সে কবিতার কোন মূল্য ছিল না। তবে আমার প্রথম যৌবনের এই প্রয়াস উল্লেখযোগ্য দুই কারণে ; প্রথম, এই সময়েই আমার অন্তরে একটু দেশাত্মবোধ জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহারই প্রেরণায় জীবনের প্রথমে এসকল রচনাতে প্রবৃত্ত হই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার এই অতি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার আকাঙ্খা সূত্রেই শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাসের সঙ্গে প্রথম যৌবনের সখ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। সুন্দরী মোহন ১৮৭৩ ইংরাজীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়েন। এ বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার কথা শুনিয়া বিশেষ ভাবে আমাকে তাঁহার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। এই বৎসরই নভেম্বর মাসে আমিও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেই এবং কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

(১৪)

প্রথম কলিকাতা-যাত্রা

১৮৭৪ ইংরাজীতেই শ্রীহট্ট বাংলার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নব-প্রতিষ্ঠিত আসাম শাসনের এলাকাভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আমার বাবা প্রতিবাদীগণের অগ্রণীদলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়। শ্রীহট্ট আসাম-ভুক্ত হওয়াতে আমার পক্ষে বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াও এইজন্য আমি মাসিক ১০৲ বৃত্তি লইয়া ১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই।

(২)

১৮৭৪ ইংরাজী ডিসেম্বর মাসে আমার শ্রীহট্টের ছাত্রজীবন শেষ হয়। এই মাসের শেষভাগে আমি আত্মীয় পরিবারবর্গ সকলকে ছাড়িয়া একাকী সুদূর কলিকাতা প্রবাসে যাত্রা করি। এখন শ্রীহট্টের পথে রেল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। আমার বাবা তীর্থ করিবার জন্য এবং বিষয়কর্ম উপলক্ষে একাধিক বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কুষ্ঠিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে নৌকায় আসিতে হইয়াছিল। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত তখন রেল হয় নাই। কুষ্ঠিয়াই পূর্ব্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমানা ছিল। তারও পূর্ব্বে বাবা যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন তখন পূর্ব্ববঙ্গে রেলের পত্তনও হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে তিনি নৌকাযোগে কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলও তখন খোলে নাই। সেকালে কাশীর ত কথাই নাই, কলিকাতায় যাতায়াত করাও সহজ

ছিল না। গঙ্গাস্নান করিতে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও একরূপ পরিবার পরিজনের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া আসিতেন। কলিকাতা সেকালে বিসূচিকার একরূপ নিত্য বিলাসভূমি ছিল। আমি যখন প্রথম কলিকাতা যাত্রা করি তখন কলিকাতা শ্রীহট্টের অনেক কাছে হইয়াছে। রেল হয় নাই বটে, কিন্তু মাসে দুবার করিয়া শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা এবং সপ্তাহে দুবার করিয়া ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ষ্টীমারেই আমি শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম।

(৩)

প্রথম যখন শ্রীহট্টের নদীতে জাহাজ যায় তখন আমি স্কুলে পড়ি, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া বিদেশযাত্রা এই আমার প্রথম। শীতকালে জল শুকাইয়া যায় বলিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এসকল জাহাজ যাতায়াত করিত না। শ্রীহট্টের প্রায় দশ ক্রোশ নীচে ছাতক পর্য্যন্ত জাহাজ যাইত। এসকল জাহাজে যাত্রীর জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না; মাল বোঝাই হইয়া আসা যাওয়া করিত। শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে নূতন চায়ের কারবার খুলিয়াছে। এই চায়ের ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই বিশেষভাবে এসকল জাহাজ প্রথম আমাদের অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করে। ক্রমে অন্যান্য মালও জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতার দিকে আসে। শ্রীহট্টের নিকটের পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর তেজপাতার গাছ আছে; চায়ের সঙ্গে এই তেজপাতাও শ্রীহট্ট হইতে রপ্তানি হয়। শ্রীহট্টে নারিকেল জন্মায় না বলিলেও চলে, কিন্তু সর্বত্র প্রচুর সুপারি উৎপন্ন হয়। এই সুপারিও জাহাজে করিয়া রপ্তানি হইতে আরম্ভ করে। আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি সে সময়

খাসিয়া পাহাড় হইতে নানা জাতীয় অর্কিড সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় চালান যাইতে আরম্ভ করে। এছাড়া শ্রীহট্টের সংলগ্ন চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে পাথরিয়া চুণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই চুণ বেশীর ভাগ বড় বড় নৌকা বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিত, কিয়ৎ পরিমাণে জাহাজেও আসিত। এই মাল-জাহাজে চড়িয়াই আমি সর্বপ্রথম কলিকাতা রওয়ানা হই।

শ্রীহট্ট শহর হইতে ছাতক প্রায় কুড়ি মাইলের পথ। এই কুড়ি মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া ছাতকে জাহাজে চাপি। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহনের দাসের বাড়ী শ্রীহট্ট হইতে ছাতকের পথে পড়ে। শীতের ছুটিতে সুন্দরীমোহন বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিব, বাবা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(৪)

একদিন পৌষমাসের পূর্বাহ্নে বেলা দশটার সময় যথাবিহিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া আমি সুদূর প্রবাসে শুভ-যাত্রা করি। যাত্রার মন্ত্রটা আজিও ভুলি নাই। বাসগৃহের দরজায় আসন পাতিয়া মঙ্গল-ঘটের সামনে নবধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিতে হইয়াছিল। সম্মুখে একখানা থালায় ধান, দূর্বা, ফুলের মালা, দধি, মধু, একটা টাকা রাখা হইয়াছিল। পুরোহিত পাশে বসিয়া মন্ত্র পড়াইলেন—

"দ্বিজ নৃপ গণিকা,
পুষ্পমালা পতাকা
সদ্যমাংসং ঘৃতং বা
দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্টা, শ্রুত্বা, পঠিত্বা বা
ফলমিহ লভতে মানবঃ গন্তকামঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে নাক দিয়া নিঃশ্বাস পড়ে সেই পা আগে বাড়াইয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া ঘরের বাহির হইলাম। মা অন্দর হইতে বাহির বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া মঙ্গলচণ্ডীর খিলি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার উত্তরীয়ের কোণে সেই খিলি বাঁধিয়া দিলেন। তারপর মাটিতে একটু থুথু ফেলিয়া বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুল দিয়া সেই থুথু ঘসিয়া বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়া তাহা তুলিয়া লইয়া আমার কপালে টিপ কাটিয়া দিলেন। তখন আমি তাঁর পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। মা কেবল আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনায় একমাত্র পুত্রকে বহুবিপদসঙ্কুল বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর ভিতরে কি কঠোর সংগ্রাম চলিতেছিল তখন তার ইঙ্গিতমাত্র পাই নাই। প্রথম বিদেশযাত্রার কুতূহলে আমার মন ভরপুর হইয়া ছিল, সুতরাং বাবা মাকে ছাড়িয়া আসিতে একটুও ক্লেশ ত দূরের কথা বিশেষ ভাবনা পর্য্যন্ত হয় নাই। ছয় মাস পরে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী যাইয়া শুনিলাম আমি ঘোড়ায় চড়িয়া যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, মা অমনি গিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করেন নাই। কিন্তু তাঁর প্রাণে যে অসহ্য যাতনা হইতেছিল আমাকে তাহা কিছুই বুঝিতে দেন নাই। অথচ মা আমার লেখাপড়া জানিতেন না!

(৫)

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, কহিয়াছি, তখন পদ্মার ওপারে রেল বসা দূরে থাকুক তাহার কল্পনাও হয় নাই। চায়ের কারবারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাহাজেই ইংরেজ কোম্পানীদের মাল আমদানি ও রপ্তানি হইত। জাহাজেই বেহার অঞ্চলের সাঁওতাল পরগণা হইতে চা

বাগানের 'কুলী'ও চালান হইত। এই জাহাজেই আমি প্রথমে শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ আসি, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বদলী হইত। কলিকাতার যাত্রীরা ঢাকায় বা নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের জাহাজে চাপিতেন। এখন গোয়ালন্দ হইতে ৬।৭ ঘণ্টায় নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিনেও যাওয়া যাইত না। এখন জাহাজ দিনরাত চলিতে পারে। সেকালে বিজলীর আলোর ব্যবস্থা ছিল না। সন্ধ্যার পরে জাহাজ চালান সম্ভব ছিল না। এইজন্য ঢাকা হইতে গোয়ালন্দের পথে যাত্রীদিগকে একরাত্রি জাহাজেই কাটাইতে হইত। শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ আসিতে পাঁচ দিনের কম নয়, কখনো কখনো ৭।৮ দিন লাগিত। মাল বোঝাই করিবার জন্য সেসকল জাহাজ বড় বড় বন্দরে কখনো দুই দিন, এবং সর্বদাই অন্ততঃ একদিন আটকিয়া থাকিত। কাজেই শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিতে প্রায়ই ৭।৮ দিন লাগিত।

এই ৭।৮ দিন চিড়া চিবাইয়া কাটান আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীহট্টে থাকিতেই খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দুয়ানীর বন্ধন আমার একেবারে টুটিয়া গিয়াছিল। শ্রীহট্টেই মুসলমান দোকানের রুটি বিস্কুট খাইতে আরম্ভ করি, ইহা পূর্বেই কহিয়াছি। মুসলমানের ভাত খাইতেও নিজের ভিতরে কোন সঙ্কোচ ছিল না। তবে আমার প্রথম জাহাজ-যাত্রায় জাতের বাঁধন একেবারে নষ্ট করিতে হয় নাই। সে জাহাজে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কেরাণী ছিলেন—বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়। জাহাজের পিছনে যে জালিবোট বাঁধা থাকিত তাহাতেই তাঁহার রান্না হইত। আমরা তাহাতে ভাগ বসাইতাম। এইরূপে কায়ক্লেশে ভাঙ্গা জাতের যতটুকু ছিল তাহা বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলাম।

(৬)

আমি প্রথমে যে নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম সে নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার; আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বন্দর ও শহর। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল লাইন হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রালী ব্রাদার্সের অফিস বসিয়াছে, আর ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীরও একটা বড় অফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এইসকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত, বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্যঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। নারায়ণগঞ্জে নামিয়া এইরূপ একটা আখড়াতেই আতিথ্য গ্রহণ করি।

(৭)

ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে তখন দুইখানা জাহাজ চলাচল করিত। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় সপ্তাহে দুবার ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে যাতায়াত করিত। জাহাজ দুখানির নাম এখনও ভুলি নাই। একখানি ছিল "Prince of Wales"; আর একখানি ছিল "Princess Alice"। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় যে সকল মালের জাহাজ চলিত এ দুখানি জাহাজ তার চাইতে অনেক ভাল ছিল। এ দুখানি যাত্রী-জাহাজ ছিল। মাল-জাহাজ প্রায়ই দুই পাশে দুখানা অতিকায় গাধাবোট বাঁধিয়া চলিত, ঢাকা গোয়ালন্দের যাত্রী-জাহাজে সচরাচর

কোন গাধাবোট বাঁধা থাকিত না; তবুও একদিনে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে যাওয়া যাইত না। নারায়ণগঞ্জে যাইয়া গোয়ালন্দের জাহাজের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। শ্রীহট্টের জাহাজের কেরাণী হরমোহন বাবুর অনুগ্রহে কোনো রকমে জাত বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছিলাম। কিন্তু গোয়ালন্দের জাহাজে হরমোহন বাবুর মতন কোনো কর্ম্মচারী ছিলেন না। সুতরাং এখানে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল। এই আমার প্রথম মুসলমানের হাতে অন্নপ্রাশন। এসকল জাহাজে তখনও দেশীয় লোকেরা ইংরেজী ধরণে খানা খাইতে আরম্ভ করেন নাই। উচ্চশ্রেণীতে দেশীয় যাত্রীও চলাচল করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর এখনকার মতন কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এখন আমাদের নদীর জাহাজে দেশী লোকেরাই কাপ্তানের বা সারেংয়ের কাজ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁদের এ শিক্ষা বা সুযোগ লাভ হয় নাই। তখন তাঁরা খালাসীর কাজই কেবল করিতেন। জাহাজের কাপ্তান এবং ইঞ্জিনিয়ার দুইই বিদেশী ছিলেন। ইংরেজ যাত্রী আসিলে তিনি কাপ্তানের ক্যাবিনেই আশ্রয় পাইতেন এবং কাপ্তানের টেবিলেই খানা খাইতেন। দেশী যাত্রীদের সে লোভ জন্মে নাই; আর ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া বসিবার-দাঁড়াইবার সাহস এবং অভ্যাসও হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতন আচার-ভ্রষ্ট হিন্দুদের পক্ষে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করা ব্যতীত আহারাদির অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

(৮)

তবে এই খালাসীর খানা খাইতে যাইয়া মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছু কিছু গোলমালও বাধিত। আমাদের মতন ছেলেদের

উদর পূর্ণ করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। বিশেষতঃ আট আনায় এত পরিমাণ 'কারী'-ভাত যোগাইতে গেলে অতিথি-সেবাই করিতে হইত, লাভের ব্যবসা করা সম্ভব ছিল না। এইজন্য প্রায় তাদের সঙ্গে আমাদের খটাখটি বাধিয়া যাইত। আমরাও ছাড়িবার পাত্র ছিলাম না। 'কারী'র বরাদ্দ যথেচ্ছা বাড়ান যখন অসম্ভব হইল তখন ভাতের দাবী চড়ান গেল। ' এ ভাত যে সকলই আমাদের পেটে যাইত তাহা নহে। প্রকাশ্যে খালাসীর হাতে খাইবার সাহস তখনও হয় নাই। সারেংয়ের ক্যাবিনেই বা কখনো জাহাজের চাকার উপরে যে ছোট ঘর থাকিত তাহাতে বসিয়া খাইতে হইত। আর খালাসী ভাত দিয়া গেলেই সে ভাত সবটা আমাদের পেটে না যাইয়া পদ্মা-গর্ভে যাইয়া অদৃশ্য হইত। এইরূপে খালাসী যখন দেখিল যে ব্যঞ্জনাদির সাহায্য ব্যতীতও আমরা এত পরিমাণ অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিলাম তখন আমাদের 'কারী'র মাত্রা সম্ভবমত বাড়াইয়া একটা রফা করিল। এইরূপে অনেক সময় অনেক কৌতুকের সৃষ্টি হইত।

(৯)

এইভাবে জাত খোয়াইয়া কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে দুই তিন দিন পরে গোয়ালন্দ পৌঁছাইয়া রেল গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা রেলের কর্তাদের নিকট যে সুখ স্বচ্ছন্দতার দাবী করি তাহা পাই নাই। কিন্তু প্রথম যে রেলগাড়ীতে চড়ি সে গাড়ীর তুলনায় আজিকালকার গাড়ী যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা মনে করিলে অসন্তোষের কারণ অনেকটা কমিয়া যায়। তখন নিম্নশ্রেণীর গাড়ীগুলিকে চতুর্থ শ্রেণী কহিত। মধ্যম বা Intermediate শ্রেণীর গাড়ী তখনো হয় নাই। তবে পূর্বে যাহাকে তৃতীয়

শ্রেণী কহিত তাহাই কার্য্যতঃ এখন মধ্যম শ্রেণী হইয়াছে। নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ীতে কাঠের জানালা ছিল, কাচের জানালা তখনও হয় নাই। এখন তাহাতে গদী নাই, তখনও ছিল না। পায়খানা গাড়ীর ভিতরে হয় নাই। ষ্টেশনে নামিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতে হইত। ইহাতে কখন কখন যাত্রীদের পথের মাঝখানে পড়িয়াও থাকিতে হইত। এ অভিজ্ঞতাও যে আমাদের হয় নাই এমন নয়। যাত্রীর ভীড় এখনকার চাইতে বোধ হয় বেশী হইত। এখন যতগুলি ট্রেন প্রতিদিন গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় আসে সেকালে তাহার ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় দিনে একখানা ও রাত্রিতে একখানা, এই দুইখানা ট্রেনই গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। সেকালের রেলে যাতায়াতের কথা মনে করিলে এবিষয়ে যাত্রীদের সুখসুবিধা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়।

কলিকাতা-ছাত্রাবাস

কলিকাতার প্রথম দর্শনে মনে কি ভাব জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে বিলাতের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথম লণ্ডনের আলো দেখিয়া ইংরেজ বালকের মনে হয় যে সকল ভাবের উদয় হয়, কেতাবে পড়িয়াছি, কলিকাতার প্রথম দর্শনে আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব জন্মে নাই, একথা বলিতে পারি। শিয়ালদহ হইতে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী চাপিয়া সুন্দরীমোহনের সঙ্গে শ্রীহট্ট ছাত্রাবাসে যাইয়া উঠিলাম। সেকালে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীই সচরাচর পাওয়া যাইত। ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়া আর নড়্‌বড় গাড়ী, ইহাই, এখন যেমন তখনও প্রায় সেইরূপ, কলিকাতার ছেকড়া গাড়ীর লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বোধ হয় রাজপথে বেশী বাহির হয় নাই। কুক্ কোম্পানীর আড়গড়া ছাড়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ী কোথাও পাওয়া যাইত না। আর বিবাহের মিছিল ব্যতীত কেহ কুকের বাড়ীর গাড়ী ভাড়াও করিত না।

ইংরেজীতে কলিকাতাকে City of Palaces কহে। কিন্তু প্রথম কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাসাদাবলী দেখিয়া আমার মনে কোন বিশেষ বিস্ময় বা উল্লাস জন্মে নাই। তখন কলিকাতার এখনকার চেহারাও ছিল না। অধিকাংশ রাজপথেই সারি সারি খোলার ঘর ছিল। শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া বহুবাজারের রাস্তা দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িয়া মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের মেসে যাইয়া

(২)

এখন এ রাস্তার দুধারেই পাকা বাড়ী হইয়াছে। সুসজ্জিত দোকানপাটে রাজপথের নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। সেকালে এরূপ ছিল না। নিমু খানসামার লেন বহুদিন কলিকাতার মানচিত্র হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার নাম লোপ পাইয়াছে তাহা নহে, বস্তুর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ আর নাই। নিমু খানসামার লেন এখন মেডিকেল কলেজের ভিতরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। মেডিকেল কলেজও তখন এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পুরাতন বড় বাড়ীটা মাত্র ছিল। উত্তরে ও দক্ষিণে খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। উত্তরে সে জায়গায় এখন শ্যামাচরণ লাহার চোখের হাসপাতাল হইয়াছে। দক্ষিণে আগেকার হাতার বাহিরে অনেকগুলি নূতন বাড়ী উঠিয়াছে। এইরূপে মেডিকেল কলেজ উত্তরে কলুটোলার রাস্তা হইতে দক্ষিণে বর্তমান ইডেন হাসপাতাল রোড পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ইডেন হাসপাতাল রোডের পূর্ব নাম ছিল চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন। চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন পশ্চিম মুখে যাইয়া চুনাগলিতে পড়িয়াছিল। চুনাগলির নামও বদ্‌লিয়া গিয়াছে। এখন ইহা ফিয়ার্স লেন হইয়াছে। শহরের রাস্তার এই নামবিপর্য্যয়ে কলিকাতার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের কতটা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতেছে এখনকার মিউনিসিপাল কর্তারা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। চাঁপাতলা নামের পিছনে একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল। চুনাগলির নামের পিছনেও একটা ইতিহাস ছিল। চুনাগলি বলিতে আমরা সেকালের কলিকাতার ফিরিঙ্গিপাড়া বুঝিতাম। চুনাগলির সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিভাষা ছিল। ফিয়ার্স লেন সে স্মৃতিকে জাগায় না। নিমু

খানসামার লেন নামের পিছনেও সেরূপ একটা স্থানীয় সামাজিক ইতিহাস লুকাইয়াছিল। খানসামা হইলেও নিমু একদিন কলিকাতার ঐ পল্লীতে একজন সমাজপতি ছিলেন। এইরূপ কত অলিগলির প্রাচীন নামের সঙ্গে কলিকাতার পুরাতন সামাজিক ইতিহাস জড়াইয়া আছে। নূতন বাবুদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের নাম জাহির করিবার বলবতী পিপাসাতে সে সকল ঐতিহাসিক চিহ্ন লোপ পাইতেছে। যাঁরা এমন সস্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা বা স্বজন-প্রীতির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা একথা ভাবেন না যে, তাঁদের পরে যাঁরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্তা হইবেন তাঁরাও আবার নিজেদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য আজিকার এই নামগুলি মুছিয়া ফেলিয়া পথঘাটের অন্য নামকরণ করিতে পারেন বা করিবেন। আমার মনে হয়, এর চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে সেদিন যেদিন কলিকাতার কোন পথের নামে কোন লোকের নাম যুক্ত থাকিবে না এবং মার্কিণের নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরের মতন আমাদের শহরেও রাজপথের নাম ১নং, ২নং, ৩নং, এইরূপ নম্বরওয়ারী হইবে।

(৩)

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কোন ছাত্রাবাস বা মেস্ ছিল না। মফঃস্বল হইতে যে সকল ছাত্র কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিতেন, তাঁহারা নিজেরাই বাড়ী ভাড়া করিয়া একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়া থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলার ছাত্রেরা নিজেদের এক একটা ছাত্রাবাস গড়িয়া তুলিতেন। এইরূপে ত্রিপুরা হইতে যাঁহারা আসিতেন তাঁরা ত্রিপুরা মেসে থাকিতেন। ঢাকার অনেকগুলি যুবক কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেন, এইজন্য ঢাকার দুটা

মেস্ ছিল। ইহার মধ্যে ৩৩নং মুসলমানপাড়া লেনের মেসই সর্বপ্রধান ছিল। এই মেসের সঙ্গে সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রের স্মৃতি জড়িত ছিল। বোধ হয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় এইখান হইতেই গণিতে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ৺রজনীনাথ রায়, ৺শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত প্রভৃতি সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্নসকল অনেকেই ৩৩নং মুসলমান পাড়ার মেসের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। এইজন্য সে যুগের কলিকাতার ছাত্রাবাস সমূহের মধ্যে মুসলমান পাড়ার এই মেস্ একটা আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল। বরিশালেরও বোধ হয় একটা স্বতন্ত্র মেস্ ছিল। তখনও যশোর ও খুলনা পৃথক্ হয় নাই, একই জিলা ছিল। যশোর-খুলনার একটা মেস্ ছিল। আমাদের শ্রীহট্টেরও একটা মেস্ ছিল। আমি এইখানেই আসিয়া প্রথম উঠিলাম। সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় আমার এক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই কহিয়াছি। তিনি সিলেট মেসেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়া আমিও এই দলেই ভিড়িয়া গেলাম।

(৪)

তখন ১৫ নং নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের আড্ডা ছিল। একতালা বাড়ী। অনেকগুলি ঘর। বাড়ীর দুটো খণ্ড ছিল। সিলেট মেস্ হইলেও এখানে অন্য জেলারও কেহ কেহ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুমারখালির তিনজন ছিলেন। ঢাকার একজন, এবং উত্তর বঙ্গের একজন। ঢাকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ইনি ডাক্তারী পাশ করিয়া এম. বি. উপাধি লইয়া সরকারী কর্ম গ্রহণ করেন। বহু বৎসর পরে (১৮৯৪)

ইঁহার সঙ্গে মথুরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি মথুরায় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সম্ভবতঃ সে জেলার সিভিল সার্জনের পদই লাভ করিয়াছিলেন। কুমারখালির নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ও ডাক্তারী পড়িতেন। ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া ইনি নিজের গ্রামে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বহুকাল পরে কুমারখালিতে ইঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। পরলোকগত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ও আমাদের সিলেট মেসে ছিলেন এবং এখান হইতেই ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছুদিন মফঃস্বলে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তবে এই ছাত্রাবাসের অধিকাংশ সভ্যই শ্রীহট্ট হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরাই এই মেসে থাকিতেন। শ্রীহট্ট সাহা-প্রধান স্থান। সাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণকায়স্থাদির মতনই উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল। প্রাচীন সমাজে ইঁহাদের জল চল ছিল না বলিয়া নিমু খানসামার লেনের মেসে ইঁহাদের কেহ ছিলেন না, স্বতন্ত্র মেসে অথবা অন্যান্য জেলার মেসে ইঁহাদের কেহ কেহ থাকিতেন।

(৫)

জীবনের প্রথমে বিদেশে বিভূমে আসিয়া নিঃসম্পর্কিত লোকের সঙ্গে এই আমার প্রথম একত্র বসবাস করিতে হয়। আর প্রথম দিন এই ছাত্রাবাসে আহার করিতে বসিয়া আমার ভিতরে এমন একটা আঘাত লাগে যাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। আমাদের পরিবারে সকলে আত্মপর-বিচার বিরহিত হইয়া একই খাদ্য খাইতাম। এমন কি ভৃত্যেরাও আমার বাবা এবং আমরা যে চাল খাইতাম

সেই চালই খাইতেন। মনে পড়ে, একবার একটা জমিদারী কিনিয়া বাবার অল্পবিস্তর অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। সে সময়ে আমাদের বাসার বরাদ্দ দুধ বন্ধ হইয়া যায়। বাবার শরীর তখন ভাল ছিল না। এই কারণে তাঁহাকে নিজের জন্য কিছুটা দুধের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। ইহার প্রতিবাদ করিয়া বাবা কহিয়াছিলেন, তিনি নিজে যাহা খাইতেন তাহা কম হউক বেশী হউক বাড়ীর অপর সকলকে চাকরদের পর্য্যন্ত না দিয়া জন্মে কখনো খান নাই। যতদিন বাসার চাকরবাকরদেরও দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইবে, ততদিন তিনি নিজে কখনও দুধ খাইতে পারেন না। এই ভাবেই আমি বড় হইয়া উঠিয়াছিলাম। কলিকাতায় ছাত্রাবাসে প্রথম দিন খাইতে বসিয়া দেখিলাম যে, সকলের জন্য মামুলী রকমের ডাল, ভাজা, মাছের ঝোল ও অম্বলের ব্যবস্থা; কিন্তু কেহ কেহ ইহারই মধ্যে ডিম খাইতেছেন, কেহ বা ঘি খাইতেছেন, কেহ বা দই খাইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার কি যে বিরক্তি হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত সে-কথা ভুলি নাই। বলা বাহুল্য, যে ক্রমে আমাকেও এই বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পয়সায় বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রথম দিনের কথা চিরদিনের মতন মনের উপরে দাগিয়া রহিয়াছে।

(৬)

শ্রীহট্টে থাকিতেই হিন্দুয়ানীর বন্ধন আল্‌গা হইয়া যাইতেছিল, কলিকাতায় আসিয়া তাহা একেবারে খসিয়া পড়িল। শ্রীহট্টে লুকাইয়া হিন্দুর অখাদ্য খাইতাম, কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ্যভাবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিহার করিলাম। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসের কেহ কেহ হিন্দুয়ানী ছাড়িতে রাজি ছিলেন না। বোধ হয় তাঁদের

অভিভাবকেরাও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান ও শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের এই ছাত্রাবাসে দুইটা দল গড়িয়া উঠিল। একদল কোন প্রকারের বন্ধন স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না; আর একদল সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোন অনাচার করিতে সাহস পাইতেন না। শ্রীহট্টে মুসলমানের পাঁউরুটী বিস্কুট লুকাইয়া খাইতাম। এখানে যাঁরা হিন্দুয়ানীর আবরণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও মিশ্রিগঞ্জের পাঁউরুটী ছাড়িয়া বামুনের পাউরুটী খাইতে পারিতেন না। প্রতিদিন বিকাল বেলা রুটীওয়ালা ঘরে ঘরে যার যেমন ব্যবস্থা সেইরূপ তার টেবিলে বা বিছানায় রুটী রাখিয়া যাইত। একদিন বৈকালে শ্রীহট্ট হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমাদের মেসে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই আত্মীয়ের বিছানাতেও টাটকা গরম পাউরুটী পড়িয়াছিল; ইনি আর কোন উপায়ে এই রুটীখানি লুকাইতে না পারিয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন। এইরূপ কৌতুককর ঘটনা মাঝে মাঝে হইত।

(৭)

সেকালে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে অসাধারণ সত্যানুরাগ ছিল। ফলতঃ দেশের সাধারণ লোকের মনেও এই ধারণা ছিল যে, ইংরেজীনবীস বাবুরা কখনও মিথ্যা কহেন না। আমাদের ছাত্রাবাসে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই মিথ্যা কথা কহিতে চাহিতেন না। যাঁহারা হিন্দুর অখাদ্য খাইতেন না তাঁহারাও মনে মনে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। মুসলমানেরা যাহা খান তাহা খাইলে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এ বুদ্ধি তাঁহাদের বিন্দু পরিমাণেও ছিল না। সমাজের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাঁহাদের

ছিল না। তাঁহারা নিজেরাই সরল ভাবে ইহা স্বীকার করিতেন। অন্যদিকে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া নিজেদের জাত বাঁচাইবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহিতেন না। এইজন্য এক মুসলমানের পাউরুটী ছাড়া হিন্দুর অখাদ্য অন্য কিছু ইহাঁরা খাইতেন না। আর পাউরুটী বিস্কুট খাইতেন এইজন্য যে একথা লইয়া শ্রীহট্টের সমাজে কোন কথা উঠিবার আশঙ্কা ছিল না। একবার আমাদের মেসের পাচক ব্রাহ্মণ আসে নাই। কে রাঁধিবে এই প্রশ্ন উঠিল। একরূপ বাল্যকাল হইতেই আমার রান্নার বেশ সখ ছিল। বাবাও রাঁধিতে ভালবাসিতেন। আমি বাল্যাবধিই মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার রান্নাবাড়া দেখিতাম। আজি পর্য্যন্ত আমার রান্নার সখ যায় নাই। আমাদের মেসে যখনই পাচক ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত থাকিতেন তখন অনেক সময় আমি সে কাজ করিতাম। আমাদের একজন ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে। তিনি বলিলেন, ভাত ছাড়া আর যা-কিছু তুমি গিয়া রাঁধ, ভাতের ফেন গড়াইবার সময় আমায় ডাকিও, আমি যাইয়া ভাত নামাইব। শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, এ কেমন? ডাল তরকারী সবই আমাদের হাতে খাইতে পারেন, ভাতের বেলাই অপরাধ? তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন—ভাত খাইতেও আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বাড়ী যাইয়া মিছা কথা কহিতে পারিব না। অব্রাহ্মণের হাতে ভাত খাইয়াছি কি না, লোকে এই কথাটাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। ডাল, ভাজা খাইয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিবে না। সুতরাং ভাত না খাইলে আমি তোমাদের হাতে ভাত খাই নাই, স্বচ্ছন্দচিত্তে এ কথা বলিতে পারিব।

(৮)

আমাদের মেসে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিবার জন্য ক্রমে এক নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। বেশী কষাকষি করিলে মেস্ ভাঙ্গিয়া যাইবে; যাঁরা হিন্দুয়ানী মানিতেন না তাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাঁরা সে অবস্থায় মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইল। রফাটা এই হইল যে, মেসের কোন সভ্য হিন্দুর অখাদ্য কিছু মেসের ভিতর আনিতে পারিবেন না, বাহিরে যাঁর যেমন ইচ্ছা সেইরূপ খাইতে পারিবেন।

এই রফার ফলে সুন্দরীমোহন এবং আমাকে একদিন বড় মুশকিলে পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় তখন পূজার ছুটি। একদিন ঝি বামুন কেহই আসে নাই। বাজার হইতে লুচি ও সন্দেশ আনিয়া খাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। এখন কলিকাতায় প্রায় সর্বত্র রান্না মাছ মাংস প্রভৃতি খাবার দোকান হইয়াছে। সেকালে কেবল মদের দোকানের নিকটেই এইরূপ রান্না মাছ মাংস ইত্যাদি পাওয়া যাইত। বহুবাজারের নিকটে মদন বড়াল লেনে তখন আমাদের মেস্ ছিল। আর বহুবাজারের রাস্তায় অনেকগুলি মদের দোকান ও তারই আশেপাশে রান্না মাছ মাংসেরও দোকান ছিল। সুন্দরীমোহন এবং আমি খাদ্য অন্বেষণে বহুবাজারের রাস্তায় যাইয়া এইরূপ একটা 'চাটে'র দোকান হইতে কিছু গরম লুচি ও মাংস কিনিয়া লইলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথাও বসিয়া খাবার জায়গা আছে কিনা। সে ব্যক্তি আমাদিগকে একটা ফটক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে একটি খাবারের ঘর আছে। আমরা সেই ফটক দিয়া যাইয়া একটা একতালা ঘরে ঢুকিলাম। সেখানে একটা কেরোসিনের আলো ঝুলিতেছিল। মাঝখানে একখানি টেবিল

পাতা তার দুদিকে দুখানা বেঞ্চি। আমরা ভাবিলাম যে বেশ জায়গা পাওয়া গেল, এখানে বসিয়া নির্বিঘ্নে রাত্রের খাওয়াটা সারিতে পারিব। এই ভাবিয়া আমরা যেই লুচির চুপড়ি ও মাংসের মালসা টেবিলের উপর রাখিয়া খাইতে বসিব, এমন সময় একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটা গ্লাস হাতে ও একটা বোতল বগলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে দেখিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি আমাদের লুচি মাংস হাতে তুলিয়া লইলাম। আমরা চলিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, 'লজ্জা কি বাবা, তোমরা যা কর্ত্তে এসেছ, আমিও তাই করতেই এসেছি'। তাহাকে দেখিয়াই আমাদের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল। আমরা সেখানে আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর সমস্যা হইল কোথায় বসিয়া খাইব। বাসায় লইয়া যাইবার হুকুম নাই, রাস্তায় দাঁড়াইয়া লুচি মাংস যাওয়া যায় না। আমাদের বাসার সামনেই এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানা-ঘরের পাশে একটা রোয়াক ছিল, সেখানে যাইয়া কোনও মতে খাওয়া গেল : তারপর বাসায় আসিয়া ঘরের কুঁজার জলে সেই খাদ্য গলাধঃকরণ করিলাম। ঐ রোয়াকটা প্রতিদিন প্রত্যূষে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের যে কাজে লাগিত, সে কথা মনে না করাই ভাল।

(৯)

ইংরাজী-খানার প্রথম পরিচয়

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রথম ইংরেজী খানার কথা মনে পড়িল। সেকালে উইলসনের হোটেলই কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হোটেল

ছিল। তখন আর কোন ইংরাজী হোটেলের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইংরাজীনবীস বাবুদের বিলাতী খানা খাইবার লোভ হইলে তাঁহারা এই উইলসনের হোটেলে খাইয়াই সে সাধ মিটাইতেন। আমাদেরও একদিন সে সাধ হইল। পাঁচ-সাতজন মিলিয়া আমরা উইলসনের হোটেলে খাইতে গেলাম। আজকালকার কথা জানি না, কিন্তু সেকালে উইলসনের হোটেলে ছোট ছোট খাবার ঘর ছিল, এগুলিকে Private Tiffin Room কহিত। আমরা একটা কামরা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহারো ইংরেজী-খানার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সেদিন যে-সকল খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে খানসামা যখন তাহার তালিকা আমাদের হাতে দিল, তখন আমাদের প্রথম বিপদ হইল। যাহা হউক, খাদ্য নির্ব্বাচনের ভার খানসামার উপর ছাড়িয়া দিলাম। 'যাহা ভাল আছে, সব চাইতে ভাল, তাহাই লইয়া আইস, আর গরুর মাংস আনিও না।' তারপর বিপদ হইল ছুরি-কাঁটা লইয়া। কি করিয়া ছুরি-কাঁটা ধরিতে হয় কেহই জানি না, একটু-আধটু চেষ্টা করিতে যাইয়া দেখিলাম তাহাতে পেট ভরিয়া খাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অথচ পয়সা দিতে হইবে বিস্তর। সুতরাং একটা বুদ্ধি বাহির করা গেল। এটা আনো ওটা আনো বলিয়া খানসামাকে ঘরের বাহির করিয়া দিতে লাগিলাম। যেই সে দরজার বাহিরে গিয়াছে, অমনি হাতে-দাঁতে কসরৎ করিয়া রোষ্ট কাটলেট্ প্রভৃতি কোন প্রকারে চোরের মতন খাইতে লাগিলাম। ইহাই উইলসনের হোটেলে ছাত্রাবস্থায় আমার প্রথম এবং শেষ বিলাতী খানা খাইবার প্রয়াস।

(১০)

বোধহয় সর্ব্বপ্রথমে স্থির হইয়া বসিয়া মুরগীর 'কারী' খাই গণেশ

চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে। তাঁহার এক খুড়তুতো ভাই প্রেসিডেন্সি কলেজে সুন্দরীমোহনের সঙ্গে পড়িতেন। তিনি তখনও ৺চন্দ্র মহাশয়ের একান্নভুক্ত ছিলেন, পরে বিষয় ভাগ হইয়া যায়; এইখানেই সুন্দরীমোহন এবং আমাদের মেসের আরও কয়েকজন প্রথমে যাইয়া মুরগীর 'কারী' খাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী আমার সতীর্থ ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা স্কুল হইতে দুজনেই একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতায় আসি। তারাকিশোর মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। কলিকাতায় আসিয়া আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই। তারাকিশোর পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রো-পলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে যাইয়া ভর্ত্তি হন। তারাকিশোর পরজীবনে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়া ওকালতি ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অনেক সময় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপক্ষে তাঁর সমকক্ষ কোন উকিল দাঁড় করাইতে হইলে মক্কেলরা চৌধুরী মহাশয়েরই সাহায্য লইতেন। তিনিও এই ভোজে নিমন্ত্রিত হন। রাত্রিকালে মুরগী খাইয়া আসিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তারাকিশোর ছাদে দাঁড়াইয়া নিজের হাতের পেশীসকল পরীক্ষা করিতেছিলেন। শুনিয়াছিলেন, মুরগী খাইলে গায়ে খুব জোর হয়। কথাটা সত্য কি মিথ্যা পরদিন প্রত্যূষেই তাহা দেখিবার চেষ্টা করেন। তারাকিশোর এখন গার্হস্থাশ্রম অতিক্রম করিয়া যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বর্ত্তমান আশ্রমে লোকে "ব্রজবিদেহী শান্তদাস" বাবাজী বলিয়া জানে।* আমার কলিকাতার ছাত্রজীবনের সঙ্গে তারাকিশোর ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ছিলেন।

---

* 'সত্তর বৎসর' 'প্রবাসীতে' (১৩৩৪) প্রকাশিত হইবার পর ইনি দেহরক্ষা করেন।

(১১)

ছাত্রাবাস না 'জনরাজ্য' ?

সেকালে কলিকাতার ছত্রাবাসগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জন-রাজ্য বা Republic ছিল। যে বাড়ীতে কতকগুলি ছাত্র মিলিয়া বাস করিতেন, সে বাড়ীর সমুদয় কাজকর্ম্ম তাঁহাদের অধিকাংশের মতে নির্ব্বাহ হইত। প্রতি মাসে সকলে বসিয়া মাসিক খরচের একটা বরাদ্দ করিয়া দিতেন। প্রত্যেক ঘরের কোন্ সীটের কত ভাড়া সকলে মিলিয়া ঠিক করিতেন। তারপর যার যে ঘর বা যে সীট পছন্দ হয়, তিনি তাহা বাছিয়া লইতেন; এই লইয়া কখনও কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দেখি নাই। তারপর মোটামুটি প্রতি মাসের একটা বাজেট (budget) ঠিক হইত এবং একজন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইতেন। এই বাজেট মত যতটা সম্ভব তিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। ম্যানেজার সচরাচর এক মাসের জন্যই নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহাকে বাসার খাই-খরচের হিসাব রাখিতে হইত। চাল, ডাল, ঘি, তেল প্রভৃতি নিজে যাইয়া কিনিয়া আনিতে হইত। ভাল জিনিষ না আনিলে বা আনিতে না পরিলে তাঁহার উপর রীতিমত সাধারণ সভাতে সেন্সার (censure) আনা হইত। মাসিক বাজেটের বেশী খরচ হইলে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার অক্ষমতা বা অনবধানতার জন্য নিন্দার ভাগী হইতেন এবং সভ্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিতেন। এই নিন্দার ভয়ে কখনো কখনো কোন মাসের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নিজের তহবিল হইতে বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় পুরণ করিয়া দিতেন। কখনো কোন মাসে কর্ম্মকর্ত্তার কৃতিত্বে বাজেটের টাকা উদ্বৃত্ত হইলে, মাসের শেষ দিকে যথাযোগ্য সমারোহ সহকারে সভ্যদের বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা হইত। মেসের সভ্যদের

সাধারণ সভাতেই পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদেরও বিচার এবং মীমাংসা হইত। এই উপলক্ষে রাত্রে আহারান্তে আমাদের সাধারণ আদালত বসিত। বাদী প্রতিবাদীকে এই আদালতে নিজেদের বক্তব্য বিবৃত করিতে হইত এবং প্রয়োজন হইলে সাক্ষী-সাবুদও এই আদালতের সমক্ষেই উপস্থিত করিতে হইত।

একবার মনে পড়ে, তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বাসার কোন সভ্যের ঝগড়া হয়। তিনি চৌধুরী মহাশয়কে কি গালি দিয়াছিলেন; তারাকিশোর বাবু তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই লইয়া তিন চার দিন রাত্রি নয়টা হইতে প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত আমাদের এই কোর্ট বা আদালত বসিয়াছিল। সময় সময় আমাদের এই সাধারণ আদালতে অতি গুরুতর বিষয়েরও বিচার নিষ্পত্তি হইত। কোন সভ্য কোন গর্হিত আচরণে দোষী হইলে তাঁহাকে মেস ছাড়িয়া যাইতে হইত। ইহাই আমাদের 'জনরাজ্যের' নির্বাসন-দণ্ড ছিল। এই নির্বাসন-দণ্ডকে সকলে অত্যন্ত ভয় করিতেন। কোন বন্ধুর উপরে একবার এই দণ্ড বিহিত হইয়াছিল। আমাদের বাসা হইতে চলিয়া যাইবার পাঁচ ছয় দিন পরে তাঁহার সঙ্গে পথে দেখা হয়। দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি ছয় মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ছাত্র-জীবনে ছাত্র-লোকমতের এতই প্রভাব ছিল যে, ইহার ভয়ে এই বিদেশ বিভূমে অভিভাবকশূন্য হইয়া বাস করিয়াও আমরা সহজে বিগ্‌ড়াইয়া যাইতে পারিতাম না।

(১২)

ছাত্রদের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব

আমাদের ছাত্রাবাসে এক সুন্দরীমোহন দাস ছাড়া প্রথমে আর

কোন ব্রাহ্ম যুবক ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও সেকালে কলিকাতা-প্রবাসী যুবকদিগের উপরে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এতটা পড়িয়াছিল যে প্রায় কোন ছাত্রাবাসেই কোন প্রকারের ধর্ম্ম-নীতি বিগর্হিত চালচলন প্রশ্রয় পাইত না। অথচ আমরা যে নিতান্তই রুচিবাদী ছিলাম এমন নহে। বরঞ্চ এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ছুঁৎমার্গকে খুবই বিদ্রূপ এবং উপহাস করিতাম। ব্রাহ্মেরাও নিজেদের দলের ঐসকল অতিরুচিবাদকে কখনো কখনো তীব্র উপহাস করিতে ছাড়িতেন না। আমি কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ,' প্রহসন খানি প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার দলের উপর বিস্তর বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী'-তে লিখিয়াছিলেন—

'গম্ভীর ব্রাহ্মিকা মূর্ত্তি,
নাহি সুখ নাহি দুখ
সতত বিষণ্ণ মুখ—
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার।
এত পাপ যার ঘরে কি সুখ তাহার!'

আমরা এসকল ঠাট্টা-তামাসা খুবই উপভোগ করিতাম। অথচ ইহাতে চরিত্রের শুদ্ধতা কিংবা ব্রাহ্মসমাজের উদার ও উন্নত আদর্শের প্রতি কখনও কোন প্রকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা নষ্ট হয় নাই।

(১৩)

হাস্য-কৌতুকের গান আমাদের বৈঠকে প্রায় সর্ব্বদাই হইত, সে সকল গান এবং রঙ্গ-কৌতুক এখন বড় শোনা যায় না। একটা মনে পড়ে :—

'ওহে লুচিনাথ কেমন কঠিন তুমি কচুরী.
ওহে ছানা, পুরাও বাসনা
চিনিতে মাখিয়ে তোমায় বদনে ভ'রি।
পানিতোয়ার শিরে দিয়ে হাত
কি বোল বলিয়ে গেলে ওহে গজানাথ,
তোমার লাগিয়ে পাতেতে পড়িয়ে
কাঁদিতেছে কাঁচাগোল্লা সুন্দরী।'

আমার কলিকাতা আসিবার কয়েকমাস পূর্বে হাওড়ার পোল হইয়াছে। এই লইয়াও গান রচিত হইয়া পথেঘাটে প্রচারিত হইয়াছিল।

'কি পোল বেঁধেছে হাবড়াতে দেখি চল না।
কত হাতী ঘোড়া যাচ্ছে চলে তোমার বুঝি সখ হ'ল না।'

ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাও কৌতুক-গানের সৃষ্টি করিয়াছিল। একজন সুরসিক তাহা লইয়া এই দেহ-তত্ত্বের সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—

"নহে নিত্য, জেন সত্য—
এ দেহ, রে মন।
এই যে কর্ত্তাভজা, ব্রহ্মভজা,
এরাই দুদিন মজা নেবে।
এরা ছত্তিশ-জাতের অন্ন খাবে,
শেষে সব উৎসন্ন যাবে, এ দেহ, রে মন।

(১৬)

রঙ্গালয় ও নূতন স্বদেশপ্রেম

সেকালে কলিকাতায় তুইটা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এক বেঙ্গল থিয়েটার, আর এক ন্যাশনাল থিয়েটার। প্রথমে পুরুষেরাই স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতেন। পরে বাংলার রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোক-দিগকে আনা হয়। এই লইয়া সমাজে খুব আন্দোলনও হইয়াছিল। কেহ কেহ আজিও এজন্য বাংলার রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা খুবই তখনকার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। অথচ এইজন্য সেকালের ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষ তুশ্চরিত্রতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল ইহা বলা যায় না। সে যুগ ছিল সমাজ-সংস্কারের যুগ। 'বিধবা-বিবাহ নাটক', 'বহুবিবাহ নাটক' 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' এইগুলিই তখনকার রঙ্গমঞ্চে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইত। দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাই বারিক' এগুলিও সামাজিক নাটক ছিল। আমার কলিকাতায় আসার অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে তখনকার বাংলা রঙ্গালয়ের একজন প্রধান অভিনেত্রী সুকুমারীর বিবাহ হয়। হরিদাস দত্ত একজন অভিনেতা ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ হয়। ১৮৭৪ ইংরাজীর তিন আইন মতে ইঁহাদের বিবাহ হয়। সমাজ-সংস্কারকেরা এই বিবাহের বিশেষ সমর্থন করেন।

(২)

'নীলদর্পণ'

সে যুগ ছিল নূতন স্বদেশ-প্রেমেরও যুগ। বাংলার রঙ্গালয়ে

প্রায়ই স্বাদেশিক নাটকেরও অভিনয় হইত। এগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ' সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিল। 'নীলদর্পণের' প্রথম প্রস্তাবনাতে জনকয়েক কৃষক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া গান ধরিত—

'নীল বানরে সোনার বাংলা কর্‌লে ছারখার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের হল কারাগার।

এখন সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।'

'নীল-দর্পণের' অভিনয়ে দর্শকদিগের মধ্যে অনেক সময় অসম্ভব উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। যে অঙ্কে নীলকর ইংরেজ বাঙ্গালী বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়, তাহার অভিনয় দেখিয়া লোকে খেপিয়া যাইত। চারিদিক হইতে মার মার শব্দ উঠিত এবং মাঝে মাঝে দর্শকমণ্ডলী হইতে জুতা পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া মারা হইত। যবনিকা পতনের প্রাকালে যখন নাটকের নায়ক গলদশ্রু কণ্ঠে কহিতেন—

'নীলকর বিষধর বিসপুরা মুখ,
জ্বলন্ত শিখায় ঢেলে দিল যত সুখ ;
পতি-পুত্র-শোকে মাতা হয়ে পাগলিনী
সহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী।'

তখন জনতাপূর্ণ রঙ্গালয়ে প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইত।

'নীলদর্পণ' এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র নাম পর্য্যন্ত বোধ হয় আজিকার লোকে জানেন না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই দুইখানি নাটকের

অভিনয়ে আমাদের স্বাজাত্যাভিমান কতটা পরিমাণে যে জাগিয়াছিল তাহার ঠিক ওজন করা কঠিন। 'ভারতমাতা' নামে একখানি গীতিকাব্যও অভিনীত হইত।

(৩)

জাতীয় সঙ্গীত

বাংলার রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে সেকালে অনেকগুলি জাতীয় সঙ্গীত বা স্বদেশ-প্রেমাত্মক গান দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

'কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে।'

আগ্রার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই সঙ্গীতটির তখন খুবই প্রচার হইয়াছিল। পথেঘাটে সকল শ্রেণীর লোকের মুখেই এই গানটি শোনা যাইত।

যমুনাকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দচন্দ্র রায়ের আর একটা গান ছিল—"যমুনা-লহরী"। শুনিয়াছিলাম, আগ্রার দুর্গের নীচে যমুনা-তীরে বসিয়া কবি এই সঙ্গীত রচনা করেন।

'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও
যুগ-যুগবাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কতশত ঘটনা ও।'

এই 'যমুনা লহরীতে'ই সর্বপ্রথম ভারতের পুরাগত ইতিহাস-ধারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক স্বদেশাভিমানকে কবি অপূর্ব কলাকুশলতা সহকারে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবের ঐতিহাসিক জাতীয় সঙ্গীত আমাদের বড় বেশী নাই।

আর একটা জাতীয় সঙ্গীত গভীর করুণ-রসাত্মক ছিল। বোধ হয় 'ভারতমাতা' গীতিনাট্যে ইহা গীত হইত।

'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি-দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
হায় রে, এ দুঃখ কেমনে নেহারি।'

এই সময়েই ৺মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন' গানটাও প্রচারিত হয়।

'দিনের দিন সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সুতো জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।
হায় রে! দেশের কি দুর্দ্দিন!
সূঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই-কাঠি তা'ও আসে পোতে,
খেতে শুতে যেতে, প্রদীপটি জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য যত সব নিল শু'ষে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা-ভুষি শেষে।
হায় রে! বিধি কি কঠিন!'

গোড়ায় এই পদ ছিল—'হায় রে রাজা কি কঠিন!' পরে দণ্ডবিধির ভয়ে 'রাজা'র স্থানে 'বিধি' বসান হয়েছিল। কিন্তু লোকে গাহিবার সময় 'রাজাই' গাহিত।

আমার ছাত্রজীবনে এগুলির খুবই চর্চ্চা ছিল। মেসে মেসে এই সকল গান হইত। সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির ধারে যখন চারিদিকে হইতে ছাত্রেরা হাওয়া খাইতে আসিয়া জড় হইত, তখন দলে দলে ঘাসের উপরে বসিয়া এই সকল গান করিত এবং সঙ্গীত- লহরীতে গোলদীঘির চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই সকল সঙ্গীতেই সর্বপ্রথম আমাদের 'স্বদেশী'র প্রেরণা জাগিয়াছিল। সেই সময় হইতেই বিলাতী পণ্য বর্জ্জনেরও প্রথম সূত্রপাত হয়। রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ইঁহারাই এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইঁহারাই 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু-মেলা'র কথা পরে কহিব।

(১৭)

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হই। এ বছর এত বেশী ছেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে যায় যে এক ঘরে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সকল ছাত্রের স্থান হয় নাই। সুতরাং দুইখণ্ডে আমাদের ক্লাস বিভক্ত হয়। ইহার "A" (Section A) বিভাগে আমি স্থান পাই। কলিকাতার প্রথম বড় ইংরাজী বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ; ১৮১৭ ইংরাজীতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এখনকার সংস্কৃত কলেজের একসঙ্গেই তখন হিন্দু কলেজ ছিল। এখন যে জায়গায় এলবার্ট হল হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্বে কলিকাতা স্কুল ছিল। কলিকাতা স্কুল কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্থাপন করেন। ১৮৭৬ ইংরাজীতে তখনকার প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষ দেখিতে আসেন। তখন তাঁহার নামে কলিকাতা স্কুলের নাম 'এলবার্ট স্কুল' হয়, পরে তাহা এলবার্ট কলেজে পরিণত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় এলবার্ট স্কুলের ও পরে এলবার্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পদবী ছিল Rector। ওই বাড়ীতেই যুবরাজের স্মৃতিরক্ষার জন্য এলবার্ট হলের প্রতিষ্ঠা হয়। সে-সময় কেশবচন্দ্র প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া ঐ বাড়ী এবং তাহার সংলগ্ন জায়গা এলবার্ট হলের জন্য কিনিয়া লয়েন। আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে আগেকার 'কলিকাতা স্কুলে'র বাড়ীতেই কোন কোন ক্লাস বসিত। তখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের এখনকার বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই। বোধহয় আমার আসার কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাড়ী শেষ হয় এবং এখানেই প্রেসিডেন্সি

কলেজ উঠিয়া আসে। আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে যাই, তখনও কিন্তু তাহার এখনকার উত্তর অংশ তৈয়ারী হয় নাই। পূর্ব-দিকের অংশও এখনকার আয়তন লাভ করে নাই। চারিদিকে রেলিং উঠে নাই। উত্তরদিকে একটা একতলা বাড়ী ছিল। সেখানে রসায়নের ক্লাস বসিত।

(২)

শ্রীযুক্ত সাট্‌ক্লিফ্ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বা Principal ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তিনি গণিত পড়াইতেন। দুই শত, আড়াই শত ছেলের প্রত্যেককে তিনি চিনিতেন বলিয়া মনে হয় না। তবে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন বৃত্তি লইয়া আসিত তাহাদের সকলকেই তিনি চিনিতেন। সুতরাং বৃত্তিধারী ছাত্রদের পক্ষে সাট্‌ক্লিফ সাহেবের ক্লাসে উপস্থিত না থাকা নিরাপদ ছিল না। আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন নীলমণি তর্কালঙ্কার। ইনি যেমন ভাল পড়াইতেন, তেমনি তাঁর শাসনও ছিল কড়া। প্রতিদিন ক্লাসে ঢুকিয়াই বেয়ারাকে রেজিষ্টারী খাতা আনিতে হুকুম দিতেন, এবং পড়ানো শুরু করিবার পূর্ব্বে কাহারা ক্লাসে আছে বা নাই ইহা রেজিষ্টারীতে দাগ দিয়া দিতেন। সুতরাং তাঁহার ক্লাস হইতেও অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা বড় বেশী ছিল না। আমাদের সংস্কৃত-পাঠ্য ছিল 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম কয়েক সর্গ আর ভবভূতির 'উত্তর রাম-চরিত'। নীলমণি পণ্ডিত মহাশয় 'কুমারসম্ভব' পড়াইতেন। আর ভবভূতি পড়াইতেন রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয়। নীলমণি পণ্ডিত মহাশয় যেমন কড়া ছিলেন, রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয় তেমনই সাদাসিধা গোছের লোক ছিলেন। ক্লাসে বসিয়া রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না। 'উত্তর-চরিতে'র প্রথম অঙ্ক চিত্রপট-দর্শন। এক জায়গায় চিত্রে

হনুমানকে দেখাইয়া লক্ষ্মণ কহিতেছেন—অয়ম্ আর্য্য হনুমান। আমাদের সতীর্থদের মধ্যে একজন লম্বা-চওড়া বিহারী ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয়ের ঠিক সামনে বসিতেন। আর সুরসিক পণ্ডিত—অয়ম আর্য্য হনুমান-এর বঙ্গানুবাদ করিয়া তাঁহাকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিতেন। আর অমনি ক্লাসে হাসির রোল উঠিত। 'উত্তর-চরিতের' যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া তপঃনিরত শূদ্রকমুনি দিব্যদেহ পাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যের পথ দেখাইয়া লইয়া যান, সেখানে প্রকৃতির বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শূদ্রকের মুখে গোটা কয়েক অতি কঠিন সমাসাচ্ছন্ন শ্লোক বসাইয়াছেন। এইস্থান পড়াইবার সময় রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয় সর্বদাই অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। আর শূদ্রক যেই—'দেব পশ্য পশ্য' বলিয়া এই সকল শ্লোক আওড়াইতে আরম্ভ করিতেন, অমনি রাজকৃষ্ণ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন—'বেটা যাবি যাচ্ছিস চলে যা না, আবার 'দেব পশ্য পশ্য' বলে জ্বালাতে বসল'।

(৩)

আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন দুইজন—মিঃ বেলেট্ এবং প্যারীচরণ সরকার। বেলেট্ সাহেব খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন, পড়াইতেনও খুব ভাল। এজন্য প্রায় কেহই তাঁর ক্লাসে পলাইত না, যদিও নীলমণি পণ্ডিত মহাশয়ের মত তিনি ক্লাসে আসিয়াই রেজিষ্টারী ডাকিতেন না। তবে এক পড়ান ছাড়া বেলেট্ সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদের আর কোন প্রকারের সম্বন্ধ ছিল না। তিনি মাথা হেঁট করিয়া ক্লাসে ঢুকিতেন; আসনে বসিয়া বই খুলিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিতেন, ছেলেদের সঙ্গে প্রায় কোন কথা বলিতেন না।

একবার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কোন ছেলেকে বেলেট্

সাহেব কি সামান্য অপরাধে স্কুল-বালকের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। ইহাতে ক্লাসশুদ্ধ ছেলেরা খেপিয়া উঠে। বেলেট্ সাহেব উপরে চলিয়া গেলে তাহারা হল্লা করিয়া সিঁড়ির নীচে জড় হয়। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া বেলেট সাহেব নীচে নামিয়া আসিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাহস পান নাই। কলেজ ছুটি হইয়া গেল, তবুও ছেলেরা জড় হইয়া রহিল। আমরা তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে আমরাও যাইয়া যোগ দিলাম। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পরে বেলেট্ সাহেব আমাদের লজিকের অধ্যাপক প্যারী (Parry) সাহেবকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া আসিলেন। সকলের নীচের সিড়িতে আসিবামাত্র একজন ছাতা দিয়া আঘাত করিয়া তাঁহার টুপিটা ফেলিয়া দিল। তিনি সেই ছেলেকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। 'কিন্তু তখন অন্য ছেলেরা তাঁহার সামনে আসিয়া তাঁহাকে আটকাইল। তাহারা বেলেট্ সাহেবকে প্রহার করিয়াছিল কি না ঠিক নাই, তবে হাতে না মারিলেও অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছিল। সাট্‌ক্লিফ সাহেব পরদিন এই লইয়া কলেজে একটা হুলুস্থুল বাধাইলেন না। আমরা এরূপ শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বেলেট্ সাহেবকেই বেশী ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। কলেজের ছেলেদিগকে স্কুলের বালকের মতন শাস্তি দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, বেলেট্ সাহেবকে খোলাখুলি একথা কহেন। আর যে ছেলে তাঁহার টুপিতে ছাতা দিয়া আঘাত করিয়াছিল, তাহাকে এক বৎসরের জন্য কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সাট্‌ক্লিফ সাহেব সর্ব্বদাই ছেলেদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

(৪)

একবার একটি ছেলের বিরুদ্ধে পুলিসের নিকটে কি একটা

অভিযোগ আসিয়াছিল। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা লইয়া কলেজে ছেলেটিকে সনাক্ত করিতে আসে। সাট্‌ক্লিফ সাহেবের কাছে এই খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি ক্লাসে আসিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে পুলিশের লোককে কলেজের বাহিরে যাইতে বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানার দোহাই'তে কর্ণপাতও করেন না। 'আমার কলেজের কর্ত্তা আমি, আমার ছেলেরা যতক্ষণ কলেজে থাকে ততক্ষণ তারা আমার এলাকার অধীন, এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট ত ছোট কথা লাট সাহেবেরও কোন হুকুম চালাইবার এক্তিয়ার নাই। বিলাতের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাই নিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভিতরে বাহিরের কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কিছু করিবার অধিকার নাই।' সাট্‌ক্লিফ সাহেব কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজকে এইরূপ নিয়মাধীনে রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেদিগকে বাস্তবিক পুত্রের মতন স্নেহ করিতেন। যারা তাঁহার কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিত তাহাদিগকে বড় সরকারী কাজ জুটাইয়া দিতেন। এইসকল কারণে সে কালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা সাট্‌ক্লিফ সাহেবকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিত। সাট্‌ক্লিফ সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে প্রেসিডেন্সি কলেজে গুরু-শিষ্যের পূর্বকার সম্বন্ধ ক্রমে লোপ পায়।

(৫)

প্যারীচরণ সরকার

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ৺প্যারীচরণ সরকারের সাক্ষাৎকার লাভ করি। শৈশব হইতেই প্যারীচরণ সরকারের নাম

শুনা ছিল। সেকালে ইংরাজী স্কুলের ছেলেরা সরকার মহাশয়ের First Book of Reading, Second Book of Reading, Third Book of Reading এবং Fourth Book of Reading—বেশীর ভাগ এই বইগুলি পড়িত। কেন জানি না শ্রীহট্টের পাদ্রীস্কুলে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া আমাকে মরে'র বই—Murray's Spelling Book পড়িতে হইয়াছিল। তারপর রয়াল রীডার গ্রন্থাবলী পড়ি। প্যারীবাবুর বই পড়ি নাই। কিন্তু তাঁর বই দেখিয়াছিলাম এবং তাঁর খ্যাতিও জানা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া এইজন্য তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। এ আকর্ষণের কোন বাহ্য কারণ ছিল না। সরকার মহাশয় অত্যন্ত মিতভাষী ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে খুব যে মাতামাতি করিতেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁর স্বভাব এমনই মধুর ছিল যে বেশী কথা না কহিয়াও তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রতি আশ্চর্য্যরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজীর সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বেশীদিন তাঁহার নিকটে পড়িবার সৌভাগ্য হয় নাই। ১৮৭৫ ইংরাজীর জুলাই কি আগষ্ট মাসে তাঁর হাতে একটা ক্ষত হয়; তাহা হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনে এই প্রথম একজন নিঃসম্পর্কিত—এমন কি একরূপ অপরিচিত বলিলেও হয়—ব্যক্তির পরলোকগমনে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম।

প্যারীচরণ যে যুগের লোক ছিলেন, সে যুগের ইংরাজী-নবীসেরা প্রায় সকলেই স্বল্পবিস্তর উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ছিলেন। বোধহয় সকলেই কম-বেশী মদ্যপান করিতেন। মদ্যপান এবং হিন্দুর অখাদ্য মাংসাদি ভক্ষণ সেকালে কুসংস্কার-বর্জ্জিত ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালীদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের লক্ষণ ছিল। অনেকে সন্দেহবাদী এমন কি নিরীশ্বরবাদী পর্য্যন্ত ছিলেন। এই যুগে জন্মিয়া, এই সকল সহবাসের

মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াও প্যারীচরণ কোনদিন কোন প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতা করেন নাই। প্যারীচরণ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই। অথচ সেকালের ব্রাহ্মেরা যেমন সত্যবাদী, মিতাচারী এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ ছিলেন, প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ও তাই ছিলেন। সে-যুগের ইংরাজী-নবীসদিগের মধ্যে মদ্যপান খুব বেশীমাত্রায় চলিয়াছিল। ইহার বিষময় ফলও অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ইংরাজী-নবীস বাঙ্গালীরা অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মদ্যপানের এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সরকার মহাশয় সর্বপ্রথম মদ্যপান-নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশে তখনও স্ত্রীশিক্ষার বহুল-প্রচার আরম্ভ হয় নাই। কলিকাতায় হেদুয়ারপশ্চিমে বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বালিকারা ক্বচিৎ বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতেন। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় আপনার কন্যাকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় দেখিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ভদ্র পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা না করিলে কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর ভদ্রমহিলাদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার অসম্ভব। এইজন্য তিনি আপনার ব্যয়ে নিজের ভদ্রাসন বাড়ীতে "চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পরেও এই বিদ্যালয়ের কাজ চলিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার এই বিদ্যালয়ের ভার বহন করিয়াছিলেন।

এ দেশে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার এবং নূতন ইংরাজ-নবীসদিগের মদ্যপান নিবারণ সরকার মহাশয়ের জীবন-ব্রত ছিল। বোধহয় তাঁহার পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে আর কেহ মদ্যপান নিবারণের জন্য এমন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মদ্যপান

নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠার বহুদিন পরে কেশবচন্দ্র বাংলার শিক্ষার্থী যুবকদের মধ্যে Band of Hope বা 'আশাবাহিনী' প্রতিষ্ঠিত করেন। সরকার মহাশয়ের মদ্যপান নিবারণের আন্দোলনের কথা সাধারণ লোকের মধ্যেও খুব জাহির হইয়াছিল। আমার ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় এ সম্বন্ধে একটি গান বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃতে মধু শব্দ মদ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনুতে ব্রহ্মচর্য্যের বিধানে আছে 'বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ'। এই গানে মধু শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

"মধুপান আর করো না।
প্যারীচাঁদ করেছে মানা। ইয়ংবেঙ্গল আর বাঁচবে না।
খাড়া বড়ি থোড়ের নাড়ী
তাতে হ'লে বাড়াবাড়ি
অগ্নি যাবে যমের বাড়ী, কালবিলম্ব আর সবে না।
যে মদেতে হরিশ ম'লো
যাতে গুপ্ত লুপ্ত হ'লো
সে মদ পান করো না ভাই।—
কিন্তু ডাঙ্গা পথে নাইক মানা।

শেষ পদে বোঝা যায়, এই গানটি কোনও গঞ্জিকাভক্ত কবির রচনা, ডাঙ্গাপথ অর্থ গাঁজার পথ।

আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ

কহিয়াছি যে ১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথমে আমি কলিকাতায় আসি। ইহার মাস দুই পূর্ব্বে ১৮৭৪ ইংরাজীর ৩রা নভেম্বর তারিখে আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীহট্টে থাকিতেই আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন আমার পৈতৃক ভদ্রাসন হইতে ৫।৬ ক্রোশ ব্যবধান। আমাদের বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিম প্রান্তে। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ী মৈমনসিংহের পূর্ব প্রান্তে। মৈমনসিংহের লোক হইলেও বসু পরিবারের আদান প্রদান শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার ভদ্র সমাজের সঙ্গেই ছিল। এই কারণে বাল্যকাল হইতে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নিজের ও পরিবারবর্গের কথা আমার জানা ছিল। আনন্দমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জ্বল বর্ণে লিখিত আছে। এম্-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আনন্দমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাতে যাইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানেও গণিতের পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং ব্যারিষ্টারের সনন্দ লইয়া বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।*

* (কথিত আছে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়ায় আনন্দমোহন গণিতে 'সিনিয়র র‍্যাংলারে'র উচ্চতম পদ লাভ করিতে পারেন নাই।)

— সম্পাদক

(২)

কলিকাতা ছাত্রসভা

আনন্দমোহন বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে বোম্বাইয়ে দিন কয়েক থাকিয়া সেখানকার ছাত্রসমাজের কাজ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অবসরকালে দল বাঁধিয়া দেশসেবায় নিযুক্ত হইতেন। বিশেষভাবে তাঁহারা সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদের দেশসেবার চেষ্টা দেখিয়া আনন্দমোহনের অন্তরে বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্খা হয়। কলিকাতায় আসার কিছুদিন পরেই এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দমোহন কলিকাতা ছাত্রসভা বা Students' Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। আমার কলিকাতা আসার অল্পদিন পরেই এই Students' Association এর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অগ্রণী ছাত্রদের প্রায় সকলেই এই সমিতিতে যোগদান করেন। যতদূর মনে পড়ে ৺নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় এই ছাত্র-সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। নন্দকৃষ্ণ বসু বোধহয় সেই বৎসরই বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ উপাধি লইয়া নন্দকৃষ্ণ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে বোধহয় ১৮৭৮ ইংরাজীতে Statutory Civil Service প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার প্রথম পদে নির্বাচিত হয়েন এবং ক্রমে জেলা জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীও সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন। তিনিও এই ছাত্রসভার পরে সম্পাদক হইয়াছিলেন। সেকালের আর একজন কৃতী ছাত্র সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ও এই ছাত্রসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নন্দকৃষ্ণ

বসু মহাশয়ের ন্যায় অগস্তি মহাশয়ও স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা এই কলিকাতা ছাত্রসভা হইতে পাইয়াছিলেন।

(৩)

সুরেন্দ্রনাথের নূতন কর্মক্ষেত্র

কলিকাতা ছাত্রসভা বা Students' Association আনন্দ-মোহনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও সুরেন্দ্রনাথই ইহাতে অসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ ইংরেজীর মাঝামাঝি সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। পদচ্যুত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের রায়ের বিরুদ্ধে ভারত-সচিবের নিকটে আপীল করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঐবার বিলাত গিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার এই আপীল অগ্রাহ্য হইল তাহা নহে, তিনি যে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিবেন আশা করিয়াছিলেন, সে পথেও বাধা পাইলেন। তাঁহার পদচ্যুতি নিবন্ধন কর্ত্তারা তাঁহাকে ব্যারিষ্টারের সনন্দ দিতে আপত্তি করিলেন। গভীর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার জীবিকা অর্জনের সকল পথই একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। ইংরেজ আমলাতন্ত্র তাঁহাকে দাগিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে কোন বড় বে-সরকারী কর্ম্ম পাওয়াও অসম্ভব হয়। সেকালে আমাদের সমাজে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের এমনই প্রভাব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার মেট্রো-পলিটান ইনষ্টিটিউশনে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যত জীবন কি হইত তাহা বলা যায় না।

১৮৭০ ইংরেজীতে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাংলার শাসনকর্ত্তা

ছিলেন। তিনি এক নূতন শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করেন। এতাবৎকাল গভর্ণমেণ্ট উচ্চ-ইংরাজী শিক্ষার জন্য যতটা টাকা খরচ করিতেন তাহা মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তানের উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য ব্যয় হইত ইহা সঙ্গত নহে; ইহার বেশী টাকা জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য খরচ করা উচিত। এই অজুহাতে ক্যাম্বেল সাহেব ইংরাজী কলেজগুলি তুলিয়া দিতে চাহেন। তাঁহার এই নূতন শিক্ষানীতিতে বাংলার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় ভীত হইয়া উঠেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধান করিবার জন্যই নিজ ব্যয়ে মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিটিউশন-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বে-সরকারী কলেজের পথ-প্রদর্শক। এই মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিটিউশন-এর প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পাদ্রীদের কলেজের উপরেই বহুল পরিমাণে বাঙ্গালীর উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ নির্ভর করিত। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খুবই উৎসাহ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে বন্ধুপুত্র বলিয়া নিজের পুত্রের মতনই দেখিতেন। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজীর অধ্যাপনাতে অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার কলেজে ইংরাজী-অধ্যাপকের পদে আনিয়া বসাইলেন। ইহা হইতেই সুরেন্দ্রনাথের দেশ-সেবা এবং নূতন কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিটিউশন-এ কর্ম্ম পাইবার অল্পদিন মধ্যেই আনন্দমোহনের সঙ্গে কলিকাতা ছাত্রসভার কাজে আসিয়া যোগদান করিলেন।

(৪)

বাগ্মিতার বিকাশ ও স্বাধীনতার ভেরী

কলিকাতা ছাত্রসভাতেই সর্ব্বপ্রথম সুরেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বাক্‌-বিভূতি প্রকাশিত হয়। তখনও আমাদের নূতন ইংরেজী নবীসদিগের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা বেশী আরম্ভ হয় নাই। সেকালে বাঙ্গালী চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে বাংলায় বলিতেন বটে, কিন্তু বাহিরে সর্ব্ব-সাধারণের নিকটে তিনিও প্রায় সর্ব্বদা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। এক সময়ে কেশবচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান চিন্তানায়ক ছিলেন। কিন্তু আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা একটু একটু করিয়া হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। এক সময়ে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মমতের অনুরাগী ছিলেন। যাঁহারা সেকালের য়ুরোপীয় নাস্তিক্য-বাদের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কারের অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ দেশের চিত্তে ও চরিত্রে একটা যুগান্তর আনিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে ধরিয়া এ দেশে একটা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ সমগ্র ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তবে যাঁহারা মনে মনে ব্রাহ্ম মতবাদ মানিতেন এবং ব্রাহ্মদিগের সামাজিক আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আবার সমাজচ্যুতির ভয়ে

প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। এই দুর্বলতানিবন্ধন ইঁহারা নিজেদের নিকটে সর্বদা একটু খাটো হইয়া থাকিতেন। এ অবস্থাটা কোন মানুষেরই ভালো লাগে না। এই আত্মগ্লানি অনেক সময় মানুষকে বিরোধিতার পথে লইয়া যায়। লৌকিক ক্ষতির ভয়ে যে-সত্য প্রকাশ্যভাবে জীবনে ও চরিত্রে বরণ করিয়া লইতে পারে না, ক্রমে আপনার অলক্ষিতে সে-সত্যের সে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমার কলিকাতা আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রতিক্রিয়ার সূচনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মেরাও যে এজন্য দায়ী ছিলেন না এরূপ বলা যায় না। ব্রাহ্মদের মধ্যেও ক্রমে একটা ধর্ম্মাভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল। অভিমান অভিমানকে জাগায়। ব্রাহ্মদিগের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে শিক্ষিত লোকের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। ইহাও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে দ্রোহী-ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার একটা কারণ। ইহা ছাড়াও আমার কলিকাতা আসার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের অনুচরদিগের মধ্যে আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কলহে ইঁহারা পরস্পরকে লোকচক্ষে হীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষে এই বিবাদটা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায়। ইহাও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব নষ্ট হইবার একটা প্রধান কারণ। কেশবচন্দ্র তখনও শিক্ষিত বাঙ্গালীর একরূপ অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার অলৌকিক বাগ্‌বিভূতি বাঙ্গালীর চিত্তকে তখনও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার মতন এমন বাগ্মী বাংলাতে আর ছিল না,—হইতে পারে, বাঙালী এ কল্পনাও প্রায় করিতে পারিত না। ঠিক এই সময়েই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভেরী বাজাইয়া সুরেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

(৫)

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণতর স্বাধীনতার আদর্শকে নিজেদের জীবনে সাহস করিয়া বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই, তাঁহারা এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার প্রভাব এইজন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজর প্রভাবকে একেবারে ছাড়াইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিত হন নাই, ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন। নামে ব্রাহ্ম না হইলেও সুরেন্দ্রনাথের প্রথম কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণা প্রচুর ছিল। ধর্ম্মোপদেষ্টা না হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ আপনার রাষ্ট্রীয় আদর্শ-প্রচারে ধর্ম্মের উপরেই যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিত্তি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত—ইতিহাসের এই সত্যটা উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন।

কলিকাতা ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল পঞ্চনদের শিখ প্রভুশক্তির অভ্যুদয়। আমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে শিখদের কথা আমরা অতি যৎসামান্যই পড়িয়াছিলাম। শিখেরা প্রথমে মোগলের বিরুদ্ধে ও পরে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। মোটামুটি আমরা এই কথাটাই জানিতাম। ইহারা যে ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে একটা গণতন্ত্র জনরাষ্ট্র বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এ সকল কথা তখনও আমাদের ভালো করিয়া জ্ঞানগোচর হয় নাই। শিখ সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকৃতি বা গঠনের কথা আমরা একরূপ কিছুই জানিতাম না। শিখেরা নিজেদের গুরুর পতাকাতলে দাঁড়াইয়া একটা স্বাধীন ধর্ম্মরাজ্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল,

ইহাই শিখ খালসার ঐতিহাসিক মূলকথা। ইংরাজেরা এদেশের যে ইতিহাস রচনা করিয়া আমাদিগকে পড়াইতেন শিখ অভ্যুদয়ের এই বড় কথাটা তাঁহাদের লেখার ভিতরে ফুটিয়া উঠে নাই। এ কথা আমাদের স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসের সম্বন্ধেই সত্য, নতুবা সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নিকটে শিখ-ইতিহাসের যে চরিত্র ফুটাইয়া তুলেন তাহার মালমশলা তিনি নিজে সংগ্রহ করেন নাই। ইংরাজই তাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, পরে জানিয়াছি। Malcolmএর শিখ ইতিহাসের উপরেই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই বক্তৃতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও আমরা Malcolmএর সঙ্গে পরিচিত হই নাই। শিখদের ক্ষাত্রবীর্য্য ও রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে ও গুরুভক্তিতে। এই বিশ্বাস ও ভক্তির জোরেই তাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত মোগল প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সেই শক্তিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন; পরে ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ বাধিলে ইংরাজের নিকটেও তাহারা বহুদিন পরাভব স্বীকার করেন নাই। শিখ যুদ্ধের বিবরণে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা শিখদের কথা যতটা পারেন ছোট করিয়া লিখিয়াছেন। গুজরাট, চিলিনওয়ালা প্রভৃতি লড়াইয়ে, ইংরেজেরা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ফলতঃ শিখের ক্ষাত্রবীর্য্য, রণকুশলতা, সমাজ ও রাষ্ট্রশৃঙ্খলার নিকটে ইংরেজকেও পরাভব মানিতে হইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতা ছাত্রসভাতে এই প্রথম বক্তৃতা হইতেই জানিতে পারি। এই প্রথম বক্তৃতার দ্বারাই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের যুগের বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাহাদের নায়কত্ব লাভ করিলেন।*

* (সুরেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী বক্তৃতার বিষয় ছিল 'চৈতন্ত'—সামাজিক চিন্তায় ও জীবনে শ্রীচৈতন্তের আদর্শ ও আচরণ যে বিপ্লব এনেছিল—তার কাহিনী।)

(৬)

নবযুগের সাম্যবাদ

নবযুগের বাংলার প্রথম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব-প্রথমে একটা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেন। বিরোধ হইতে স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ হয়। বন্ধন-বেদনা হইতেই স্বাধীনতার প্রেরণা আসে। বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই স্বাধীনতার সাধনা সেখানে সত্য হয় না। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে এদেশে লোকে যন্ত্রারূঢ়ের মত জীবনযাপন করিত। তাহাদের অন্তরে এবং বাহিরে তখনও কোন সাংঘাতিক বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। এই বিরোধের সৃষ্টি হইল প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে। নবযুগের বাঙ্গালী যুবকেরা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া একটা নূতন সামাজিক আদর্শের সন্ধান পাইলেন। এই আদর্শের প্রেরণায় য়ুরোপের সমাজে একটা গভীর চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। তাহাই ইংরাজী-সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস অবলম্বনে আমাদের নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আত্মহারা করিয়া তুলিল। সকল মানুষ সমান। জাতি, কুল, ধন বা পদ-গৌরবে মানুষের এই সার্ব্বজনীন সাম্যকে নষ্ট করিতে পারে না। জন্মগত, ধনগত বা পদগত অধিকার আকস্মিক, মানুষের সাম্য নিত্য। এই সাম্যের উপরেই মানুষের স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত। ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ।

(৭)

সকল মানুষ সমান বলিয়া সকলেরই আপনার বিচারবুদ্ধি দিয়া সত্য কি আর মিথ্যা কি ইহা ঠিক করিবার সমান অধিকার আছে।

সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিই একমাত্র কষ্টিপাথর। পূর্ব্বে মানুষের বিচারবুদ্ধি শাস্ত্রের শাসনে বাঁধা পড়িয়াছিল। এই নূতন সাম্যবাদ সকলের আগে এই শাস্ত্র-বন্ধন ছিন্ন করিল। যেমন সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রত্যেকের বিচার-বুদ্ধিই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার দাবী করিতে লাগিল, সেইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসায় প্রত্যেক মানুষের ভিতরকার ধর্ম্মবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বিচারকের আসন গ্রহণ করিল। আমার যুক্তি যাহা সত্য বলিয়া মানিতে পারে না, আমার ধর্ম্মবুদ্ধি যাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দ্বারা আমি আমার চিন্তা বা আচরণকে নিয়মিত করিতে পারি না। ধর্ম্মপুস্তকের অনুশাসনে তাহা মানিব না, সমাজের শাসনেও তাহা করিব না। ইহাই য়ুরোপের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদ ও স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত। ইংরাজী পড়িয়া বাংলার নবযুগের শিক্ষিত যুবকেরা এই সিদ্ধান্তকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাচীন সমাজে একটা বিপ্লব আনিলেন। সেকালে তাঁহাদের জীবনে ও সমাজে শাস্ত্র ও লৌকিকাচারের শাসনই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছিল। শাস্ত্রের ও লৌকিকাচারের শাসনই তাঁহাদের অন্তরে তীব্র বন্ধন-বেদনা জাগাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র ও সমাজের বন্ধন ভাঙ্গিবার জন্য সকলের আগে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন।

(৮)

ব্রাহ্মসমাজ এই বিদ্রোহকে অবলম্বন করিয়াই—একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষা আমাদের প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এই নবীন আদর্শে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ একটা পূর্ণতর সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানে যাইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ

সংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইলেন। সকল মানুষ সমান,—কেন? ব্রাহ্মসমাজ এই প্রশ্ন তুলিলেন। সকল মানুষ তো বাস্তবিক সমান নহে। কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ—এ সকল বৈষম্য জন্মগত। তবে মানুষের সাম্য কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন, মানুষের সাম্য তাহার নিজের বিশিষ্ট শক্তি-সাধ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সকল মানুষ সমান, কেন না সকল মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর সকল মানুষের পিতা, মানুষ পরস্পরের ভ্রাতা। ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন পিতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মানুষের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব—ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল শিক্ষা হইল। এই সত্য বা সিদ্ধান্তের উপরেই ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন স্বাধীনতার আদর্শে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর যখন সকলের পিতা, নরনারী সকলে যখন তাঁহারই সন্তান, তখন নরনারীর সমান অধিকার। পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী সমান, পুরুষ বলিয়া স্ত্রীর উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। পুরুষ যেমন আপনার বিচারবুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে শিক্ষা দ্বারা, স্ত্রীলোক তেমন সেই শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ অধিকারী। পুরুষ যেমন আপনার মনোমত স্ত্রী গ্রহণ করিয়া দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে, স্ত্রীলোকও সেইরূপ আপনার মনোমত পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিয়া তাহার সহধর্ম্মিনী হইবে। পরিবারে পুত্রের যে স্থান ও অধিকার কন্যারও সেই স্থান এবং অধিকার থাকিবে। এইরূপে সমাজে জন্মগত বা জাতিগত কোন অধিকার গ্রাহ্য হইবে না। জাতিভেদ থাকিবে না,—আহারাদি সম্বন্ধে নহে, বিবাহাদি সম্বন্ধেও নহে। ইহাই নবযুগের বাংলার স্বাধীনতার প্রথম সাধনা ছিল।

শাস্ত্র, লৌকিকাচার এবং এ সকলের অনুবর্ত্তী সমাজ-শাসন তখনও অত্যন্ত কঠোর ছিল। এসকল বাধা বন্ধন মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে

পদে পদে পীড়িত করিত। তখন এই বন্ধন-বেদনাই নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীকে সর্বদা ক্লেশ দিত। এইজন্য আমাদের নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথমে সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়। ব্রাহ্মসমাজ তখন এই সাধনার ও এই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম পুরোহিত ও নায়ক ছিলেন।

(৯)

সমাজের শাসন

তখনও ইংরাজ প্রভুশক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে নাই। ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজকেই আমরা আমাদের নূতন সাধনার দীক্ষা-গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ইংরাজ-শাসন আমাদের এই নূতন স্বাধীনতার সহায়ই ছিল, অন্তরায় হয় নাই। ইংরাজ-শাঁসন আমাদিগকে পুরাতন সমাজ-শাসনের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিল, প্রাচীন ধর্ম্মের বন্ধন হইতেও অপরোক্ষভাবে মুক্তি দিয়াছিল। ইংরাজের দণ্ডবিধি মনু ও পরাশরের বিধানকে বাতিল করিয়া দিয়াছিল। একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর হিন্দুদিগকে ব্রাহ্মণের আধিপত্য হইতে অব্যাহতি দিতেছিল, অন্যদিকে সেইরূপ দেশের শাসন-ব্যবস্থা ধনীর অত্যাচার হইতে দরিদ্রকে মুক্তি দিতেছিল। চালে খড় নাই, কোমরে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই—এমন দুঃস্থ ও নিঃসম্বল লোকেও প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে যখন তখন কোম্পানীর থানায় যাইয়া নালিশ রুজু এবং সাক্ষী-সাবুদ থাকিলে তাহাকে ইংরাজের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় লইয়া গিয়া দাঁড় করাইতে পারিত। বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শাসন কোনদিনই খুব কঠোর ছিল না। ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা দিতেন

শাস্ত্র অনুযায়ী, কিন্তু সমাজ শাসিত হইত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য—তথাকথিত এইসকল ভদ্রলোকের দ্বারা। ইংরাজ-শাসন ইহাদের সমাজ-শাসনও আলগা করিয়া দিতেছিল। এই সকল কারণে সেকালে ইংরাজ প্রভুশক্তির যে আবার একটা বন্ধন আছে, ইহা আমরা বড় বেশী অনুভব করিতাম না। শাস্ত্র ও সমাজের বন্ধনই আমাদের নূতন স্বাধীনতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা দিতেছিল।

এইজন্য আমাদের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়াছিল সমাজ ও ধর্ম্মের সঙ্গে, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নহে। ব্রাহ্মসমাজ এই সংগ্রামের নায়ক ছিল। ব্রাহ্মসমাজ নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ সত্যের নামে অসত্যের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের নামে সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল। এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে অশেষ প্রকারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। ব্রাহ্মদের নিজেদের একটা সমাজ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার হাতে খাওয়া-দাওয়া করিতেন না। বিবাহাদি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মেরা সামিল হইতে পারিতেন না,—মরিলে তাহাদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য লোক পাওয়া যাইত না। তাহারা অনেক সময় আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিজেদের দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন। সেকালে জাতিভেদ অগ্রাহ্য করা অত সোজা ছিল না। নিজেদের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে গেলে নানাদিক দিয়া অশেষ প্রকারের স্বার্থত্যাগ করিতে হইত। সকলে এই ত্যাগ করিতে পারিত না। যে সকল ইংরাজী-নবীস ইহা পারিতেন না, তাঁহারা নিজেদের অন্তরে সর্ব্বদাই আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। আর পূর্ব্বে যেমন কহিয়াছি, যে আদর্শকে সত্য জানিয়াও মানুষ

অনুসরণ করিতে করিতে পারে না, ক্রমে তাহার দোষ খুঁজিতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সেই সত্যের ও আদর্শের বিরোধী হইয়া উঠে।

(১০)

ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে বিরোধ

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম, সেই সময়েই ব্রাহ্মদিগের নিজেদের মধ্যেও একটা বিবাদ বাধে। এর উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। ঘটনাটা এই—কেশবচন্দ্র ১৭৭১ ইংরাজীতে বিলাত যান। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'ভারত আশ্রম' নামে একটা আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। কতকগুলি ব্রাহ্ম-পরিবার এই আশ্রমে একসঙ্গে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে একটা 'প্রেম-পরিবার' গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সাধন-গোষ্ঠী বা সাধকমণ্ডলী গঠন করাই ভারত আশ্রমের মূল লক্ষ্য ছিল। কতক ব্রাহ্ম-পরিবার এই আশ্রমে একসঙ্গে একান্নভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের নূতন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদের আদর্শ খুবই উচ্চ ও উদার ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল বিষয়ে যে সকলের সমান অধিকার থাকে না, একথাটা কেশবচন্দ্র তলাইয়া দেখেন নাই। তাঁহার অনুচরেরাও তখন পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারেন নাই। পুরুষেরা নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেও তাঁহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত বুঝেন নাই, ব্রাহ্মদের নূতন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আদর্শ কি এবং কেন এই আদর্শ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-

সমাজের বিধিব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা পুরাতন সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবারে যে মনোভাব লইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই মনোভাব লইয়াই একমাত্র স্বামী-সহবাস-লোভে এই 'ভারত-আশ্রমে' আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম পুরুষেরাও যতদিন একাকী এই নূতন ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন, ততদিন যে ভাবে ও যে পরিমাণে আত্মপর বিচার বিরহিত হইয়া সম-সাধকদিগের সঙ্গে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আপনাদিগকে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন, সস্ত্রীক ও সপরিবারে ধর্ম্মসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেভাবে আপনাকে ভুলিয়া থাকা আর সহজ ও সম্ভব হইল না। ইহার ফলে 'ভারত আশ্রমের' ব্রাহ্মদের মধ্যে ক্রমে প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর না হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষের বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে সমাজে কেশবচন্দ্র তাঁহার আসন্ন প্রচারকদিগের সাহায্যে একটা একতন্ত্র শাসন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের অভিমানে আঘাত করিতেছিল। ইঁহারা প্রাচীন সমাজের পৌরহিত্য ও ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। এখানে আবার কিয়ৎপরিমাণে একটা নূতন ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব ও পৌরহিত্যের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্ম-মণ্ডলী মধ্যেও একটা অশান্তি জাগিয়া উঠে। এই বিরোধ ও অশান্তি ক্রমে এতটা বাড়িয়া উঠিল যে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত ইহার কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। 'ভারত-আশ্রমের' বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটনা হইল। ক্রমে আদালতে পর্য্যন্ত ইহা গড়াইয়া গেল। কেশবচন্দ্রও তাঁহার বিরোধীদের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করিলেন। শেষে এই মামলা আপোষে মিটিল বটে কিন্তু ইহাতে সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিতদের চক্ষে ব্রাহ্মসমাজ যে খাটো হইয়া গেল, তাহা শুধরাইল না।

(১১)

ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা

ব্রাহ্মসমাজ খাটো হইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকের মনে নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা ক্ষীণ হইল না। ইহা ক্রমে নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রবাহের ভগীরথ হইলেন সুরেন্দ্রনাথ। কলিকাতা ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই 'ভারত সভা' বা Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা হইল। ব্রাহ্ম-সমাজ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং পারিবারিক ও সামাজিক সাম্যের অনুশীলন করিতেছিলেন, 'ভারত সভা' রাষ্ট্রীয় জীবনে ও রাজা-প্রজার সম্বন্ধে সেই সাম্য ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রতী হইলেন। 'ভারত-সভার' প্রথম সম্পাদক হইলেন, আনন্দমোহন। প্রথম কর্ম্মী-সমিতির সভ্য হইলেন দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী; 'ভারত-সংস্কারক' পত্রের সম্পাদকেরা— উমেশচন্দ্র দত্ত এবং কালীনাথ দত্ত। আর এই নূতন প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান কর্ণধার হন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ ভারত-ব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগাইবার জন্য উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়াছিলেন। এই প্রচার-যাত্রায় তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এইরূপে লেখায় পড়ায় না হইলেও কার্য্যতঃ ব্রাহ্মসমাজের উদারতর ও পূর্ণতর স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে নূতন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের একটা নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

আমার ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ

শ্রীহট্ট হইতে যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম তখনও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই। তখনো হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল একথা বলিতে পারি না; বিশ্বাস ছিল না, এমন কথাও বলিতে পারি না। ফলতঃ তখনো কোন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। দেব-দেবীর উপাসনা সত্য কি মিথ্যা এ প্রশ্ন মনে জাগে নাই। বাল্যে যখন কালীদুর্গা প্রভৃতির নিকট বিপদ আপদে আশ্রয় ভিক্ষা করিতাম, তখনো তাঁরা সত্য কি মিথ্যা একথা ভাবিতাম না। এইমাত্র বুঝিতাম যে তাঁহারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নহেন; আর তাঁহাদের এমন কোন শক্তি আছে যাহা দ্বারা মানুষের অগোচরে থাকিয়া তাঁহারা মানুষের সুখদুঃখকে নিয়মিত করিতে পারেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে মানুষের বিপদ-আপদ কাটিয়া যাইতে পারে, অপ্রসন্ন হইলে মানুষকে বিপন্ন করিতে পারেন। ঈশ্বরতত্ত্ব কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বর এক বা বহু—এসকল প্রশ্ন তখনও মনে জাগে নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তখনো কোন বীতরাগ জন্মে নাই। হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে কোন বিরোধ বাধে নাই। বাধিয়াছিল হিন্দু আচার-বিচারের সঙ্গে, বিশেষতঃ খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের সঙ্গে। আর বাধিয়াছিল হিন্দুর জাতি-বিচারের সঙ্গে। বাল্যে মুসলমানের তৈয়ারী লেমনেড্ খাইয়া বাবার হাতে মার খাইয়াছিলাম। খাদ্য বা পানীয় মুসলমানে ছুঁইলে অশুদ্ধ হইয়া যায়, ইহা কখনো বুঝি নাই। অতি শৈশবেও এই ছুঁৎমার্গ মানিয়া চলি নাই, সমাজ যখন জোর করিয়া ইহা মানাইতে চাহিল, তখনই সমাজের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে লড়াই বাধিল। আমার

বাবাও যে এই ছুঁৎমার্গ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি দিয়া সমর্থন করিতেন কোনদিন এরূপ বুঝি নাই। ফার্সী পড়িয়া, মোস্লেম-সাহিত্য ও ইস্‌লাম-সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া এই ছুঁৎমার্গকে অন্তরে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তবে বাহিরের আচার-ব্যবহারে ইঁহারা এসকল মানিয়া চলিতেন। তিনি যে যুগের লোক ছিলেন, সে যুগে আমাদের হিন্দু সমাজে লৌকিকাচার কেবল ধর্ম্মের স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা নহে, ধর্ম্মের উপরে চড়িয়াছিল। সেকালের হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মুখেও শুনিতাম—

'যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ
তদাপি লৌকিকাচারঃ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।'

বাবা মনে মনে ছুঁৎমার্গ না মানিয়াও এই লৌকিক-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্ব হইতেই অন্তরেও এই ছুঁৎমার্গ মানিতাম না, বাহিরেও সুবিধামত ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ্যভাবে জাতিবিচার বর্জ্জন করিলাম।

(২)

আমার একজন আত্মীয়—আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর দেবর—আমার পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যেমন বিবাহিত ব্রাহ্মদের জন্য 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম ছাত্রদের জন্য একটা ছাত্রাবাসও খুলিয়াছিলেন। বোধহয় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাটীতে এই ছাত্রাবাস ছিল। ইহার নাম ছিল 'নিকেতন' বা 'ব্রাহ্ম-নিকেতন'। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ৺অমৃতলাল বসু মহাশয় 'নিকেতনের'

পরিচালক ছিলেন। অন্যান্য প্রচারকেরা এখানে আসিয়া ছাত্রদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনাদি করিতেন। স্বয়ং কেশবচন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া এখানে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আমার আত্মীয় এই 'নিকেতনে' বাস করিতেন। আমি কলিকাতায় আসিলে তিনি আমাকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার প্রকৃতির মধ্যে চিরদিন এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে আমাকে কোন বিষয়ে ভজান কখনই সহজ ছিল না। যৌবনে পড়িয়াছিলাম, সেক্সপীয়রের Falstaffএর নীতি ছিল—nothing on compulsion। আমার প্রকৃতিরও এই ধর্ম্ম ছিল। সুতরাং এই আত্মীয় আমাকে ব্রাহ্ম হইবার জন্য যত ভজাইতে আরম্ভ করিলেন, ততই আমি ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কেশবচন্দ্রের মত ও সাধন ইতিমধ্যেই আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজে একটা বিরোধী ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কোন কোন মতবাদ এবং শিক্ষা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছিল। এরূপ একটা প্রহসনের প্রণেতা ছিলেন, কোন হিন্দু নহেন, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্যের আত্মজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি 'যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে একখানা প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ঠিক মনে নাই, কিন্তু বোধহয় বাংলার নূতন রঙ্গমঞ্চে এই প্রহসনখানির অভিনয়ও হইয়াছিল। এই প্রহসনে কেশবচন্দ্রের কোন কোন মতবাদের উপরে প্রকাশ্য আক্রমণ করা হইয়াছিল। এ সকলের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। কেশবচন্দ্র প্রার্থনা ও অনুতাপের উপরে তখন খুব ঝোঁক দিতেছিলেন। প্রার্থনা করিলে মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে, এবং অনুতাপের দ্বারা কৃত পাপের দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করে, এ সময়ে কেশবচন্দ্র এসকল কথা খুবই বলিতেন। তাঁহার নূতন ব্রাহ্ম অনুচরেরা এই

শিক্ষার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেক সময় কেবল মৌখিক প্রার্থনা ও অনুতাপকেই মুক্তির পথ বলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতে প্রার্থনার আন্তরিকতা এবং অনুতাপের গাম্ভীর্য্য ও সত্য উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। জ্যোতিবাবু এই মৌখিক প্রার্থনা ও অনুতাপের উপরেই বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমিও এইসকল ব্রাহ্ম মতের বিরুদ্ধে এইসকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার ব্রাহ্ম আত্মীয় আমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিবার জন্য ভজাইতে যাইয়া আমার এই বিরোধী-ভাবকে প্রবল করিয়া তুলেন।

(৩)

প্রথম যৌবনের সখ্য ও সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষা

আমি যেদিন শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতা রওয়ানা হই, সেদিন হইতেই শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। প্রথম যৌবনের এই সখ্য অপূর্ব্ব বস্তু। এই সখ্য মামুলি বন্ধুত্ব নহে। ইহা বৈষ্ণবেরা যাহাকে রস বলেন সেই রস-পর্য্যায়ভুক্ত। এই সখ্যে বাস্তবিকই

ঘর করে বাহির, বাহির করে ঘর
পর করে আপন, আপন করে পর।

বলবতী আসঙ্গলিপ্সা এই রসের একটা প্রধান অঙ্গ। কলিকাতায় শ্রীহট্টের ছাত্রাবাসে সুন্দরীমোহনের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। দুজনে একঘরে থাকিতাম; দুজনার টাকাকড়ি এক তহবিলে রাখিতাম এবং যথাসম্ভব একই সঙ্গে এই তহবিল হইতে নিজেদের প্রয়োজনমত খরচ করিতাম। সুন্দরীমোহন আমার এক বৎসর আগে আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নীচের শ্রেণীতে

পড়িতাম। কলেজের সময় ছাড়া, আমাদের পরস্পরের মধ্যে আহারে বিহারে, আমোদে-প্রমোদে তিলার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ হইত না। আমাদের ছাত্রাবাসের সহবাসীরা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানা ছড়া বাঁধিয়াছিলেন। সুন্দরীমোহন শ্রীহট্টে থাকিতেই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাতে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে সুন্দরীমোহন যখন ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন, আমি তখন তাঁহার সঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশ পাইতাম। কিছুদিন পরে কেবল তাঁহার সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যাকাল কাটাইবার জন্য আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া উপাসনা করিতাম না, কেবল নির্ব্বিবাদে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতাম বা ঘুমাইতাম। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে একদিকে 'বঙ্গদর্শন'. 'আর্য্যদর্শন', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি সেকালের বাংলা মাসিকপত্র, অন্যদিকে নূতন বাংলা রঙ্গালয় ও নাট্যকলা আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে আমার মন ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের চারিদিকে খোলা ময়দান ছিল, রেলিং গড়িয়া উঠে নাই। রাস্তার অপর পারে কতকগুলি কেতাবের দোকান ছিল। এগুলির মধ্যে সব চাইতে বড় দোকানের নাম ছিল 'ক্যানিং লাইব্রেরী'। সে বাড়ীটা এখন আর নাই। এখনকার হ্যারিসন রোডে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। এই 'ক্যানিং লাইব্রেরী'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগেশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ছিলেন। যোগেশবাবু অতি মিষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কেবল পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন না, কিন্তু একজন অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমযুগের

সাহিত্যরথীদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ আত্মীয়তা ছিল। সেকালের নূতন বাংলা সাহিত্যের অধিনায়কদের প্রায় সকলেই যোগেশবাবুকে জানিতেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রীতি করিতেন। যোগেশবাবুর সঙ্গে ঘটনাক্রমে আমার পরিচয় হয়। শ্রীহট্টের বাংলা স্কুলে পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার পুস্তক কিনিয়া পাঠাইবার ভার আমার উপরে পড়ে। সেই সূত্রে যোগেশ-বাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এই আলাপের জোরে এবং যোগেশবাবুর সদাশয়তায় আমি কলেজ পালাইয়া প্রায় সারাদিন তাঁহার পুস্তকালয়ে যাইয়া আপনার রুচি অনুযায়ী বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করি। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নূতন রঙ্গালয়েও খুবই যাতায়াত করি। 'নীলদর্পণ', 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' এই তিনখানা নাটকই আমাদের নূতন স্বাদেশিকতায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এ-কথা বলিয়াছি। তখন ইংরাজের সঙ্গে আমাদের একটা রেষারেষি আরম্ভ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' এই স্বদেশাভিমানের প্রথম প্রেরণা আনিয়া দেয়।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এই কবিতা আমাদের প্রাণে প্রথমে দেশমাতৃকার উদ্বোধন করে। হেমচন্দ্রই প্রথমে বাঙ্গালীর পরাধীনতার যাতনাকে মুখরিত করিয়া তুলেন।

ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই,
শ্বেতাঙ্গ দেখিলে আতঙ্কে পালাই,
* * * *
গোলামের জাত শিখেছে গোলামি।

এইরূপে হেমচন্দ্র তীব্র কশাঘাত করিয়া ঘুমন্ত বাঙ্গালীকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার অন্তরে এই সময়ে বাংলা-সাহিত্য-সেবার বলবতী বাসনা জাগ্রত হয়। একদিন সুন্দরীমোহনের সঙ্গে কথা হইতেছিল, কি করিয়া বাংলা লেখা ও বলা অভ্যাস করা যায়। সুন্দরীমোহন কহিয়াছিলেন যে, আধুনিক বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা কেশবচন্দ্র, তাঁহার বক্তৃতাদিতে মনোনিবেশ করিলে বাংলায় বাগ্মিতা সাধন সহজ হইতে পারে। এই দিন হইতে আমি ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া আর ঘুমাইতাম না। গভীর মনোযোগ সহকারে কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। এইরূপে অলক্ষিতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমাকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে।

(৪)

এখন হইতে যদিও আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইয়া আর ঘুমাইতাম না, মন দিয়া কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও উপদেশাদি শুনিতে লাগিলাম, তথাপি ইহার ফলেই যে আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, এমন কথা বলিতে পারি না। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য নহে, কিন্তু বাংলাভাষা শিখিবার লোভেই আমি প্রথমে কেশবচন্দ্রের উপদেশাদি শুনিতে আরম্ভ করি। তাঁহার উপদেশে এবং বক্তৃতায় আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এমন মনে পড়ে না। ফলতঃ তখনও আমার কোন গভীর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যেখানে জিজ্ঞাসা জাগে না, সেখানে কোন নূতন সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি তখনও ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধানে যাই নাই। তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ব্রাহ্ম মতবাদ গ্রহণ করি নাই। ব্রাহ্মসমাজে এমন

লোক ছিলেন, এখনও এমন লোক আছেন, যাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রচলিত দেবোপাসনা বা প্রতিমা পূজাকে পাপ বলিয়া মনে করিতেন ও করেন। আমি কখনও এরূপ ভাবিতে পারি নাই। আমার পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা, আমি যে কুলে জন্মিয়াছি সে কুলের পিতৃলোকেরা পুরুষপরম্পরায় এই পাপাচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করিতেও আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, এখনও উঠে। এইজন্য হিন্দুসমাজের প্রচলিত পূজাপার্ব্বণাদি পাপকর্ম্ম, এই জ্ঞান আমার কখনও জন্মে নাই। আর এক দিক দিয়া তখনকার নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা কেহ কেহ প্রথম যৌবনে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুরাপান এবং তাহার সঙ্গে অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগে তাঁহারা আপনাদের একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদের বিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া তাঁহারা ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গভীর পাপ-বোধ তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের প্রথম প্রেরণা ছিল। আমার প্রকৃতির মধ্যে কোনদিন এইরূপ পাপবোধ ছিল না। পাপের যাতনা কাহাকে বলে আমি কখনো জানি নাই। সেকালে ইংরাজী conscience শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হইয়াছিল বিবেক। আমার ভিতরে এই conscience কখনো খুব সচেতন ছিল না। সুতরাং অনুতাপ কাহাকে বলে আমি জানি নাই। প্রথম যুগের অনেক ব্রাহ্ম এই পথে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছিলেন; আমি সে পথ ধরিয়া আসি নাই।

(৫)

গীতা কহিয়াছেন যে চারি প্রকারের লোকে ভগবানের ভজনা করে।

চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাম্ জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তঃ, জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভঃ।

চারি প্রকারের সুকৃতিসম্পন্ন লোকে আমার ভজনা করে। কেহ বা আর্ত্ত হইয়া অর্থাৎ কোন বিপদে পড়িয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমার ভজনা করে; কেহ বা কোন তত্ত্বের সন্ধানে যাইয়া তাহার মীমাংসার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়: কেহ বা কোন ইষ্টসিদ্ধির জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করে; আর কেহ বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত সত্য ও সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সহজ ভজনা করে। প্রথম বয়সে গীতা পড়ি নাই। ভগবদ্-উপাসনার প্রেরণা কোথা হইতে আসে তাহা জানি নাই। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, ভগবদ্ভজনার এই চতুর্ব্বিধ প্রেরণা ব্যতীত অন্য কোন প্রেরণা নাই, হইতেও পারে না। আমি সর্বব্যাপী ও সর্বগত পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে আসি নাই এবং ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করি নাই। অর্থার্থী হইয়াও আমার লুব্ধচিত্ত ভগবানের দিকে ছুটিয়া যায় নাই। কোন গভীরতত্ত্ব জিজ্ঞাসার তাড়নায়ও আমি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করি নাই। করিয়াছিলাম, প্রাণের বেদনায় আর্ত্ত হইয়া।

সুকুমার শৈশবে মা-বাবার বিশেষতঃ মায়ের রোগ হইলে ঘরের কোণে যাইয়া যেমন আর্ত্ত হইয়া কালী-দুর্গা প্রভৃতি দেবতার নিকটে তাঁহাদের আরোগ্য ভিক্ষা করিতাম, ঠিক সেইরূপেই আর্ত্ত হইয়া সর্ব-প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। ১৮৭৬ ইংরাজীর এপ্রিল কি মে মাসে সুন্দরীমোহন দেশে যান। তখন তিনি এফ. এ. পাশ করিয়া কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। কলেজের ছুটী উপলক্ষে দেশে যান। পূর্বেই কহিয়াছি, সেকালে আমাদিগকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইয়া জাহাজে শ্রীহট্ট যাইতে হইত। জাহাজের অপেক্ষায় কখনও কখনও ঢাকায় বা নারায়ণগঞ্জে আট দশদিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইত। সুন্দরীমোহনকে এবারে ঢাকায় কিছুদিন

থাকিতে হয়। সে সময়ে ঢাকায় খুব কলেরার উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলাম। এই অসহায় অবস্থায় প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা ভগবানের চরণে কাতরপ্রাণে সুন্দরীমোহনের জন্য প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাই আমার জীবনে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা। আর্ত্ত হইয়া যেমন শৈশবে ও বাল্যে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করিতাম, কিন্তু এ সকল দেবতা কে এ প্রশ্ন করি নাই, কেবল এইমাত্র অন্তরে ধারণা ছিল যে, তাঁহারা কোন অদৃশ্য বস্তু কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা কেউ-কেটা হইবেন, যাঁহারা প্রসন্ন হইলে মানুষের আপদ-বালাই কাটিয়া যায়—সেইরূপই আর্ত্ত হইয়াই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু ব্রহ্ম যে কি বস্তু সে জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। সে জিজ্ঞাসা জাগে বহু পরে। প্রথম যৌবনের সখ্যের টানে পড়িয়া যেমন ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহার টানে নহে; সেইরূপ সেই সখ্যের দায়ে পড়িয়াই ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করি, লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহার টানে নহে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

এই আর্ত্তের পথে কেবল নিজের সুখ-দুঃখের প্রয়োজনের প্রেরণাতে ব্রাহ্মসমাজে কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারিতাম, জানি না। কিন্তু এই বৎসরের শেষভাগে এক আকস্মিক ঘটনাচক্রে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হই, এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি ছোট সাধকদলে ভুক্ত হই। এইদলে ঢুকিয়া আমার জীবনের গতি একেবারে ফিরিয়া যায়, এবং আমি পরিবার-পরিজনের এবং প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি।

(২)

১৮৭৬ ইংরাজীর শেষভাগে তখনকার বৃটিশ সিংহাসনের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যুবরাজ এড্ওয়ার্ড ভারতবর্ষে আসেন। কলিকাতায় আসিলে শ্রীহট্টের পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকটে একখানা সংস্কৃত অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

কহিয়াছি, আমি ১৮৭৪ ইংরাজীর প্রথমে কলিকাতায় আসি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টের একজন সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম ছিল প্যারীমোহন দাস। ইনি তখন কলিকাতায় কোন সরকারী আপিসে কর্ম্ম করিতেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে তাঁহার বাসা ছিল। একদিন বেলা অবসানে আপিস হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভিতর দিয়া বাসায় যাইতেছিলেন। সেই সময়ে স্কোয়ারের মাঝখানে একজন ফিরিঙ্গী যুবক দাঁড়াইয়া সকলের সমক্ষে মূত্রত্যাগ করিতেছিল।

প্যারীবাবু তাহার এই নির্লজ্জ আচরণে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া নিজের বাসার অভিমুখে যাইতেছিলেন। এই ফিরিঙ্গী তখন তাহাকে গালি দেয়। ক্রমে দু'জনে বচসা আরম্ভ হয়। বকাবকি হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। প্যারীবাবু তখন আপনার পকেটের ক্ষুদ্র ছুরি তুলিয়া তাহাকে আঘাত করেন। সে আঘাতে সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মরিয়া যায়। এই হত্যাপরাধে প্যারীবাবুর বিচার হইয়া বোধহয় তিন মাসের জন্য জেল হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালীর এই মামলায় কলিকাতা সমাজে তখন একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গী ছাত্রদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছাত্রদের একটা ছোটখাটো লড়াই হইয়া গিয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে এই মারামারি আরম্ভ হয়। ক্রমে সেখান হইতে কলেজের গোলদীঘিতে মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া জুটিয়া পড়ে। অন্যদিকে ফিরিঙ্গী ছাত্রদের সঙ্গে নিকটবর্তী ফিরিঙ্গী পাড়ার লোকেরা আসিয়া যোগ দেয়। এই মারামারিটা কিয়ৎ-পরিমাণে সংক্রামক আকার ধারণ করে। পাঁচসাতদিন পর্য্যন্ত শহরের কলেজ অঞ্চলে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, বাঙ্গালী পাড়ায় ফিরিঙ্গী দেখিলেই লোকে মারিতে যাইত আর ফিরিঙ্গী পাড়ায় বাঙ্গালী ঢুকিলেই ফিরিঙ্গীরা তাহাকে ঠেঙ্গাইবার চেষ্টা করিত। ইহার কিছুদিন পরেই প্যারীবাবুর মামলা হয়। এইজন্য শহরে বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ এই মামলায় সকলে মিলিয়া প্যারীবাবুর পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথমে প্যারীচরণ কারামুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যান এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীহট্টে 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ করেন।

প্যারীচরণই ইহার প্রথম সম্পাদক হন ক্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িলে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত মনোহর ঘোষ নামে একজন বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান লেখককে 'শ্রীহট্ট-প্রকাশের' সম্পাদকের পদে বরণ করেন।

(৩)

বোধহয় শ্রীহট্টের পণ্ডিতেরা যুবরাজকে যে সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, মনোহরবাবু তাহার প্রধান স্বত্রধর হইয়াছিলেন। অভিনন্দনখানি 'শ্রীহট্ট-প্রকাশে' মুদ্রিত হয়। শ্রীহট্টে প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃতের খুব চর্চ্চা ছিল। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। এই অভিনন্দনখানিতে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের পুরাতন জ্ঞান-গৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল,—অন্ততঃ আমরা যারা শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছিলাম, আমাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। এই অভিনন্দন আমাদের গ্রাম্য স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত করিয়াছিল। আমরা এই অভিনন্দনের তীব্র সমালোচনা করিয়া 'শ্রীহট্ট প্রকাশে' এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। মনোহরবাবু আমাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর রচনার সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই, দু'পাতা ব্যাকরণ-কৌমুদী পড়িয়া বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতদের রচনার উপর কলম ধরা ধৃষ্টতা মাত্র। এরূপ-ভাবে 'শ্রীহট্ট-প্রকাশ' আমাদের কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

আমরা তখন কলিকাতার কোন্ সর্বজনমান্য পণ্ডিতের নিকট 'শ্রীহট্ট-প্রকাশে'র বিরুদ্ধে আপীল রুজু করিবার পথ খুঁজিতে লাগিলাম। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় ও নীলমণি মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা অতি উচ্চপদস্থ পণ্ডিত

হইলেও আমরা ইঁহাদের নিকট গেলাম না, গেলাম শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে। একদিকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অন্যদিকে সেইরূপ তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভাও শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে একবাক্যে সমাদৃত হইতেছিল। সুতরাং আমরা শ্রীহট্টের পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া ইহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেই যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

শাস্ত্রী মহাশয় সে সময় হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তখন বেশ বয়স হইয়াছে, শীঘ্রই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লইবেন। নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক (Senior Prosessor of Sansksit) হইবেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া নীলমণি পণ্ডিত মহাশয়ের আসনে বসিবেন। বাংলার সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা ইহা একরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও শিবনাথ তখনই বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথমে 'সোম-প্রকাশে' ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্যঙ্গ রসাত্মক কাব্যসৃষ্টিতে তিনি ইতিমধ্যেই নূতন যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তও খুব সুরসিক কবি ছিলেন, এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতায় গুপ্তমহাশয় সে যুগের বাংলা সাহিত্যে আপনার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কাব্যরস বহুলপরিমাণে গ্রাম্যভাব-প্রধান ছিল। শিবনাথের ব্যঙ্গরস সুমার্জ্জিত এবং শিষ্ট রুচিসঙ্গত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বৈষ্ণব কবিদিগের অনুসরণে—

'কেন না হইনু আমি যমুনার জল রে'

এই কবিতাটি প্রকাশ করিলে, শিবনাথ ইহার এমন একটা বিদ্রূপ

অনুকরণ করিয়া 'সোম-প্রকাশে' প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার কবি-প্রতিভা এবং রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিবনাথ বঙ্কিমের বৃন্দাবন লীলার অনুসরণ না করিয়া বাংলার কুলবধূদের গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত 'রসোদ্গার' রচনা করেন। 'কেন না হইনু আমি মাছের ধুচুনি', 'কেন না হইনু আমি শলিতার কানি'—এইভাবে শিবনাথ বঙ্কিমের বিদ্রূপ অনুকরণ বা শ্লেষ-কাব্য গাঁথিয়াছিলেন।

(৪)

অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও শিবনাথ একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের একতন্ত্র নায়ক। তিনি এবং তাঁহার 'প্রেরিত প্রচারকদল' ব্রাহ্মমণ্ডলীর ভাগ্যবিধাতা। ব্রাহ্মসমাজে ধীরে ধীরে একটা নূতন পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মদের সমাজ শাসন এবং মতবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকবর্গই করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মদের মতের এবং আচার-আচরণের স্বাধীনতা ইঁহাদের শাসনাধীনে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। যাঁহারা সত্যাসত্য নির্ণয়ে নিজেদের বিচারবুদ্ধিকেই অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে যাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে আর কাহারও শাসন মানিতে রাজী ছিলেন না, এবং এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় যাঁহারা নিজেদের পরিবারের ও সমাজের সকল সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের এক দল কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন অনুচরবর্গের এই নূতন বন্ধন সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নূতন মতবাদ ও সাধন-প্রণালীর প্রতিবাদ

আরম্ভ করেন। শিবনাথ এই প্রতিবাদীদলের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারা নিজেদের মত ও আদর্শ প্রচার করিবার জন্য একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। নাম ছিল তার 'সমদর্শী'। শিবনাথ 'সমদর্শী'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া নূতন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিলে, শিবনাথ এবং তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণ প্রায় সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। 'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠা হইলে শিবনাথ ইহার কর্ম্মী-সমিতির সভ্য হন, পূর্ব্বেই একথা কহিয়াছি। এই সকল কারণে শিবনাথ বাংলার নূতন স্বাধীনতা-উপাসকদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম না হইয়াও শিবনাথ-শাস্ত্রীকে অনেক শিক্ষিত যুবক আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণেই আমরা 'শ্রীহট্ট প্রকাশের'র বিরুদ্ধে আমাদের আপীল তাঁহার নিকটই যাইয়া রুজু করিলাম।

(৫)

সেদিনের কথা এখনও মনে আছে। শিবনাথ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পশ্চিমে ভবানীচরণ দত্তের লেনে একটা দোতলা বাড়ীতে ছিলেন। অপরিচিত আমরা, সাহিত্য ও সমাজে প্রতিষ্ঠাবান শিবনাথ আমাদের চক্ষে তখন খুব বড়লোক ছিলেন। নগণ্য ছাত্রদের কথা তিনি রাখিবেন কি না, এই সন্দেহে আমরা অতিশয় সঙ্কোচ সহকারে তাঁহার দ্বারস্থ হইলাম। দরজা বন্ধ, ধীরে আঘাত করিলাম। একটি নয় কি দশ বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অপরিচিত বালিকা আমাদের অভ্যর্থনা করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিল না। বাবা বাড়ী নাই, এখনি আসিবেন; আপনারা আসিয়া বসুন'—এই বলিয়া বাড়ীর ভিতরে যে ঘরে শিবনাথ বসিয়া লেখাপড়া

করিতেন, আমাদিগকে সেই ঘরে লইয়া অতি পরিচিত আত্মীয়ের মতন আদর করিয়া বসাইল। যে যুগের কথা কহিতেছি, সে যুগে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে 'গৌরীদান' অর্থাৎ অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত ছিল। আর অন্যে পরে কা কথা; ব্রাহ্মসমাজেও স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অবস্থায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা কতকগুলি অপরিচিত যুবককে এমন নিঃসঙ্কোচে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, এই বাড়ীতে এমন একটা হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, এই পরিবারে এমন একটা উদার ও স্বাধীন ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাহা আর কোথাও দেখি নাই। গৃহস্বামীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার চরিত্রের প্রভাব আমাদিগের চিত্তকে আসিয়া ছাইল। অনতিবিলম্বে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোক সচরাচর যাহাকে সুপুরুষ বলে, শিবনাথবাবু সেরূপ সুপুরুষ ছিলেন না। সুপুরুষের লক্ষণের মধ্যে ছিল কেবল তাঁহার সুদীর্ঘ দেহযষ্টি। রং ছিল কালো, অতি ভদ্রতার খাতিরে শ্যাম পর্য্যন্ত বলা যায়; নাসিকা টানা আদপেই ছিল না; কোন কবি-কল্পনার জোরেও চোখদুটিকে আয়ত নয়ন বলা যাইত না। উন্নত ললাট বা বঙ্কিম ভ্রূ—সুপুরুষের এই সকল লক্ষণ কিছুই তাঁর ছিল না। ছিল কেবল আজানুলম্বিত বাহু; আর চেহারার ভিতর দিয়া সে সময় বাহির হইত এমন একটা সারল্য এবং প্রীতির রশ্মি যাহাতে শিবনাথ যে কেহ তাঁহার নিকটে যাইত তাহাকেই চিরদিনের জন্য প্রীতিপাশে আবদ্ধ করিতেন।

(৬)

সে সামান্য বিষয় লইয়া আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রথমে দেখা

করিতে যাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। শ্রীহট্ট পণ্ডিতদের অভিনন্দনলিপি সম্বন্ধে তিনি কোন পাঁতি লিখিয়া দিয়াছিলেন কি না মনে নাই; কিন্তু সে কবিতাকে ইংরাজীতে **doggerel** বলিয়াছিলেন, একথা মনে আছে। কিন্তু এই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে আমাদের, বিশেষতঃ সুন্দরীমোহন, তারাকিশোর এবং আমার, একটা গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ ক্রমে গড়িয়া উঠে। সুন্দরীমোহন পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। তারাকিশোর এবং আমি তখনও ঠিক বাঁধা পড়ি নাই। আমাদের ছাত্রাবাসে মাঝে মাঝে কেশবচন্দ্রের প্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। সুন্দরীমোহন এবং আমি, আর বোধ হয় তারাকিশোরও একরূপ নিয়মিত মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ব্রহ্মমন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনাতে যাইতাম। কিন্তু এছাড়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তখনও জন্মে নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইবার পরই তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে আমরা ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করি।

(৭)

কেশবচন্দ্র আমাদের অনেক দূরে ও উপরে ছিলেন। আমরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খোলাখুলি কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর পাই নাই। ব্রাহ্মনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গেই আমাদের যা কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল। বসু মহাশয়ের চরিত্রেও এমন একটা সরলতা এবং ভালবাসার টান ছিল, যাহাতে তাঁহাকেও আমরা শ্রদ্ধাপ্রীতি করিতে শিখি। কিন্তু বসু মহাশয় খুব উদার হইলেও শাস্ত্রীমহাশয়ের মতন সাদাসিধা ছিলেন

না। তিনি প্রচারক ছিলেন, সুতরাং যুবকদের শাসনের বন্ধনে রাখিয়া তাহাদের মঙ্গল করিবার চেষ্টা তাঁহার মধ্যে খুবই ছিল। আর এই বস্তুটিই আমাদের তাঁহার সঙ্গে খোলাখুলি মেশামিশি করিতে দিত না। শাস্ত্রী মহাশয় তখনও প্রচারক হন নাই। প্রচারব্রত গ্রহণ করিবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বয়স, বিদ্যা বা পদগৌরবের সর্ব্বপ্রকার বিচার বিবেচনা বিরহিত হইয়া সকলের সঙ্গে অতি খোলাখুলিভাবে মিশিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় বয়সে, জ্ঞানে এবং পদে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কোনদিন তাঁহার আচার-ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় বিন্দুপরিমাণে কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ধরা পড়ে নাই। সুতরাং সকল দিক দিয়া এই পার্থক্য সত্ত্বেও অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ সখ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

ব্রাহ্ম হইলেও সেকালের ব্রাহ্মদের মধ্যে যে সকল সঙ্কীর্ণতা দেখা যাইত, শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে কখনও তাহা দেখিতে পাই নাই। স্বাধীনতা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধিকে শাস্ত্রের বা লোকাচারের শাসনে কিছুতেই বাঁধা পড়িতে দেন নাই, প্রাচীন শাস্ত্রের শাসনে নহে, আর নূতন ব্রাহ্মসমাজের লোকমতের শাসনেও নহে। কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে যে সকল মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সমদর্শী'তে নিঃসঙ্কোচে তাহার আলোচনা হইত, এবং লেখকেরা আপনাপন স্বাধীন যুক্তির তুলাদণ্ডে এ সকল নূতন ধর্ম্মমতের সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। ঈশ্বর আছেন কি না, পরলোক আছে কি না, ঈশ্বরোপাসনার সার্থকতা কি—ধর্ম্মের এ সকল মূলতত্ত্ব লইয়া 'সমদর্শী'তে তর্কবিতর্ক চলিত। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকবর্গ এ সকল

তর্কবিতর্ক ভালোবাসিতেন না। এরূপ তর্কবিতর্কে যুক্তিবাদ এবং সংশয়বাদের সমর্থন হয়। এই ভাবিয়া তাঁহারা 'সমদর্শী'র উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এতটা স্বাধীনতা তাঁহাদের চক্ষে ভাল লাগিত না। কিন্তু এই স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই শাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে চুম্বক যেমন লৌহকে টানিয়া লয়, সেইরূপ আমাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল।

(৮)

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকদল নূতন মণ্ডলীর চরিত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যাহাদের কোন চরিত্রগত ত্রুটি বা দুর্বলতা লক্ষিত হইত, তাহাদের উপরে অতি কঠোর সামাজিক দণ্ডবিধান করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহারা দুর্ব্বল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের অনেক সময় 'একঘরে' করিয়া তাহাদের চরিত্র শোধন করিতে চাহিতেন। এই সমাজ শাসনের ফলে লোকের ভাল না হইয়া অনেক সময় মন্দ হইত। শাস্ত্রী মহাশয় এসকল সামাজিক দণ্ড বিধানের বিরোধী ছিলেন। শাসনের দ্বারা নহে কিন্তু প্রেমের দ্বারা, নির্য্যাতন করিয়া নহে কিন্তু গভীর সমবেদনার দ্বারা, লোককে দূরে ঠেলিয়া নহে কিন্তু প্রীতির আকর্ষণে কাছে আনিয়া এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখের ভাগী হইয়া, দুর্ব্বল ভ্রাতা এবং ভগিনীদের বল দেওয়া যায়, অসংযত যাহারা তাহাদের সংযত করা যায়, প্রলোভনে পড়িয়া যাহাদের চরিত্র স্খলিত হয়, তাহাদের সচ্চরিত্র করিতে পারা যায়। মানুষকে শোধরাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই, শাস্ত্রী মহাশয় ইহাই বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যও করিতেন। এইজন্য কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকদল শাস্ত্রী মহাশয়কে পছন্দ করিতেন না।

শাস্ত্রী মহাশয়ও 'সোমপ্রকাশে' এবং 'সমদর্শী'তে কেশবচন্দ্রের এবং ব্রাহ্ম প্রচারকদের মতামতের, আচার আচরণের এবং ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শের কঠোর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল কারণে শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তখনকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আপনার প্রতিভা এবং চরিত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ব্রাহ্ম হইয়াও তিনি ব্রাহ্মদের গণ্ডীর কতকটা বাহিরেই পড়িয়া ছিলেন। আমাদেরও তখন ঐ অবস্থাই ছিল। সুতরাং সহজেই আমরা তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গেলাম।

স্বাধীনতার সাধক দল গঠন

কহিয়াছি যে, আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই, অসিয়াছিলাম একটা উন্নত ও উদার স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানে। এই নূতন সাধনার সঙ্গে একটা উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি এবং স্বাজাত্যাভিমানও জড়াইয়া ছিল। যে আদর্শের টানে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেছিলাম, সে আদর্শ কেশবচন্দ্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই, পাইলাম শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়াছিল। বাংলার নূতন রঙ্গমঞ্চে দেশমাতৃকার পূজার উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীতের প্রচার হইয়াছিল—

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।

এ সকল আমাদের সাধনার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে সেকালের উপাসনা ও উপদেশাদিতে এই স্বাধীনতার সুর বাজিয়া উঠে নাই। দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন সহচরেরা তখনও অনুভব করেন নাই। তাঁদের বাধিয়াছিল প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের অসত্য এবং হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বেদনা। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি করা ও ধর্ম্ম সাধনেই তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিদেশী শাসনের বিরাট অন্যায় ও অবিচারের অনুভূতি তাঁহাদের তখনও ভালো করিয়া জাগে নাই। কেশবচন্দ্র রবিবাসরীয় সামাজিক ব্রহ্মোপাসনার সময় সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু স্বদেশের জন্য বিশেষভাবে কোন প্রার্থনা করিতেন না। অন্যদিকে সাহিত্যে, কাব্যে ও সঙ্গীতে

স্বাজাত্যাভিমানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহাও ঈশ্বরভক্তি বা ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। সুতরাং একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের তখনকার আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যদিকে স্বাদেশিকতার আদর্শও ইহসর্বস্বতার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কেবল আমাদের চক্ষে তখন শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সত্য ও সঙ্গত সম্মিলন ও সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এই পূর্ণতর স্বাধীনতার আকর্ষণেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

(২)

এই আদর্শের প্রেরণায়, ইহারই সাধন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় একটি সাধকদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ নব্য ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আমাদের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া ম্যাট্‌সিনি এবং ইয়ং ইটালী (Young Italy) সমাজের সভ্যেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে অষ্ট্রিয়ার শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন— সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা আসে। ম্যাট্‌সিনি প্রথমে ইতালীর প্রাচীন বিপ্লবীবাদী কারবনারাইদের (Carbonari) সঙ্গে জুটিয়া পড়েন। কারবনারাই দল দেশময় বহুসংখ্যক গুপ্ত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে না, ম্যাট্‌সিনি ইহা বুঝিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু কারবনরাইদের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাহারা

কারবনারাইদের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্ত সমিতি (বা secret society) গড়িবার চেষ্টা করেন। এ সকলের পিছনে কোন প্রবল বিপ্লববাদের প্রেরণা ছিল না। তখনও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের নূতন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে চাপিয়া মারিতে উদ্যত হয় নাই। পরে যে সকল কাব্য বা সঙ্গীত রাজদ্রোহিতা-ব্যঞ্জক বলিয়া দণ্ডার্হ হইয়াছিল. তখনও আমরা তাহা প্রকাশ্যভাবে আবৃত্তি বা গান করিতাম। স্কুল পাঠ্যেও—

স্বাধীনতায় হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কেবা সাধে পরে পায় রে—

এ সকল 'সাংঘাতিক' কবিতা পড়িতাম; রাজপুরুষেরা আপত্তি করিতেন না। সুতরাং কারবনারাইদের অনুকরণে যে সকল গুপ্ত-সমিতি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে কোন সত্য রাজদ্রোহিতার চেষ্টা ছিল না।

(৩)

শাস্ত্রী মহাশয়ও এই সময়েই আমাদের কয়েকজনকে লইয়া একটি ছোট কর্ম্মী বা সাধক দল গড়িবার চেষ্টা করেন। তিনি আমাদের জন্য একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা করিয়া দেন। সে দলিলখানি বহুদিন হইল আমাদের ছাত্রাবাস হইতে কি করিয়া কোথায় যে চলিয়া যায়, তাহার সন্ধান পাই নাই। তাহার মূল কথাগুলি এখনও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রতিজ্ঞার বিষয় ছিল :—

(১) আমরা প্রতিমা-পূজা করিব না এবং প্রচলিত প্রতিমা-পূজার সঙ্গে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।

(২) আমরা বাক্যে ও কার্য্যে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

(৩) আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব এবং প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব।

(৪) আমরা নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না, এবং যে বিবাহে পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোন প্রকারে সাহায্য করিব না ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।

(৫) আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।

(৬) আমরা নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চ্চার প্রচার করিব, এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশের মধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব।

(৭) আমরা একমাত্র স্বায়ত্ত্ব শাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি ; তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীর রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিব ; কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য দুর্দ্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম যে, আমাদের কাহারও কোন স্বতন্ত্র তহবিল থাকিবে না। যে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে, এবং এই

সাধারণ তহবিল হইতে আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা হইবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি কাজে কেহই রক্ষা করেন নাই। নানাদিকে সকলে কর্মোপলক্ষে ছড়াইয়া পড়াতে এ চেষ্টা করাও সম্ভব হয় নাই। নতুবা মোটের উপরে যাঁহারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন।

(৪)

১৮৭৭ ইংরাজীর মাঝামাঝি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট সাধক দলে দীক্ষিত হই। তখনও তিনি হেয়ার স্কুলে কাজ করিতেন, এবং স্কুলের দোতালায় একটা ঘরে রাত্রিকালে তাঁর শোবার ব্যবস্থাও ছিল। এইখানেই আমাদের নূতন দীক্ষা হয়। নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় কবি মানুষ, একেবারে বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের প্রতি বীতরাগ হন নাই। সুতরাং আমাদের এই দীক্ষাতে কতকটা প্রাচীন হিন্দু যজ্ঞের অনুকরণ করিয়াছিলেন। একটা গামলাতে আগুন জ্বালিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পরাধীনতা প্রভৃতি আমরা যে আদর্শ সাধনের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম, তাহার পরিপন্থী যা-কিছু নিজের প্রবৃত্তি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেগুলিকে অশ্বত্থ পাতায় লিখিয়া এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলাম। জনে জনে এইরূপ প্রথমে এগুলিকে এই আগুনে পোড়াইয়া সকলে মিলিয়া এই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া একটা গাথা গাহিয়া এই অগ্নির চারিদিকে নতজানু হইয়া আমাদের প্রতিজ্ঞাগুলি পড়িয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম সহি করিয়া-ছিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং

এবং ব্রহ্মকৃপা স্মরণ করিয়া ইহার শান্তিবাচন হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনে শরৎচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস আর আমি, আমরা ছয়জনে এই দীক্ষা গ্রহণ করি। শাস্ত্রী মহাশয় নিজে তখনও সরকারী চাকুরী করিতেন বলিয়া সেদিন দীক্ষা লইতে পারেন নাই। বরানগরে গঙ্গাতীরে সিন্দুরিয়াপট্টির মল্লিকদের একটা বাগান-বাড়ী ছিল। এই বাগানবাড়ীতে ছয়মাস পরে ১৮৭৮ ইংরাজীর জানুয়ারী মাসে শাস্ত্রী মহাশয় নিজে এই দীক্ষা গ্রহণ করেন; তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও স্বর্গীয় উমাপদ রায়, ইঁহারাও এই দীক্ষা লাভ করেন। ইহার পরে আর কেহ এই দলে প্রবেশ করেন নাই। এই নয়জনের মধ্যে আজ কেবল তারাকিশোর, সুন্দরী-মোহন, গগনচন্দ্র এবং আমি, আমরা চারিজন মাত্র বাঁচিয়া আছি।*

* ১৯৩২ সালে বিপিনচন্দ্রের দেহত্যাগের পূর্ব্বেই ব্রজবিদেহী শান্তদাস (পূর্ব্বাশ্রমে তারাকিশোর চৌধুরী) এবং গগনচন্দ্র হোম পরলোকগমন করেন। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের মৃত্যু হয় বিপিনচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে।

পিতা-পুত্রে

এই দীক্ষা লইয়া আমার জীবনে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বে আমি হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সকল সম্বন্ধ কাটিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হই নাই। ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইতাম বটে, আমাদের ছাত্রাবাসেও মাঝে মাঝে ব্রহ্মোপাসনা হইত, তাহাতেও সামিল হইতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের আদেশমত মাতাঠাকুরাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধাদিও* করিতাম। কলিকাতায় আমাদের অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি আসিয়া পৌরোহিত্য করিতেন। কিন্তু ১৮৭৭ ইংরাজীতে এইভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে রাজী হইলাম না। পুরোহিত আসিয়া অনুরোধ করিলে সে অনুরোধ রাখিলাম না। তিনি বাবাকে সে কথা জানাইলেন। বাবার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে একটা বিরোধ হইবে এই ভাবিয়া ১৮৭৭-১৮৭৮ এর শীতের ছুটিতে বাড়ী গেলাম না। বাবা পীড়াপীড়ি করিলেন তবুও তাঁহার এই আদেশ পালন করিলাম না। ১৮৭৮ এর গ্রীষ্মের ছুটিও কলিকাতায় কাটাইলাম। বাবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই আমায় কলিকাতার খরচের টাকা পাঠান বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু খোলাখুলি আমাকে কিছু লেখেন নাই। ইতিমধ্যে আমি হিন্দু-সমাজে থাকিয়া তাঁহার বংশধারা রক্ষা করিব, এ আশা যখন আর তাঁর রহিল না, তখন তিনি

* বিপিনচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণী ১৮৭৫ সালে পরলোকগমন করেন। বিপিনচন্দ্রের ইংরাজীতে লেখা 'Memories of my life & times'-এ আছে :– 'My mother's death practically removed the bands that had tied my heart and my life to my family and home'.

চৌষট্টী বৎসর বয়সে পিণ্ডলোপ পাইবার আশঙ্কায় তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আমার পূর্ব্ব কয়মাসের খরচের টাকা একসঙ্গে পাঠাইয়া আমাকে একখানা সুদীর্ঘ পত্র লেখেন।

(২)

যতদূর মনে পড়ে, সেকালের রীতি অনুসারে ইহার পূর্ব্বে বাবা আমার সঙ্গে পত্রব্যবহারে আমাকে 'পরমকল্যাণবরেষু' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। এবার আমাকে "প্রাণতুল্যেষু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই সম্বোধনের মূল্য ও মর্য্যাদা তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, বুঝিবার বয়সও হয় নাই। পিতা না হইলে পিতৃস্নেহের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয় না। শাস্ত্রে আছে বটে আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ, কালিদাস পড়িতে যাইয়া মল্লিনাথের টীকায় এই শাস্ত্রবাক্যও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বাৎসল্য রসের সত্য মূর্ত্তি যে কি তখনও তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। বিশেষতঃ সেকালে আমাদের সমাজে পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার বড় অবসর ছিল না। আমার বাল্যে আমার বাবা আমার সঙ্গে আচারে ব্যবহারে—'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্র বদাচরেৎ'—এই চাণক্য নীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ষোল বছর হইতেই আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। তাহার পর বাবা আমার সঙ্গে মিত্র-ব্যবহারের কোন অবসরই পান নাই। এইজন্য পিতাপুত্রে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বাবার সকল প্রকারের সাংসারিক আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার মনে যে কি গভীর আঘাত করিয়াছিলাম, তাহা বোঝা আমার সাধ্যাতীত ছিল।

(৩)

আজ বুঝিতেছি, তাঁহার ওই শেষ-পত্রে 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধনের ভিতর প্রাণের কি গভীর বেদনা লুকাইয়াছিল। একমাত্র পুত্রের সঙ্গে চিরদিনের মতন একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। আর পুত্রকে নিজের ঘরে আদর করিয়া রাখা হইবে না। পুরাতন যুগে পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলে পিতামাতার প্রাণে যে তীব্র বিরহ-বেদনা জন্মিত, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আমি বাবার প্রাণে সেই বেদনাই জাগাইয়াছিলাম। এই বেদনার তাড়নাতেই বাবা আমাকে তাঁহার এই শেষ পত্রে জন্মের মত 'প্রাণতুল্যেষু" বলিয়া সম্বোধন করেন। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলার নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আপনাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এরূপ বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে সত্যের ও ধর্ম্মের নামে নূতনে পুরাতনে এই অপরিহার্য্য সংগ্রাম বাধে, সেইখানেই এরূপ মর্ম্মন্তুদ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়।

(৪)

বাবার সেই চিঠিখানা তখন যত্ন করিয়া রাখি নাই। অযত্নে তাঁর সেই শেষ পত্রখানি হারাইয়াছি বলিয়া আজ গভীর আক্ষেপ হইতেছে। সে চিঠিখানা নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম মর্ম্মে মর্ম্মে আজও গাঁথিয়া আছে। সেই চিঠিখানিতে বাবার সমস্ত চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে যুগের লোক ছিলেন, সে যুগের শীলতার মুখ্য লক্ষণ ছিল সংযম, বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে। বাবা বিশেষভাবে মনে হয় এই সংযম সাধন করিয়াছিলেন। আপনার অন্তরের গভীরতম সুখদুঃখের কথা তখনকার ভদ্রলোকেরা সর্ব্বদাই

চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইহা পুরুষত্বেরও প্রধান সাধনা ছিল। বাবার সমবয়স্ক লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে কেহ কোনদিন তাঁহাকে শোকে অধীর হইতে দেখে নাই। আমার পরে আমার অনেকগুলি ভাইভগিনী জন্মিয়াছিল। তাহারা একে একে সকলে অতি শৈশবেই পিতামাতার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। বারংবার এইরূপ সন্তানবিয়োগে বাবা কোনদিন কাহারও সমক্ষে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই। তারপর বাবার ষাট বৎসর বয়সে আমার মাতাঠাকুরাণী স্বর্গলাভ করেন। আমি তখন শ্রীহট্টের বাড়ীতে ছিলাম। বাবার খুবই লাগিয়াছিল জানি; বিজন নিশীথে তাঁহার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসই কেবল সেই বেদনা প্রকাশ করিয়াছিল; লোকের সমক্ষে বাবা একবিন্দু অশ্রুত্যাগ করেন নাই। আমাকে এই সময়ে যে চিঠি লেখেন তাহাতেও এই অসাধারণ সংযম অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাবা আমার উপর কোন ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, কোন অভিসম্পাত দেন নাই। তারই জন্য এই শেষ জীবনে সর্বদাই মনে হয়, তাঁহার প্রাণে এমন গুরুতর আঘাত করিয়াও বিধাতার কৃপায় ও তাঁহারই আশীর্বাদে পুত্রপৌত্রাদি লইয়া সংসার করিতে পারিতেছি। সেই চিঠি আদ্যোপান্ত ছিল কেবল একটা আক্ষেপোক্তি এবং আপনার জীবনের ভুলভ্রান্তি স্বীকার। চিঠিখানি আরম্ভ করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

'আমি এ জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়াছি। তাহারই ফলে আমার এই শেষ বয়সে এই দশা ঘটিল।'

এইরূপে আমার সম্বন্ধে তিনি পরে পরে যে সকল ভুল করিয়াছিলেন ধারাবাহিকভাবে তাহার উল্লেখ করেন। আমার জন্মকালে বাবা মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক মুন্সেফেরা অনেকেই ক্রমে সদরআলা হইয়া তখনকার হিসাবে মোটা পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবা যদি মুন্সেফি ছাড়িয়া আমাকে ইংরাজী

শিখাইবার জন্য পুনরায় ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ না করিতেন, তাহা হইলে তিনিও এসময়ে এইরূপ উচ্চপদ হইতে মোটা পেন্‌সনে অবসর লইতে পারিতেন।

'তোমাকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য মুন্সেফি ছাড়িয়া আমি জীবনে একটা খুব বড় ভুল করিয়াছিলাম।'

তার পরে লেখেন,

'তুমি যখন এণ্ট্রান্স পাশ করিলে তখন তোমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া কলেজে পড়ান আমার জীবনের দ্বিতীয় ভুল। ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে বিদ্বান্ করাইয়া বি-এল্ পাশ করাইয়া আমার জায়গায় আনিয়া বসাইব। আমার ব্যবসায়ে আমি যে উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই, তুমি তাহা লাভ করিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে নিজের কাছ হইতে ছাড়াইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া জীবনের আর একটা মস্ত ভুল করিয়াছিলাম। তোমার আশা যখন ছাড়িতে হইল, তখন এই বয়সে আমি আবার বিবাহ করিয়া জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভুল করিয়াছি। যাহা হউক, বোধ হয় এই ভুল করিয়া আমি তোমার ধর্ম্মসাধনের পথ প্রস্তুত করিলাম। দুর্গামোহন দাসের মতন তুমিও আমার পরে ধর্ম্মলাভের একটা সুযোগ পাইবে।'

বাৎসল্য রসের এই মর্ম্মবেদনার চিত্রে কত বিরুদ্ধ ভাবের সংগ্রাম ও সম্মেলন এই পত্রখানিতে হইয়াছিল, তখন তাহা বুঝি নাই। এখন বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সাহায্যে তাহা বুঝিতেছি। ইহার পরে বাবা আট বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন; কিন্তু এইখানিই তাঁহার নিকট আমার শেষ পত্র-ব্যবহার।

(২৩)

কুচবিহার বিবাহ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা

আমাদের ছোট সাধন গোষ্ঠীটি গড়িয়া ভাবিয়াছিলাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া সকলে একযোগে দেশের কাজে জীবন কাটাইব। কিন্তু বিধাতার বিধান সে আকাঙ্খার অনুকূল হইল না। ১৮৭৭ ইংরাজীতে আমাদের ক্ষুদ্রমণ্ডলীর জন্ম হইয়াছিল। নয় মাস যাইতে না যাইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে কুচ-বিহারের নাবালক মহারাজার বিবাহ হইয়া এক প্রবল ঝড় উঠিল। কেশবচন্দ্রের কন্যার বয়স ত্রয়োদশ ছিল। যতদূর মনে পড়ে, কুচবিহার মহারাজার বয়স তখনও আঠারো পূর্ণ হয় নাই।

(২)

ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রচলিত জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেন, বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ পাপ বলিয়া বর্জ্জন করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রচলিত সংস্কারাদি পৌত্তলিকতা বলিয়া পরিহার করিলেন, তখন ব্রাহ্মদের বিবাহ আইনমতে সিদ্ধ হইবে কি না এই সাংঘাতিক প্রশ্ন উঠিল। প্রচলিত হিন্দু-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ। ব্রাহ্মসমাজে জাতবিচার নাই বলিয়া অসবর্ণ বিবাহের পথে কোন বাধা রহিল না। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ মানেন না বলিয়া ব্রাহ্মদের বিবাহে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজ তথাকথিত পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া নারায়ণের বিগ্রহরূপে শালগ্রাম শিলাকে বিবাহের সাক্ষীরূপে বিবাহ-সভায় আনিয়া স্থাপন করাও ব্রাহ্মদের চক্ষে ধর্ম্ম-বিগর্হিত হইল। অথচ হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিবাহে শালগ্রামের উপস্থিতি ব্যতীত এই সংস্কার

হিন্দু-আইনে অসিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মেরা আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুমতে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শালগ্রাম ছাড়িয়া ব্রহ্মোপাসনাপূর্ব্বক নিজেদের গড়া পদ্ধতি অনুসারে যে সকল বিবাহ করিতেছিলেন বা দিতেছিলেন, তাহাও অবৈধ হইবে। আর ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ হইলে এই বিবাহের সন্তানসন্ততিরা নিজেদের দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। ব্রাহ্ম পিতার হিন্দু সগোত্রেরা তাঁহার সন্তানাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সম্পত্তির উপরে নিজেদের অধিকার স্থাপন করিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মেরা যে নূতন প্রণালীতে নিজেদের মধ্যে একটা অপৌত্তলিক বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আইনের চক্ষে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বৈধ ও সিদ্ধ করা প্রয়োজন হয়।

(৩)

ব্রাহ্ম বিবাহ-বিধি ও কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ

দুই উপায়ে ইহা সম্ভব ছিল। হাইকোর্টে দু-একটা মোকদ্দমা আনিয়া ব্রাহ্মেরা যে বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য এবং শালগ্রামের উপস্থিতি না থাকিলেও তাহা হিন্দু-আইন সঙ্গত এরূপ নজির গড়িয়া তোলা; পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে স্মার্ত্ত শিরোমণিরা প্রাচীন শ্রুতি ও স্মৃতির দেশকালোপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সনাতন শাস্ত্রের সঙ্গতি ও সমন্বয় করিয়া দিতেন। এই ভাবেই প্রাচীন যুগে হিন্দু সমাজের বিকাশ ও অভিব্যক্তি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে মুসলমান আমলে, এবং তাহার পরে বিশেষভাবে ইংরাজের শাসনাধীনে সমাজের সে বাঁধন একেবারে একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া টুটিয়া গিয়াছিল। এখন আর পুরাতন পথে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনুশাসনে নূতন অবস্থার উপযোগী সমাজের সংস্কারাদি প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব ছিল না। সে-পথে হিন্দু-সমাজের অভিনব অভিব্যক্তি সম্ভব হইত যদি রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি হিন্দুর হাতে থাকিত। সে শক্তি এখন ইংরাজ প্রভুশক্তির করতলন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন যুগে সনাতন শাস্ত্রের নূতন নূতন সময়োপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া সমাজ-বিকাশে স্থিতির সঙ্গে গতির সঙ্গতি রাখিবার যে অধিকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে ছিল, তাহা ইংরাজের শ্রেষ্ঠতম আদালতের হাতে গিয়া পড়িল। কিন্তু নূতন নজির করিয়া ব্রাহ্মদের অসবর্ণ ও অপৌত্তলিক বিবাহকে হিন্দু বিবাহরূপে সিদ্ধ করিতে অনেক সময় লাগিত। হাইকোর্টের ও প্রিভি কাউন্সিলের নানা বিচারকের হাতে প্রাচীন হিন্দু-আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া একরূপ অনিবার্য্য ছিল। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন নজিরের মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মপদ্ধতিতে বিবাহ যে হিন্দু-বিবাহ এই সিদ্ধান্ত হইতে বহুদিন লাগিবে। ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ কি অবৈধ এই সন্দেহের মাঝখানে পড়িয়া এই সকল বিবাহের সন্তান সন্ততিদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সঙ্গত নহে। কেশবচন্দ্র এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সুতরাং একটা নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ করাইয়া লইতে চাহেন।

এই লইয়া কেবল হিন্দু সমাজে নহে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও একটা প্রবল বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। এরূপ আইন পাশ হইলে হিন্দু সমাজের গাঁথুনি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে এই আশঙ্কায় প্রাচীন স্মৃতিশাসিত হিন্দুরা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। আদি সমাজের ব্রাহ্মেরাও ব্রাহ্ম আইন বলিয়া নূতন কোন বিবাহবিধি হউক ইহার অত্যন্ত বিরোধী হন। তাঁহারা বলেন যে এরূপ আইন হইলে ইতিপূর্ব্বে যে সকল অপৌত্তলিক বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ হইয়াছে, এটি মানিয়া লওয়া হইবে। সমগ্র হিন্দু সমাজ

এবং ব্রাহ্মসমাজের একদল এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধী হইলে গভর্ণমেণ্টের এইরূপ একটা আইন পাশ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি না করিয়া গভর্ণমেণ্ট একটা অসাম্প্রদায়িক বিবাহ আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে যাঁহারা কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে চাহিবেন না, তাঁহারা নিজেদের বিবাহকে রেজিষ্টারী করাইয়া আইনসিদ্ধ করিয়া লইতে পারিবেন। ১৮৭২ ইংরাজী তিন আইন নামে এই নূতন আইন জারি হয়। এই তিন আইন অনুসারে কোন বিবাহ হইলে কন্যার বয়স অন্যূন চতুর্দ্দশ এবং বরের বয়স অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষ হওয়া আবশ্যক।

কেশবচন্দ্রের কন্যার বয়স তখনও চতুর্দ্দশ হয় নাই, কুচবিহার মহারাজার বয়সও অষ্টাদশ পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং কেশবচন্দ্র নিজ যে বিধান ব্রাহ্মমণ্ডলীতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে সেই বিধানের ব্যতিক্রম ঘটে। কেবল তাহা নহে। কেশবচন্দ্র যখন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন কথা ছিল, যে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ হইবে; এই বিবাহে শালগ্রাম বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিবেন না। নাবালক মহারাজের পক্ষে তাঁহার অভিভাবকেরা অর্থাৎ দার্জ্জিলিং বিভাগের কমিশনার এবং কুচবিহারের দেওয়ান প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের এই সর্ত্ত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহে কোন-প্রকারের জাতিভেদ বা পৌত্তলিকতার সমর্থন হইবে না, এই বিশ্বাসে কেশবচন্দ্র কুচবিহারে কন্যার বিবাহ দিতে যান। কিন্তু সেখানে রাজসরকারের কর্ত্তারা এই সর্ত্ত রক্ষা করিলেন না। কেশবচন্দ্রকে নিজেদের কোটে পাইয়া তাঁহারা রাজার বিবাহ তাঁহার পারিবারিক প্রথানুসারে হিন্দুসংস্কার-সম্মত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া পুরোহিত

আনিলেন, শালগ্রামও আনিলেন। কাজে এই দাঁড়াইল যে, কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহে কেবল যে তিন আইন ভাঙ্গা হইল তাহা নহে, কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে যে অপৌত্তলিক বিবাহ চলিয়া আসিয়াছিল সে নিয়মও রক্ষা হইল না।

কেশবচন্দ্রকে কুচবিহারের রাজপুরুষেরা একটা ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অন্যপক্ষে কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনাবধি যে সিংহবিক্রমে প্রাচীন কুসংস্কার এবং অসত্যকে বর্জ্জন করিয়া নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছিলেন সেই বিক্রমে এই রাজপুরুষদের এই চক্রান্ত হেলায় ছিঁড়িয়া আসিলেন বা আসিতে পারিলেন না। এই জন্য কুচবিহার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে এমন তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম সাধারণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের আচার্য্য জীবনের এই প্রথম বড় পরীক্ষায় নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে পাশে ঠেলিয়া সামান্য বিষয়বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মৌলিক আদর্শগুলিকে খাটো করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা ভাঙ্গন ধরিত না, যদি কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমক্ষে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে এই মণ্ডলীর শাসন মাথায় পাতিয়া লইতেন। কেশবচন্দ্র তাহা করিলেন না বা পারিলেন না। এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজ আবার আর এক ভাগে বিভক্ত হইল।

(৪)

ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় ভাঙ্গন

কুচবিহার বিবাহের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সেই মন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর এক সাধারণ সভা আহূত হয়। আমি

তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। ফলতঃ এই সভাতেই আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেই। যতদূর মনে পড়ে, এই সভাতে দুইটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহে ব্রাহ্ম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আচার্য্যের এই কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। পরে কেশবচন্দ্রের এই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে সেই পদ হইতে অপসারিত করা হোক, এই দ্বিতীয় প্রস্তাব আসে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন ৺প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়। তিনি এই সভা ডাকিতে রাজী ছিলেন না বলিয়া উপাসকমণ্ডলীর কতিপয় সভ্যের নামে এই সভা আহূত হইয়াছিল। এইজন্য এই সভা বৈধরূপে আহূত হয় নাই, কেশবচন্দ্রের দলের লোকেরা এই আপত্তি তুলিয়া প্রথমেই সভাটা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন। উপস্থিত সভ্যেরা এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সভার কার্য্য চালাইবার সংকল্প করিলে সভা-নায়ক কে হইবেন, এই প্রশ্ন উঠে। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নায়ক ছিলেন এবং উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য ও সভাপতি ছিলেন। এইজন্য তাঁহার উপস্থিতিতে অন্য কাহারো সভাপতি হইবার অধিকার নাই, প্রচারক দল এই কৌশলে সভাকে পণ্ড করিতে চেষ্টা করেন। বিরোধী পক্ষ কহেন যে, কেশবচন্দ্র যখন স্বয়ং এই সভার নিকটে অভিযুক্ত, তখন তাঁহার নিজের বিচারে তিনি বিচারক হইতে পারেন না। তাঁহারা ৺দুর্গামোহন দাসকে সভাপতির আসনে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। এই উভয় প্রস্তাবই সভার সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং অধিকাংশের মতে দুর্গামোহন দাসই সভাপতি হউন, এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন কেশবচন্দ্র নিজের দলবলের সঙ্গে সভা ছাড়িয়া চলিয়া যান। গোলমালে সভা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র এবং

তাঁহার অনুচরেরা এই সভা অবৈধ বলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলে বিপক্ষ দল সভার কার্য্য চালাইয়া তাঁহাদের দুইটি প্রস্তাবই অধিকাংশের মত অনুযায়ী গ্রহণ করেন। ইহা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে আর একটা ভাগাভাগি আরম্ভ হয়।

কেশবচন্দ্র যদি এই সভার নিকটে ঈষৎ পরিমাণেও আপনার মাথা নোয়াইতেন, খোলাখুলিভাবে কিরূপ চক্রান্তে পড়িয়া তিনি এ প্রকারে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন, এই বিবাহ প্রকৃতপক্ষে কেবল একটা বাগ্‌দান মাত্র, বরকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথারীতি সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে তিন আইন মতে রেজিষ্টারী হইয়া তাঁহাদের বিবাহ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা দাম্পত্য সম্বন্ধে কার্য্যতঃ আবদ্ধ হইবেন না; এই সকল কথা বলিয়া যদি উপাসকমণ্ডলীর নির্দ্ধারণ স্বীকার করিয়া তখনই আচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে এই বিবাদ সেই দিনই মিটিয়া যাইত। ব্রাহ্ম সাধারণের চিত্তের উপর কেশবচন্দ্রের এমনই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, এতটুকু ত্রুটি স্বীকার করিয়া তিনি আচার্য্য পদ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের লোকমত বা বহুমত যাহা হইবার হইয়াছে বলিয়া সনির্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে তাঁহার পদে আটকাইয়া রাখিত। ব্রাহ্মসমাজের এই ভাঙ্গাভাঙ্গিটা হইল প্রকৃতপক্ষে কেবল কুচবিহার বিবাহ লইয়া নহে, কিন্তু কেশবচন্দ্র এই বিবাহের পরে যে ভাবে ব্রাহ্মমণ্ডলীর বহুমত বা জনমতকে পায়ে ঠেলিয়া চলিতে চাহিতেছিলেন, তাহারই জন্য। তখনই এ কথা বলিয়াছিলাম। আজ অর্দ্ধশতাব্দী পরে, ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেই পুরাতন ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই প্রতীতি দৃঢ় হইতেছে।

(৫)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা

কুচবিহার বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির হইতে প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথমতঃ সেই মন্দিরের পাশেই ৺উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে নিজেদের উপাসনা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই দেশের সাধারণ ব্রাহ্মদের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কহিয়াছি, এই প্রতিবাদের মুখেই আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিত হই। কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করিবার জন্য ব্রাহ্ম যুবকদের এক সভা হয়। বর্ত্তমান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের পূর্বপারে এক বড় বাড়ীতে সে সময়ে একটা স্কুল ছিল—তার নাম ছিল ট্রেণিং একেডেমি—Training Academy। এই স্কুল-বাড়ীতেই এই সভা হয়। এই সভাতে আমি সর্বপ্রথমে কলিকাতায় কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করি। এই বৎসর (১৮৭৮) ভাদ্রমাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলী যে ব্রহ্মোৎসব করেন, তাহাতে ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্য হইতে কালীশঙ্কর সুকুল, সুন্দরীমোহন দাস এবং আমার উপরে উৎসবের দিন বৈকালে প্রবন্ধ পড়িবার ভার অর্পিত হয়। আমি সে সময়ে খৃষ্টিয়ান সাধকদের কথা পড়িতেছিলাম। আদিম খৃষ্টিয় উপাসকমণ্ডলীর জীবন Fox's Book of Martyrs এবং রোমক খৃষ্টিয় উপাসকমণ্ডলীর জীবন-কথাতে আমার মন তখন ভরপুর ছিল। এদিকে ব্রাহ্মসমাজে 'সাজ সত্যের সংগ্রামে সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় এ রণে' এই প্রাণমাতান সঙ্গীত আমাদের প্রধান সাধনমন্ত্র হইয়াছিল। এই সত্যের সংগ্রামে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম।

খৃষ্টিয়ান শহিদদের দৃষ্টান্ত হইতে স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রেরণা লাভ করিয়া জীবনের প্রথম এই বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীতে তাহা প্রচার করিয়াছিলাম। একরূপ গোপনে নয় দশ মাস পূর্বে হেয়ার স্কুলের বাড়ীতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া যে স্বাধীনতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, এই ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্যভাবে এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তাহাই প্রচার করিলাম। মাতা ইতিপূর্বেই তাঁহার কঠিন-কোমল মমতার অলক্ষ্য বন্ধন নিজেই কাটিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সে বন্ধনআমাকে কাটিতে হয় নাই। এইরূপে এখন পিতার শাসন ছিঁড়িয়া, জ্ঞাতিগোত্রদের বন্ধন কাটিয়া সংসারের সকল সহায় সম্বল ছাড়িয়া, অকূল সংসারে ভাসিয়া পড়িলাম। এখানে সহায় রহিলেন উপরে ভগবান, আর নীচে সুন্দরীমোহন প্রভৃতি দু-চারিজন বাল্যসখা মাত্র।

ছাত্রজীবন শেষ

১৮৭৭ ইংরাজীর শরৎকালে বাবা একসঙ্গে আমার পূর্ব্ব ছয় মাসের খরচ পাঠাইয়া দিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আর নিয়মিত কলিকাতা থাকিয়া আমার পড়াশুনার খরচ পাইবার আশা করিতে পারিলাম না। সুতরাং জীবিকা উপার্জ্জনের একটা উপায় করিবার চেষ্টা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে যে পরীক্ষাকে Intermediate কহে সেকালে তাহাকে F. A. অর্থাৎ First Examination in Arts কহিত। ইহার আর এক নাম ছিল L. A. অর্থাৎ Lower Arts Examination। এখন যেমন তখনও সেইরূপ Entrance বা প্রবেশিকা পাশ করিবার দুই বৎসর পরে F. A. বা L. A. পরীক্ষা দিতে হইত। এই হিসাবে আমার ১৮৭৬ ইংরাজীর ডিসেম্বর মাসেই L.A. পরীক্ষা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষভাগে আমার পান-বসন্ত হয়, ইহার ফলে প্রায় দুই সপ্তাহকাল শয্যাগত ছিলাম। আমার সেবাশুশ্রূষা করিতে যাইয়া, আমি সারিয়া উঠিতে না উঠিতে সুন্দরীমোহনেরও এই অসুখ হয়। তখন আমাকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে হয়। এইসকল কারণে সেবারে আর আমার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। তার পরের বৎসর পরীক্ষা দিলাম কিন্তু গণিতে পাশ করিতে পারিলাম না। ১৮৭৮ এর নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় বার এই পরীক্ষা দিতে গেলাম। তখন পাঁচদিন L. A. পরীক্ষা হইত। প্রথম দিন ইংরাজী, দ্বিতীয় দিন সংস্কৃত, তৃতীয় দিন ইতিহাস, চতুর্থ দিন গণিত এবং পঞ্চম দিন পূর্ব্বাহ্নে Logic বা ন্যায় ও পরাহ্নে রসায়ন বিজ্ঞান বা Chemistryর পরীক্ষা হইত। আমি

পঞ্চম দিনের পূর্ব্বাহ্ণের পরীক্ষা দিয়া পরাহ্ণের রসায়নের পরীক্ষা দিতে বসিয়া দিতে পারিলাম না। প্রশ্নের কাগজ হাতে লইতে না লইতে খুব কাঁপাইয়া জ্বর আসিল। এবারে যে কয়দিন পরীক্ষা দিয়াছিলাম তাহাতে পাশের নম্বর রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু শেষদিনের শেষ পরীক্ষা পাশ করিতে পারিলাম না। এইখানেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল।

(২)

১৮৭৮ ইংরাজীর মাঝামাঝি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই নূতন সমাজের একজন কর্ণধার হন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাগ্মিতা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনন্যসাধারণ মুমুক্ষুত্ব ও ভক্তিসাধন, দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অকাতর অর্থসাহায্য এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মনীষা—এই সকলের উপরেই বিশেষভাবে এই নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে। আমরা যুবকের দল একটা নূতন স্বাধীনতার আকর্ষণে ও একটা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রলোভনে এই নূতন সমাজে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, এ কথা পূর্বেই কহিয়াছি। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আলোকসামান্য বাক্‌বিভূতির ও চরিত্রের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে একটা অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতবাদ বা সাধন-প্রণালী একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া চলিতে না পারিলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কাহারো পক্ষে আপনার শক্তি উপযোগী কোন কর্ম্ম-ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা একেবারেই অসাধ্য

ছিল। আনন্দমোহন, শিবনাথ, দুর্গামোহন প্রভৃতি ব্রাহ্মেরা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার প্রচারক দলের আনুগত্য অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একরূপ কোন-ঠাসা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-নিকেতনে যে সকল ছাত্রেরা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রচারক দলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা সে গণ্ডীর বাহিরে ছিলাম। সে শাসন মানিয়া চলা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। আমরা পিতামাতার শাসন অস্বীকার করিয়া যে যুক্তিবাদের আশ্রয়ে ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্রের মণ্ডলীতে তাহার যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান ছিল না। নূতন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শের সেই স্থান লাভ হইল। এইজন্য আমরা সকল প্রাচীন বন্ধন কাটিয়া এই সমাজের কাজে লাগিয়া গেলাম।

(৩)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই নূতন সমাজের কর্ম্মী ও প্রচারকদল গড়িয়া তোলা আবশ্যক হয়। এই প্রয়োজনে প্রথমে নূতন সমাজের একখানি বাংলা পাক্ষিক এবং একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা পাক্ষিকখানি 'তত্ত্বকৌমুদী', এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইংরাজী সাপ্তাহিকের নাম ছিল 'Brahmo Public Opinion'। ইহার সম্পাদক ছিলেন দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ভুবনমোহন দাস। 'তত্ত্বকৌমুদী' আদি ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী' এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'ধর্ম্মতত্ত্বের' মত কেবল ব্রাহ্মসমাজের মতবাদই প্রচার করিত, সাধারণ সংবাদপত্র ছিল না। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাতেই আপনার কলেবর পূর্ণ করিত না।

অন্যান্য সংবাদপত্রের মত সাময়িক রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা করিত। পাঁচ বৎসর পরে ১৮৮৩ ইংরাজীর প্রথমে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' সাধারণ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হইয়া 'বেঙ্গল পাব্‌লিক ওপিনিয়ন' নাম গ্রহণ করে। আর ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট মুখপত্ররূপে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। 'তত্ত্বকৌমুদী' এবং 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নূতন কর্ম্মীদল গড়িয়া তুলিবার জন্য সিটি স্কুলের জন্ম হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক কর্ম্মীদের অনেকেই সামান্য জীবিকোপায় মাত্র লইয়া প্রথমে এই স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। আমিও এখানে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়াছিলাম কিন্তু আমার পক্ষে কলিকাতার বালকদের শাসন করা, 'বাঙ্গাল' বলিয়া সম্ভব হইবে না, এই ভয়ে সিটি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে এই স্কুলের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। আমার পক্ষে ইহা ভালোই হইয়াছিল। কারণ সিটি স্কুলে কাজ না পাইয়া আমি ১৮৭৯ ইংরাজীর প্রথমে কটকের একটা এনট্রান্স স্কুলে হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হই। সিটি স্কুলে কাজ পাইলে আমি নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষকতাই পাইতাম এবং তাহা হইলে আমাকে হয়তো আজীবন ঐ সংকীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতে হইত। কিন্তু কটকের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া একটা বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া পড়িলাম এবং বিধাতার কৃপায় আত্মোন্নতির এমন অবসর ও অধিকার পাইলাম যাহা কলিকাতার সিটি স্কুলে কোনও দিন পাইতাম কি না সন্দেহ। এইরূপে আমার কলিকাতার ছাত্রজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কর্ম্মজীবনের শেষ হইয়া আমি ১৮৭৯ ইংরাজীর প্রথমে কটকে যাইয়া নূতন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করি।

উড়িষ্যা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে

১৮৭৯ ইংরাজীর প্রথমে আমি কটকে যাইয়া উপস্থিত হই। উড়িষ্যায় এখন রেল হইয়াছে। তখন হয় স্থলপথে পায়ে হাঁটিয়া, কচিৎ গোযানে কিম্বা জলপথে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কটকে যাইতে হইত। কলিকাতা হইতে চাঁদবালি পর্য্যন্ত একখানা সমুদ্রের জাহাজ যাইত। চাঁদবালি হইতে মহানদী পর্য্যন্ত একটা খাল কাটা হইয়াছিল। নৌকা করিয়া বা খালের ছোট জাহাজে কটক যাইতে হইত। আমি এইপথেই প্রথম কটক যাই। শীতকাল। শেষ রাত্রিতে কয়লাঘাটায় জাহাজ চাপিয়া সারাদিন গঙ্গার বুকে ভাসিয়া সন্ধ্যাকালে সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হই। তারপরে ছয় সাত ঘণ্টা সমুদ্রের ভিতর দিয়া গিয়া চাঁদবালি বন্দরে জাহাজ নোঙর করে। জাহাজেই রাত কাটাইয়া পরদিন প্রাতে খালের জাহাজে উঠিয়া কটক রওয়ানা হই। এবারে ঠিক সমুদ্র দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই। কোন্ তিথি ছিল মনে নাই, কিন্তু ঘোর অন্ধকারের মাঝখানে জাহাজ সমুদ্রে যাইয়া পড়ে। আর জাহাজের দোলানিতে আমিও অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু খালের জাহাজে চড়িয়া এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। এ খাল প্রকৃতির সৃষ্টি নহে, মানুষের কাটা। কিছুকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের একটা কর্ম্মের ব্যবস্থা ও অন্নসংস্থান করিবার জন্য এই উড়িষ্যা ক্যানেল নির্ম্মিত হয়। মহানদীতে বারমাস বেশী জল থাকে না। হেমন্তকালে অধিকাংশ স্থানে নদীর জল একেবারে শুকাইয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই প্রচণ্ড বানে কেবল যে নদীগর্ভ পূর্ণ করিয়া দেয় তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাহার দুকূল প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই সময়ে

যদি বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বারো মাস সেই জল নানা কাজে লাগিতে পারে। কটকের নীচে মহানদীতে এরূপ বাঁধ আছে। ইংরাজীতে ইহাকে anicut কহে। কটকে ইহা একটি দেখিবার জিনিষ। মহানদীর এই বাঁধা জলই খাল কাটিয়া চাঁদবালির নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে। চাঁদবালি হইতে এই খাল উত্তরোত্তর উঁচু হইয়া গিয়াছে। আর মাঝে মাঝে কাঠ ও লোহার দরজা করিয়া উপরকার জল যাতে হুড়মুড় করিয়া নীচে আসিয়া না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে। এই কাঠের দরজাগুলিকে lock কহে। এই lock-এর ভিতরে নৌকা ও জাহাজ ঢুকিলে পরে তাহার নীচের দরজাটা প্রথমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে উপরের জলের চাবি খুলিয়া দিলে ক্রমে ক্রমে নীচের জল বাড়িয়া যখন উপরের খালের জলের সমান হয়, তখন উপরের দরজা সহজেই খুলিয়া যায় এবং lock-এর ভিতরকার জাহাজ ও নৌকা উপরে canal-এর ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপে lock এর পর lock যত পার হইয়া আসিতে লাগিলাম আমাদের ছোট জাহাজ ও নৌকাগুলি চাঁদবালির নদী হইতে তত উঁচুতে উঠিতে লাগিল। কটকের পথে এই এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আর এক অভিজ্ঞতাও লাভ করিলাম, নূতন রন্ধনবিদ্যায়। চাঁদবালি হইতে কটক দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়াছিলাম। খালে জাহাজের পিছনে খান দুই বজরা বাঁধা ছিল। ইহারই একখানির এক কামরায় আমার শুইবার ও বসিবার বন্দোবস্ত ছিল। ঠিক ইহারই পরের কামরায় বাবুর্চ্চিখানা ছিল। দুই কামরায় মাঝখানে আমার বিছানার গায়ে একটা জানালা ছিল। অন্য কোন কাজ-কর্ম্ম ত ছিল না। সুতরাং ঐ জানালা খুলিয়া দুদিন ধরিয়া বাবুর্চ্চি কি করিয়া রাঁধে তাহাই দেখিয়াছিলাম। রান্নার সখটা আগেই বলিয়াছি, আমার পৈতৃক। বাবারও এ সখ ছিল। এই কটকের

পথে আমারও এই সখটা বেশ ফুটিয়া উঠিল। বাবুর্চ্চি ছিল এদেশী মুসলমান নয়, মাদ্রাজী। এই প্রথম আমি মান্দ্রাজী রান্না খাই এবং সঙ্গে সঙ্গে মান্দ্রাজী রান্নাও শিক্ষা করি।

(২)

কটকের স্কুলে শিক্ষকতা

আমি যে স্কুলে কাজ লইয়া গেলাম তার নাম ছিল কটক একাডেমী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন আচার্য্য। সেকালে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেদের অর্থ বা সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, নিজেরাই সেইসব স্কুল চালাইতেন। প্যারী বাবু যে ধনী ছিলেন, এমন নহে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, চাকুরী-বাকুরী না করিয়া ভদ্রলোকের মতন জীবিকার ব্যবস্থা তাঁর ছিল। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়া (বোধ হয় পাশ করেন নাই) কলেজ ছাড়িয়া তিনি এই স্কুল স্থাপন করেন, এবং প্রধান শিক্ষকরূপে এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর পদের নাম ছিল Rector, হেড-মাষ্টার নহে। আমি হেড-মাষ্টার হইয়া গেলে, তিনি নিজে পড়াইবার কাজ ছাড়িয়া দিলেও Rector এর পদ ছাড়িলেন না। মাঝে মাঝে আসিয়া স্কুলে পড়াইতেনও।

আমি যেদিন প্রথমে এই স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেদিনকার কথা এখনও মনে আছে। স্কুলে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন তাঁরা কেহ বা আমার সমবয়স্ক কেহ বা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমার বয়স তখন উনিশ মাত্র। দেখিতেও আমি লম্বা চওড়া ছিলাম না, কতকটা বালকের মতই দেখাইত। এই অজাতশ্মশ্রু বালক

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতে পারিবে কিনা, আমাকে দেখিয়া প্যারীবাবুর মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয়। একথা তিনি আমায় পরে কহিয়াছিলেন। আমার দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান এবং কি করিয়া আমি এই গুরুভার বহন করিব, এ বিষয়ে কৌতূহল-পরবশ হইয়া আমি যখন ক্লাসে গিয়া বসিলাম, প্যারীবাবু তখন পাশের ঘরে যাইয়া বসিয়াছিলেন। সেকালে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ইংরাজীর কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের সংগ্রহ-পুস্তক (Lethbridge's English Selections) প্রায় সকল স্কুলেই পড়ান হইত। আমি নিজে শ্রীহট্টের স্কুলে এই বই পড়িয়াছিলাম। এখনে ক্লাসে যাইয়াই এই বই খুলিয়া পড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু অবাক হইয়া দেখিলাম যে, কোথা হইতে কিরূপে জানি না, এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধে পূর্ব্বে যে মর্ম্ম কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই, সেই মর্ম্ম আমার অন্তরে আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহার তথ্য তখন বুঝি নাই, এখনও জানিনা। তবে এ জীবনে প্রায়ই এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পূর্ব্বে যাহা পড়ি নাই, শিখি নাই, ভাবি নাই, অনেক সময় সে সকল গ্রন্থ বা শাস্ত্র খুলিয়া পড়িতে যাইবামাত্র তাহার নিগূঢ়তম মর্ম্ম আপনা হইতেই যেন আমার অন্তরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এখানেও তাহা হইল। Lethbridge's Selections-এর প্রথম প্রবন্ধের এই বিশদ ব্যাখ্যা আমার নিজের মুখে নিজে শুনিয়া আমি একদিকে বিস্মিত ও অন্যদিকে আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্যারীবাবু পরে কহিয়াছিলেন যে, আমার এই প্রথমদিনের পড়ান শুনিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, আমার উপর যে ভার দিয়াছিলেন, সে-ভার আমি বহন করিতে পারিব।

(৩)

উড়িষ্যার সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠতা

আমি যখন প্রথম কটকে যাই, উড়িষ্যা তখন যে কেবল বাংলার শাসনতন্ত্রভুক্ত ছিল, তাহা নহে, বাংলার প্রাদেশিক সাধনার সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। মহাপ্রভুর সময়ে, অর্থাৎ পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যা ও বাংলায় অনেক বিষয়ে যোগ ছিল। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন পুরী আর নবদ্বীপ "এঘর ওঘর" বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্ব্বদা লোকে যাতায়াত করিত; আর যখন একস্থানের বহুলোক সর্ব্বদা অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে থাকে, তখন দুইস্থানের জনগণের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিনিময় চলিয়া থাকে। এইরূপে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার এবং উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার একটা গভীর যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন বাংলা ভাষার অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্ত্তমান প্রচলিত অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; কিন্তু ওড়িয়া ভাষায় এখনও সে সকল শব্দ জীবন্তভাবে চলাফেরা করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ, চট্টল, ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজিও এমন অনেক কথা ব্যবহৃত হয়, যাহা পশ্চিমবঙ্গের কথাবার্ত্তার ভাষায় পাওয়া যায় না, অথচ ওড়িয়া শব্দ-কোষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কথা মনে জাগিল। সে কথাটা 'লাফরা'। শ্রীহট্ট অঞ্চলে আমরা বাল্যাবধি এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত। থোড়, মোচা, মিঠা কুমড়া, শিম, মূলা, বেগুন প্রভৃতি তরকারী এক সঙ্গে ডালের বড়া দিয়া রন্ধন করিলে যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম 'লাফরা'। জগন্নাথের ভোগে এই বিচিত্র ব্যঞ্জনকে লাফরা বলিয়া থাকে। এই লাফরা

প্রসাদ মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এইরূপ বহুতর ওড়িয়া শব্দ বাংলা কোষে ঢুকিয়াছে। এ সকলের দ্বারা অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান আমলে বিহার ও উড়িষ্যা সুবা-বাংলার এলাকাভুক্ত হইয়া উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার পুরাতন ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজ যখন মোগল প্রভুশক্তির নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া ক্রমে ইহার শাসনভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল, তখন সে পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসীরা বাংলাভাষা শিখিতেন, নবযুগের বাংলার সাধনার অনুবর্ত্তন করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত না। তখন শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী ও শিক্ষিত বাঙ্গালী, উভয়েই ক্রমে এক হইয়া যাইবেন; বিশেষতঃ উভয় প্রদেশের লেখ্যভাষা এবং আধুনিক সাহিত্য এক হইয়া যাইবে, উভয় প্রদেশের চিন্তানায়কেরা এরূপই কল্পনা করিতেন। এই সাধারণ সাধনা ও সাহিত্যের পশ্চাতে একদিকে যেমন ওড়িয়া ভাষায় রচিত প্রাচীন ভাগবতাদি গ্রন্থ থাকিবে, সেইরূপ প্রাচীন বাংলায় রচিত ধর্ম্মমঙ্গল এবং ময়নামতীর গান প্রভৃতি গ্রন্থও থাকিবে, কিন্তু আধুনিক সাধনা ও সাহিত্য এক হইয়া যাইবে এবং বাংলা ভাষাই তাহার বাহন হইবে। ইংরাজ আমলের প্রথমাবধি উভয় প্রদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা এইরূপ কল্পনা ও আশা করিয়া আসিতেছিলেন।

(৪)

১৮৭৯ ইংরাজীতে যখন আমি প্রথম কটক যাই তখনও আমাদের এই আশা ছিল। সে সময়ের উড়িষ্যার চিন্তানায়কেরা, সকলে না

হউন, অনেকে বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতেন এবং উড়িষ্যার স্কুলে স্কুলে অধিকাংশ স্থলে বাংলা ভাষাই শেখান হইত। আমি কটকে যাইয়া দেখিলাম, সেখানকার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কটক প্রিন্টিং হল। এটী একটি পাকা দোতলা বাড়ীতে ছিল। কটক প্রিন্টিং সোসাইটী নামে একটা যৌথ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কোম্পানির মূলধন দিয়া এই বাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল। নীচের তলায় ছাপাখানা ছিল। ওড়িয়া, বাংলা ও ইংরাজী ভাষার ছাপাখানা। এখান হইতে "উৎকল-দর্পণ" নামে একখানা ওড়িয়া সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইত। এই কোম্পানির প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়; বোধ হয় ইনি কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাংলা হইতে গিয়া উড়িষ্যায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ বহু বাঙ্গালী উড়িষ্যায় গিয়া বসতি করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার লোকেরা ইঁহাদিগকে 'কেরা-বাঙ্গালী' বলিত। যাঁহারা আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, গৌরীশঙ্কর ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার প্রিন্টিং আপিসের হলে তখনকার কটকের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠান হইত। এই হলেই শহরের সধারণ সভা ও বক্তৃতাদি হইত। এখানে আমারও বাগ্মিতার মক্স আরম্ভ হয়।

(৫)

আমি কটকে যাইয়া আর একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলাম। তিনি রাধানাথ রায়। রাধানাথ রায় সে সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর ছিলেন; ক্রমে তিনি এসিষ্টাণ্ট ইনস্‌পেক্টর এবং বোধ হয় পরে ইনস্‌পেক্টরের পদও লাভ করিয়াছিলেন। রাধানাথ রায় কবি ছিলেন এবং আমার যতদূর

মনে পড়ে তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথমে বাংলা ভাষাকে বাহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে তিনি ওড়িয়া ভাষাতেও কবিতা লিখিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার অল্পদিন মধ্যে উড়িষ্যাতেও সরকারী খরচে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৪১ খৃঃ প্রথমে কটকে ইংরাজী জিলাস্কুল স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৬৮ ইংরাজীতে কটক জিলাস্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয়। ইহার আট বৎসর পরে বর্ত্তমান রেভেন্‌শ কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। আমি যখন কটক একাডেমির হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় রেভেন্‌শ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া যান। আর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কলেজের গণিতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এঁরা দুজনে অল্পদিন পরেই সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাঁদের দুজনের কেহই আর সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিলেন না বা কৃষিবিদ্যার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিলেন না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিলাতের সাইরেনচেষ্টারে কৃষিবিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত ব্যারিষ্টার হইতে হইলে বছরে বছরে যে খানা খাইতে হয় তাহা খাইয়া কৃষি-বিদ্যার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন, এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। গিরিশচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন পরে বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করেন। ইঁহারা যখন রেভেন্‌শ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, তখনই ইহাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

(৬)

পিতার সহিত সাক্ষাৎ

এই বৎসর গ্রীষ্মের ছুটীতে বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। শুনিয়াছিলাম বাবা গ্রামের বাড়ীতে আছেন। সুতরাং ষ্টীমার হইতে নামিয়া প্রথমে সেখানেই যাই। কিন্তু বাবা ইহার পূর্ব্বেই শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি নৌকাযোগে তখন শহর যাত্রা করিলাম। এইজন্য পথে আমার চার পাঁচ দিন দেরী হইয়া গেল। এই দেরী হওয়াতে শহরের বাসায় যাইয়া শুনিলাম বাবা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতিদিন আদালত হইতে ফিরিয়া নদীর ঘাটে যাইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেন। আমি যখন শ্রীহট্টে পৌছিলাম, তখন বেশ রাত হইয়াছে। বাবা তখনও আমার বিমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া শ্রীহট্টে যান নাই। শ্রীহট্টের বাসায় বাবা একেলাই ছিলেন। আমার বিমাতাঠাকুরাণী পৈলের বাড়ীতে কিম্বা তাঁর পিত্রালয়ে তখন বাস করিতেছিলেন। আমি বাসায় উপস্থিত হইলে মুখ হাত ধুইবার পরেই বাবা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন,—তোমার সম্বন্ধে কি করিব এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেজন্য আজ তোমাকে আমি কষ্ট দিব। তোমাকে রাতটা জলযোগ করিয়াই থাকিতে হইবে। এই বলিয়া আমার জন্য বাজার হইতে যে কচুরি ও সন্দেশ আনাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া দিতে পরিচারককে আদেশ করিলেন। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়াই এই জলযোগ করিয়া শুইতে গেলাম।

(৭)

আমাদের শ্রীহট্টের বাসা একটা পাকাবাড়ীতে ছিল। তারই এক অংশে স্কুল ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত নবকিশোর সেন মহাশয় বাস

করিতেন। এই পাকাবাড়ীর সংলগ্ন আরও দুই তিনটা বাসা ছিল; সকলেই আমাদের আত্মীয়। পরদিন প্রাতঃকালে বাবা সকল বাড়ীর গৃহিণীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমাকে যেন তাঁহারা রান্নাঘরে না তুলেন, তুলিলে তিনি আর তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিতে পারিবেন না। নবকিশোর বাবুর গৃহিণী আমার মা'কে মা বলিতেন এবং আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মতন স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে প্রত্যূষেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমার জন্য লুচি আলুভাজা রাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি ঘরে যাইতে রাজী হইলাম না। বলিলাম, 'বাবা তোমাদের বারণ করিয়াছেন, তোমরা কোন্ সাহসে আমাকে ঘরে তুলিতেছ?' তিনি বলিলেন 'আজ যদি মা বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি কি কাল তোমাকে উপোষ রাখিতে পারিতেন বা বাহিরে খাইতে দিতেন? বাবার কথা আমি মানিব না। তিনি আমার ঘরে না হয় না খাবেন',—এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া রান্নাঘরে বসাইয়া আমায় খাওয়াইলেন। তখনও আমার সঙ্গে বাবার বোঝাপড়া হয় নাই। কিছুক্ষণ পর বাবা আমাকে ডাকিলেন। আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে এক পিসতুতো ভাই আমাদের সেই হাতাতে সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার অন্তঃপুরে একটা ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে কহিলেন, "কাল পর্য্যন্ত আমি তোমাকে লইয়া কি করিব ঠিক করিতে পারি নাই, এখনও কি করিব জানি না, তবে তাহা তোমার উপর নির্ভর করিবে। তুমি বিদেশে কি কর বা না কর তাহার খোঁজ লইতে চাহি না; তবে যে ক'দিন আমার কাছে থাকিবে, সে ক'দিন জাতবিচার করিয়া চলিবে কি না, ইহাই জানিতে চাই। আমি কহিলাম "গায়ে পড়িয়া আমি আপনারা যাহার হাতে খান না, তাহার হাতে খাইতে যাইব না, কিন্তু

যখন আমি কিছু খাই বা পান করি তখন যদি সেস্থানে কোন অস্পৃশ্য জাতের লোক আসেন তাহা হইলে সেজন্য আমি আমার খাদ্য বা পানীয় পরিত্যাগ করিব না এবং তাঁহাকেও ঘরে ঢুকিতে বারণ করিতে পারিব না। জাতিভেদটা মিথ্যা আমি এইরূপই বিশ্বাস করি, কথায় বা কার্য্যে জাতিভেদ মানিয়া চলিলে মিথ্যাচরণ করিতে হয়; সুতরাং আমি তাহা করিতে পারিব না।' আমার এই কথা শুনিয়া বাবা দ্বিরুক্তি করিলেন না। আমার পিসতুত ভাইকে বলিলেন "এ যে ক'দিন এখানে আছে, তোমার ভিতর বাড়ীর একটা ঘরেই খাইবে। আমার বাসায় ত মেয়েরা নাই, বাহির বাড়ীতেই আমার রান্না ও খাওয়া হয়। আমি তাহাকে ঘরেও লইতে পারিব না উঠানেও ভাত দিতে চাহি না।' এই ব্যবস্থা করিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে বাবা শহর ছাড়িয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। পরে একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে শহর-ছাড়া করিয়াছিলাম।

(৮)

কটকে প্রত্যাবর্ত্তন ও কলিকাতায় ফিরিয়া আসা

গ্রীষ্মের ছুটীর পরে কটকে ফিরিয়া শারদীয়া ছুটী পর্য্যন্ত আমি প্যারীবাবুর স্কুলে হেডমাষ্টারী করিয়াছিলাম। পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই সেকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কাহারা যাইবে না যাইবে ইহা ঠিক হইয়া যাইত। আমি পূজার ছুটীতে কলিকাতায় আসি এবং তাহার পূর্ব্বেই এই বাছনী করিয়া বোধহয় ছয়জন ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া আসি। তাহাদের আবেদন-পত্র আমিই সহি করিয়া দেই এবং এইগুলি প্যারীবাবুর হাতে দিয়া ছেলেরা

ফি'-এর টাকা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিয়া আসি। যাদের আমি পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিতে পারি নাই, তাদের মধ্যে একজন আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই। আমি কলিকাতা চলিয়া আসার পরে প্যারীবাবু তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমার নির্দ্ধারণ বদলাইয়া তাহাকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইয়া দেন। আমি যে আবেদন-পত্রগুলি সহি করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা ফেলিয়া দিয়া নিজে অন্য আবেদন-পত্র সহি করিয়া দেন। তিনি স্কুলের রেক্টর (Rector) ছিলেন ; এইজন্য এই আবেদন-পত্রে সহি করিবার অধিকার তাঁহারও ছিল। কিন্তু আমার উপরে স্কুলের সকল ভার দিয়া শেষে এইরূপ ভাবে আমার দায়িত্ব ও অধিকারকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি যাহা করিলেন, তাহার পরে আমার আর তাঁহার স্কুলে কাজ করা সম্ভব রহিল না। সুতরাং পূজার ছুটীর পরে কটকে যাইয়াই এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৯ ইংরাজীর ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ ও শ্রীহট্টে 'জাতীয়' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

কটক হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন ডিসেম্বর মাস—১৮৭৯। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাইয়া প্রচারকার্য্যে সহকারিতা করিতে আহ্বান করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে বহুদিন হইতে কেবল পরিচিত ছিলাম না একটা ঘনিষ্ঠ স্নেহপাশে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। তাঁর ভিতরে ভালবাসার আকর্ষণে মানুষকে নিজের করিয়া লইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল। তিনি যে খুব পণ্ডিত ছিলেন, এমন নহে। সংস্কৃত কিছু অবশ্য জানিতেন, তাঁর উপাধি হইতেই ইহা বোঝা যাইত। বাংলাও বেশ জানিতেন। ইংরাজীতে কোনও অধিকার লাভ করেন নাই, সামান্য কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন মাত্র, কিন্তু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। তাঁর বাক্‌প্রতিভাও বেশী ছিল না কিন্তু ছিল একটা অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি। আর এই আকর্ষণ করিবার শক্তির রহস্য ছিল তাঁর বাল-স্বভাবসুলভ সরলতা। আমি যখন কটকে ছিলাম তখন প্রচার কর্ম্মোপলক্ষে বিদ্যারত্ন মহাশয় কটকে গিয়াছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে কটক একাডেমীর বাড়ীতেই বোধ হয় এক মাস কাল ছিলেন। এই সূত্রে পূর্বপরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হয়। এই বন্ধুতার খাতিরেই তিনি আমাকে বেকার দেখিয়া উত্তরবঙ্গে লইয়া যাইতে চান। আমিও ১৮৭৯ ইংরাজীর শেষভাগে তাঁহার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করি।

আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় এবং তাঁর সদ্য-পরিণীতা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অম্বুজা

নন্দিনী। বিদ্যারত্ন মহাশয়ই ইহাদের বিবাহ দেন। বিবাহের পরে নবদম্পতিকে সঙ্গে লইয়া আনন্দবাবুর কর্ম্মস্থল শিলিগুড়িতে গমন করেন। আনন্দবাবু কেম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের ডাক্তার হ'ন এবং এখান হইতেই পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

(২)

আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাই তখন ৺চণ্ডী চরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে মুন্সেফ ছিলেন। সে সময়ে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম কাজ করিতেন। সৈদপুরে তখন পূর্ব্ববঙ্গ রেল-বিভাগের হিসাব পরীক্ষার বা অডিটের অফিস ছিল। পরলোকগত আশুতোষ বসু মহাশয় এখানে একটা বড় চাকুরী করিতেন। তাঁহার সাহায্যে তাঁহার অনেক আত্মীয় স্বজন রেল অফিসে কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আশুবাবুর গভীর টান ছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে ও চরিত্র প্রভাবে তাঁহার দপ্তরের কর্ম্মচারীদের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন। এই সময়েই আমার পরলোকগত বন্ধু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় এবং ৺বঙ্কুবিহারী বসু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তখনও তাঁরা সৈদপুরেই ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে ছিলেন। এখান হইতে তিনি আদালতের ছুটী হইলেই উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। চণ্ডীবাবু একদিকে শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি অন্যদিকে অসাধারণ সত্যানুরাগী ও সরল চরিত্রের লোক ছিলেন। এই দুই কারণে তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই শিক্ষিত সমাজের দ্বারা

সম্বর্দ্ধিত হইতেন, সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে আসিত। এইভাবে সে সময়ে উত্তরবঙ্গে বেশ একটা প্রভাবশালী ব্রাহ্মগোষ্ঠী ক্রমে গড়িয়া উঠে। রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বৃত হইয়া বিশেষভাবে আসামে এবং উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ সৈদপুরে একটা বেশ বড় ব্রাহ্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে প্রথমে উত্তরবঙ্গে যাই তখনই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

(৩)

কটকের পথে আমার সমুদ্রদর্শন হইয়াছিল। এবারে জলপাই-গুড়িতে যাইয়া আমার প্রথম হিমাচল দর্শন হইল। আমরা যখন জলপাইগুড়িতে পৌঁছিলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে। চণ্ডীবাবুর বাসায় যাইয়াই উঠি। কিন্তু তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। আদালতের তখন ছুটি। এখানে দুইদিন মাত্র ছিলাম। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া হিমালয়ের যে ছবি দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। এই আটচল্লিশ বৎসর পরে আজও যেন সেই ছবি চোখে ও মনে লাগিয়া আছে। উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলাম, হিমাচলশৃঙ্গ হঠাৎ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; ইহাও ঠিক বলা হইল না, তিলে তিলে সোণার বরণ হইয়া উঠিতেছে বলিলেই সেই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সত্য বর্ণনা হয়। মনে হইল কে যেন সোণার তুলি দিয়া গিরিরাজের টোপর রঙ্ করিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই সোণার আলো বদলিয়া গেল। ঐ সোনার উপরে কে যেন রূপার তুলি বুলাইয়া তাহাকে রৌপ্যবর্ণ করিয়া দিতেছে। ক্রমে ইহাও মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং শেষে সূর্য্য যখন চক্রবাল রেখা ছাড়াইয়া উঠিল, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে

হিমগিরি আপনার নিজের নিত্যরূপ ধারণ করিয়া অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইল। হিমাচলশৃঙ্গে যে বাল-অরুণোদয় দেখে নাই তাহার পক্ষে এ অপরূপ রূপের কল্পনা করা সম্ভব নয়, আর যে একবার দেখিয়াছে সে জীবনে এই ছবি কখনও ভুলিবে না।

(৪)

জলপাইগুড়ি হইতে আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র শিলিগুড়ি যাই। সেখানে দিন দুই বোধহয় ছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে ফাঁসি-দাওয়া নামে একটা মহকুমা—তখন ছিল এখন আছে কিনা জানি না—সেখানে যাই। এখানে একটি মাত্র নবীন ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম। তাঁহার পত্নী হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণী বিধবা ছিলেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গুরুকন্যা ছিলেন এরূপ শুনিয়াছিলাম। হরিদাস বাবু ফাঁসিদাওয়ার মুন্সেফী আদালতে কর্ম্ম করিতেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহারও বিবাহ হয়। আনন্দ চন্দ্র রায় ও হরিদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, ইঁহাদের নূতন সংসারে অতিথি হইয়াই আমি সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হই। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় কেবল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী যোগমায়া দেবী আমাকে আপনার ভাই-এর মতন স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যারা আমাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, নাম ধরিয়া ডাকিতেন না। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের লোকের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিত। তাঁরা সকলেই প্রায় নিজেদের ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন সকল ছাড়িয়া সত্যের নামে একমাত্র নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন।

সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের লোককে প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেন। এবারে উত্তরবঙ্গে যাইয়া আনন্দবাবু ও হরিদাসবাবু এঁদের পরিবারের সঙ্গে একটা স্নেহ ও ভালবাসার যোগ বাঁধিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল পরেও সে যোগ একেবারে ভুলিতে পারি নাই।

(৫)

কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও শ্রীহট্ট যাত্রা

বোধ হয় ফাঁসিদাওয়া থাকিতেই কলিকাতায় অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবার তাগিদ আসে। আমি কটকের কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার সহকর্ম্মী দুজন, রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ সেনও আর সেখানে থাকিতে চাহিলেন না। আমার অল্পদিন পরে তাঁরাও কটক ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সে সময়ে ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীহট্ট ছাত্রাবাস ছিল। কটকে যাইবার পূর্ব্বে রাজচন্দ্র ও আমি আমরা দুইজনে এই মেসেই ছিলাম। ব্রজেন্দ্রের বাড়ী শ্রীহট্টে নয় ঢাকা বিক্রমপুরে। বোধহয় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে ইঁহার পিতৃ-পরিবারের আত্মীয়তা ছিল। ব্রজেন্দ্র কটকে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে শ্রীহট্টের মেসে বা ছাত্রাবাসে ছিলেন না কিন্তু এবার কটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানেই উঠিলেন। আমরা তিনজনেই বেকার, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় শ্রীহট্ট হইতে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আমাদের সেখানে যাইয়া একটা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। আমি উত্তরবঙ্গে যাইবার পূর্ব্বেই উড়োভাবে কথাটা আমাদের কানে আসিয়াছিল। ফাঁসিদাওয়াতে খবর গেল, কথাটা প্রায় পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং আমাকে

অনতিবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

(৬)

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

আমি যে বৎসর কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়া আরম্ভ করি সেই বৎসর কিম্বা তার অব্যবহিত পূর্ব বৎসর কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্ট ছাত্রেরা শ্রীহট্ট সম্মিলনী বা সিলেট ইউনিয়ন নামে একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহট্টে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচার এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এসকলের মধ্যে বোধ হয় বরিশাল হিতৈষিণী এবং ত্রিপুরা-হিতসাধিনী এই দুইটি সমিতিই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি দুইটির সাহায্যে বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলার কলিকাতা প্রবাসী ছাত্রেরা নিজেদের জেলায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহারা মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মেয়েরা বাড়ীতে থাকিয়া নিজেদের পরিবারের শিক্ষিত লোকদের নিকটে এসকল পাঠ বা অধ্যয়ন করিতেন, বৎসরান্তে সমিতি ইহাদের পরীক্ষা লইতেন। যাঁরা একটু উচ্চ শ্রেণীর পাঠ পড়িতেন, ছাপান প্রশ্নের কাগজ পাঠাইয়া তাঁহাদের লিখিত উত্তর সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। অন্যেরা মৌখিক পরীক্ষা দিতেন। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থিনীদের কোনও নিকট আত্মীয় তাঁদের পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করিতেন। মৌখিক পরীক্ষা নিজেরাই করিতেন এবং ফলাফল সমিতির নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে পরীক্ষা লইয়া সমিতি পরীক্ষার্থিনীদের পারদর্শিতা অনুসারে তাঁহাদের

পুস্তকাদি পুরস্কার দিতেন, কখনও বা বৃত্তি পর্য্যন্ত দিতেন। আমাদের শ্রীহট্ট সম্মিলনীও এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া এই প্রণালীতেই কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমাবধিই দেশের লোকের সহানুভূতি ও অকৃত্রিম সাহায্য পাইয়া আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি ভাল ভাবে গড়িয়া উঠে। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ ইহাকে অকুণ্ঠ অর্থসাহায্য করেন। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে সম্মিলনীর ছাত্রীদের যথাযোগ্য পুরস্কারাদির ব্যবস্থা করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা দ্বারা কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্টের ছাত্রদেরও সময় সময় সাহায্য করা হইত।

৺জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় এই সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। জয়গোবিন্দ বাবুর বাড়ী শ্রীহট্টে, পূর্ব্বেই কহিয়াছি। আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতির সনন্দ লইয়া তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া অল্পদিন সেখানকার আদালতে ওকালতি করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। জয়গোবিন্দ বাবু কলিকাতার বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান সমাজে অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সহকর্ম্মীদের সমাজপতি হইয়া উঠেন। জয়গোবিন্দ বাবু আমাদের ক্ষুদ্র সম্মিলনীর কর্ণধার হওয়াতে ইহা একরূপ জন্মাবধি সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিল।

(৭)

আমরা কটক ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কাজের চেষ্টা করিতেছি শুনিয়া শ্রীহট্টের বন্ধুরা আমাদিগকে সেখানে যাইয়া একটা নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বলিয়াছি, শ্রীহট্ট সম্মিলনী এই প্রস্তাবটি নিজেদের হাতে তুলিয়া লইলেন। সম্মিলনীর কার্য্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রীহট্টের বন্ধুদের লিখিলেন যে তাঁরা আমাদের তিনজনকে প্রথম,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক মনোনীত করিয়া এই স্কুলের কাজে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকদের স্কুলের বাড়ী ও আসবাবের ব্যবস্থা করিবার ভার লইতে হইবে। শ্রীহট্টে এক মুসলমান ভদ্র-লোকের একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল ছিল। ইহার নাম ছিল মুফতি স্কুল। ১৮৭৯ ইংরাজীর শেষভাগে এই স্কুল উঠিয়া যায়। ইহার ছাত্রদের নূতন স্কুলে সহজেই পাওয়া যাইবে। এই লোভেই শ্রীহট্টের বন্ধুরা এই নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইচ্ছুক। মুফতি স্কুলের বাড়ী ও আসবাবও আমরা পাইতে পারিব, তাঁহারা এ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাদিগকে তখনই শ্রীহট্ট যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। কাঁসীদাওয়াতে আমি এই সংবাদ পাইয়া কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর তহবিলে তখন কিছু টাকা ছিল। এই টাকা হইতে আমাদের পাথেয়র ব্যবস্থা করিয়া সম্মিলনী ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমাকে এই স্কুল খুলিবার জন্য শ্রীহট্টে পাঠাইয়া দিলেন।

(৮)

শ্রীহট্টে 'জাতীয়' স্কুল বা ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউসন স্থাপন

১৮৮০ ইংরাজীর জানুয়ারী মাসে আমরা শ্রীহট্টে যাইয়া এই বে-সরকারী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন করি। বোধ হয় প্রথম কয়েকদিন আমাদের এই নূতন স্কুল পুরাতন মুফ্‌তি স্কুলের বাড়ীতেই বসিয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে শহরের মাঝখানে দুইটি নূতন চালাঘর তুলিয়া সেখানে আমাদের স্কুল উঠিয়া আসে। এই স্কুলের নাম হইল, সিলেট ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন বা শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়।

(৯)

জানুয়ারী মাসের প্রথমে আমাদের এই নূতন স্কুল খোলা হয়। আর তিন মাসের মধ্যেই আমাদের ছাত্রসংখ্যা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৮০ ইংরাজী ৩১শে মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা চারিশত মত ছিল। আর আমাদের ছাত্রসংখ্যা সাড়ে তিনশত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার একটা কারণ ছিল, আমাদের স্বল্পতর বেতনের হার। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ ছিল যাঁরা এই স্কুলে পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের চরিত্রের প্রভাব। আমরা বেতনভুক ছিলাম না বলিলেই চলে। রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমি আমরা কোন বেতনের দাবী রাখিতাম না। অপরাপর শিক্ষকদের তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মাহিনা দিয়া স্কুলের ছাত্র-বেতন হইতে যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত আমরা তাহা হইতে যৎসামান্য টাকা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় খরচের জন্য লইতাম। অনেক সময় এমন হইত যে আমরা এই টাকা দিয়া দুবেলা খাইতে পাইতাম না। তবে বাজারে হালুইকরের দোকানে ধার মিলিত। সেখান হইতে লুচি ও জিলাপি আনাইয়া রাত্রে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতাম। রাজচন্দ্রের পিতা তখন সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সামান্য পেন্‌সন্ পাইতেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রায় সকল ভদ্রলোকেরই স্বল্পবিস্তর জমি জেরাত ছিল। এই হিসাবে রাজচন্দ্রের পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পুত্রের উপার্জ্জনের উপরে নির্ভর করিতে হইত না। কিন্তু ব্রজেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তখন জীবিত ছিলেন কিনা মনে নাই। তবে ব্রজেন্দ্রকে বাড়ীর খরচের জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা জোগাইতে হইত। সুতরাং তিনি সামান্য বেতন গ্রহণ করিতেন। তবে শ্রীহট্টে থাকার খরচটা আমাদের একসঙ্গে কষ্টেস্বষ্টে চালাইয়া লইতেন।

নব জাতীয়তার উদ্বোধন—নবগোপাল মিত্র ও হিন্দু-মেলা

আমি জানি না ইহার পূর্বে বাংলা দেশে কোথাও 'জাতীয়' নামে কোন বে-সরকারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না, খুব সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য জেলায় এরূপ বে-সরকারী স্কুল খুলিতে আরম্ভ হইয়াছিল বটে। কিন্তু বোধ হয়, অধিকাংশ স্কুলেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামে এ সকল স্কুলের নামকরণ হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর পিতা ৺ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে বরিশালে স্কুল খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একটা স্কুল খুলিয়াছিলেন, ইহার নাম দিয়াছিলেস এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউসন। বস্তুতঃ এই স্কুলের বুনিয়াদ পত্তন কেশবচন্দ্রের দ্বারা হয় নাই, হইয়াছিল একজন দরিদ্র কিন্তু উৎসাহী ব্রাহ্মের দ্বারা। ৺হরনাথ বসু মহাশয় কলিকাতা স্কুল নামে ইহার প্রথম পত্তন করেন।* এইরূপে আমাদের শ্রীহট্টের স্কুল স্থাপিত হইবার পূর্বে বাংলাদেশে নানা স্থানে অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি যতদূর জানি বোধহয় এ সকল স্কুলের কোনটিই আপনাকে ন্যাশন্যাল বা জাতীয় নামে অভিহিত করে নাই।

---

* এই কলিকাতা স্কুল পরে কেশবচন্দ্রের দখলে আসে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ বা রেক্টর হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতায় আসিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র হাজার পঁচিশেক টাকা তুলেন। সেই টাকা দিয়া এলবার্ট হলের প্রতিষ্ঠা হয়। এলবার্ট হলের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা স্কুল এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউসন নাম গ্রহণ করে। কিছুদিন পূর্বে যেখানে এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট ছিল সেই বাড়ীতে এক সময়ে কলিকাতা স্কুল ছিল।

(২)

এই কথাটা এমন করিয়া উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে আমরা যে 'জাতীয়' নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই নামের পশ্চাতে আমাদের নিজেদের জীবনের একটা ইতিহাস লুকাইয়া ছিল। এই ন্যাশন্যাল বা জাতীয় কথাটা আমাদের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে পাই নাই, আনন্দমোহনের নিকট হইতে পাই নাই; কেশবচন্দ্রের নিকট হইতেও পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। আর নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়।

(৩)

আমি যখন শ্রীহট্টে জেলা স্কুলে পড়ি, তখন বাংলার ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব যে শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তদনুসারে স্কুলে স্কুলে বিলাতী ধরণের ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আসিলাম তখন এখানেও জিমন্যাষ্টিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নবগোপালবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা আমাদের জিমন্যাষ্টিক শিক্ষক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গনে প্যারালাল বার, হরাইজণ্টাল বার, ট্রেপিজ প্রভৃতি বিলাতী ব্যায়ামের উপকরণ স্থাপিত হইয়াছিল।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরও একটা জিমন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল। নবগোপাল মিত্রের পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পাশে, শঙ্কর ঘোষ লেনে। এখানে লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা এবং ডন কুস্তি প্রভৃতি শেখান হইত। সুন্দরীমোহন দাস, রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমি, শ্রীহট্টের ছাত্রবাসের আমারা এই তিনজন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের এই ব্যায়াম বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই; এবং তাঁহারই নিকট

নব জাতীয়তার উদ্বোধন—নবগোপাল মিত্র ও হিন্দু-মেলা

হইতে আমরা স্বাদেশিকতায় বা ন্যাশনালিজমে প্রথম দীক্ষালাভ করি।

(৪)

সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে পেট্রিয়টিজম্-এ অথবা স্বদেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র ন্যাশনালিজম্ বা স্বাজাত্যাভিমানে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই স্বাধীনতার প্রেরণাকে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র আমাদিগকে নিজেদের সভ্যতা এবং সাধনার গৌরবে গরীয়ান করিয়া সত্য স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা দিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্রের একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, নাম ছিল তার 'ন্যাশনাল পেপার'। তাঁহার বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া এইজন্য তাঁহাকে 'ন্যাশনাল মিত্র' বলিয়া ডাকিতেন। এই 'ন্যাশনাল পেপার' নূতন ধরণের ইংরাজীতে লেখা হইত। ইংরাজী ব্যাকরণের বিধিনিষেধের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া নবগোপাল মিত্র তাঁহার নিবন্ধসকল রচনা করিতেন না। ইংরাজীর ভুল ধরিলে বলিতেন, 'ও ত আমার নিজের ভাষা নয়, এই ভাষায় ভুল লিখিলে আমার কোন লজ্জার কথা হয় না। এই ম্লেচ্ছ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল।'

(৫)

হিন্দু-মেলা

নবগোপাল মিত্র এবং তাঁহার বন্ধু ও গুরুস্থানীয় রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়, ইঁহারাই বাংলায় 'স্বদেশী'র প্রথম পুরোহিত। ইঁহারা স্বদেশের পণ্য যাহাতে লোকে একরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রেরণায় ব্যবহার করে, ইহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য বোধ হয় ১৮৭২ কি ১৮৭৩ ইংরাজীতে 'হিন্দু-মেলা' নামে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী মেলার আয়োজন হইয়াছিল। এই হিন্দু-মেলাতেই প্রথমে লুপ্তপ্রায় তাঁতের কাপড় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। এই মেলাতে অন্যান্য স্বদেশী পণ্যও প্রদর্শিত হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এই হিন্দু-মেলা ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে তাঁহার 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই হিন্দু-মেলাতে দেশী ও বিলাতী ব্যায়াম-কুশলতাও প্রদর্শিত হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রেরা, বিশেষতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, এই হিন্দু-মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

(৬)

নবগোপাল মিত্রের নিকটেই আমরা জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের প্রথম প্রেরণা পাইয়াছিলাম এবং সেই প্রেরণা লইয়া শ্রীহট্টে যাইয়া ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ বা জাতীয় বিদ্যালয় নামে স্কুল স্থাপন করি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের মধ্যে এই ন্যাশন্যালিজমের অতি সামান্য অঙ্কুর মাত্র তখন ফুটিয়াছিল। ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ যে কোন বিশিষ্ট জাতীয় আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল এ কথা বলিতে পারি না। আমাদের এইমাত্র তখন সঙ্কল্প ছিল যে, আমরা এই বিদ্যালয় পরিচালনে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না। এমন কি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের আমাদের স্কুল পরিদর্শনের অধিকার ত দূরের কথা, অবসর পর্য্যন্ত দিব না। তখন ইহা সম্ভব ছিল। কারণ তখন এই সকল

বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিজেরাই নিজেদের স্কুলের পঠন-প্রণালী এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। কেবল স্কুলের সর্ব্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য যে সকল ছাত্রকে প্রস্তুত করিতে হইত, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পড়াইতেই হইত। ইহার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু এ ছাড়া আর সকল শ্রেণীতে আমরা আমাদের আদর্শ এবং রুচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকাদি নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম।

নাম ও বিষয়-সূচী

নির্ঘণ্ট

ও

ক

খ

গ

দ

ধ, ন

ন

ল, শ

শ

স

বিপিনচন্দ্র পালের রচনাবলী

ENGLISH WORKS
of
BIPINCHANDRA PAL

1. **SWADESHI & SWARAJ**: THE RISE OF NEW PATRIOTISM — 6·00
2. **SOUL OF INDIA** (4th Edition) — 5·00
3. **CHARACTER SKETCHES** of: — 6·00

RAMMOHAN ROY
KESHUB CHUNDER SEN
ANANDA MOHAN BOSE
SRI AUROBINDO GHOSH
SURENDRANATH BANERJEA
ASVINI KUMAR DATTA
BAL GANGADHAR TILAK
RABINDRANATH TAGORE
SISTER NIVEDITA
SYAMSUNDAR CHAKRAVARTY
Dr. ANNIE BESANT
ASHUTOSH MUKHERJEA
KRISHNA KUMAR MITRA
TARAKNATH PALIT
MONORANJAN GUHATHAKURTA

4. **STUDY OF HINDUISM** (Written in jail—2nd Edition) — 4·50
5. **WRITINGS & SPEECHES**—Vol. I — 3·00
6. **BEGINNINGS OF FREEDOM MOVEMENT IN INDIA** (2nd Edn.) — 2·00
7. **BENGAL VAISHNAVISM** (2nd Edn.) — 5·00

To be published soon—

8. **SHREE KRISHNA** (2nd Edition)
9. **MEMORIES OF MY LIFE & TIMES** (2nd Edition—in one volume)
10. **WRITINGS & SPEECHES**—Vol II

B. C. PAL CENTENARY VOLUME

STUDIES IN BENGAL RENAISSANCE — 15·00

(contributed by forty-two eminent scholars)

Edited by—SHREE ATUL CHANDRA GUPTA

YUGAYATRI PRAKASHAK LTD.

41A, BALDEOPARA ROAD,
CALCUTTA-6
Phone : 35-3732